Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুমিনের জীবনে আকিদার প্রভাব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাসলিমা আক্তার

রোলঃ ২১৫০০১৪৪৫

০৫ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুমিনের জীবনে আকিদার প্রভাব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাসলিমা আক্তার

রোলঃ ২১৫০০১৪৪৫

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "মুমিনের জীবনে আকিদার প্রভাব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাসলিমা আক্তার, আইডিঃ ২১৫০০১৪৪৫বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "মুমিনের জীবনে আকিদার প্রভাব" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

০৫ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

তাসলিমা আক্তার

আইডিঃ ২১৫০০১৪৪৫

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা	৭
আকিদা	১০
ঈমান ও আকিদার সম্পর্ক	১১
সূচনা	১২
বিশ্বাসের ৬টি স্তম্ভ	১২
তাওহীদ	১৩
ঈমান	১৩
সালাত	১৪
সাওম	১৫
যাকাত	১৫
হজ	১৬
জিহাদ	১৬
দাওয়াত	১৭
পরকালবিদ্যা ও গুরুত্ব	১৭
আকিদার মতবাদ সমূহ	২৩
মুসলমানদের ১০৫ টি মৌলিক আকিদা ও বিশ্বাস	৩৪
তাকদীর	৪৫
ঈমান ও আকিদা	৪৬
হালাল উপার্জন একটি অলজ্ঘনীয় বিধান	৫২
হালাল উপার্জন দুয়া কবুলের পূর্ব শর্ত	৫২
হালাল উপার্জনে বরকত লাভ হয়	৫৩
হালাল উপার্জন জান্নাত লাভের একমাএ উপায়	৫৪
অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন কারীর জন্য জাহান্নাম অবধারিত	৫৪
হালাল উপার্জন ইবাদত কবুলের শর্ত	৫৪
আগামীকাল কী খাবো? রিজিক নিয়ে যত বৃথা সংশয়, যত অহেতুক ভয় !	৫৫

তাহাদের ইখলাস,আমাদের ইখলাস	৬১
ইখলাস সংক্রান্ত ধারণা	৬৬
সব কিছু ছেড়ে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার নাম ই কি তাওয়াককুল ইলাল্লাহ !	৭১
অপেক্ষামান দূর্বিসহ বিচার দিবস এবং বিচার প্রদানে আল্লাহ ই যথেষ্ট !	৭৪
দোয়া কবুলের মুহুর্তগুলো : দোয়া কবুলের উত্তম সময়	৭৮
সূরা ফাতিহা এবং কিছু উপলব্ধি : ৪র্থ আয়াতের অন্তর্নিহিত জ্ঞান	৮৩
আল্লাহ কি নিরাকার ! ভুল আকিদার অন্তরালে	৮৪
মৃত্যু অনিবার্য : রিজিক নির্ধারিত	৯৩
জীন জাতি এবং জিনের অস্তিত্ব	১০২
বৃস্টি কেন হয় ! বিজ্ঞান এবং কোরান কি আলাদা কিছু বলে	১১০
শীত থেকে ইবাদতের বসন্তকাল	১১৪
আল্লাহ এতো বিপদ কেন দেন ?	১১৯
তাকদীরে বিশ্বাস	১২৮
ঈমান	১৩৬
ঈমানের অর্থ সম্পর্কে আলেমদের বক্তব্য	১৩৭
ঈমানের ব্যাখ্যা	১৩৮
ঈমান ও আকিদার সম্পর্ক	১৪১
ঈমানের বা স্বীকৃতির রুকুন বা স্তম্ভ	১৪২
ঈমানের সাতাত্তর টি শাখা	১৪৩
বায়হাকী বর্ণিত এই ৭৭টি শাখা হলোঃ হৃদয়ের সাথে যুক্ত ত্রিশটি কাজ	১৪৪
জিহার সাথে সংযুক্ত ৭ টি কাজ	১৪৫
৪০ টি কাজ সমগ্র দেহের সাথে সংযুক্ত	১৪৮
মুমিন	১৪৮
মুসলিম/মুসলিমার সাথে মুমিন/মুমিনার পার্থক্য ও মুমিন ব্যাক্তির সংজ্ঞা	১৪৯

মুমিনের পরিচয় ও সফল মুমিনের গুণাবলীসমূহ	১৪৯
মুমিন হতে হলে যে ৬ টি বিষয়ে পূর্ব বিশ্বাস জরুরি	১৫৪
মুমিনের জীবনে আকিদার প্রভাব:আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী	১৫৮
পরকালে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ	১৬৩
ঈমান সুদৃঢ় করার ১০ টি আমল	১৬৪
মুহাম্মদ সা: কবরে সশরীরে জীবিত এবং কেয়ামত পর্যন্ত সব কিছু দেখবেন!	১৬৮
সম্মান ও ক্ষমতার মালিক আল্লাহ	১৭১
ফেরেশতা	১৭৪
আল কুরআনে ফেরেশতাগণ	১৭৪
জীন জাতি	১৭৫
হাশরের ময়দান যেমন হবে	১৭৭
জান্নাত	১৭৯
কুরআন	১৯৭
ইসলামের গুরুত্ব	২০৫
ইসলামের নবি ও রাসুল	২০৮
কিয়ামত	২১০
কুফর	২১০
শিরক	২১৪

ভূমিকা

মুমিনের জীবনে আকিদার গুরুত্ব অপরিসীম তাই সঠিক ইসলামী আকীদা দিয়েই আল্লাহ তা'আলা রসূলগণকে পাঠিয়েছেন, কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন এবং সমস্ত জিন-ইনসানের উপর এটি কবুল করে নেয়াকে আবশ্যক করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (৫৭) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

"আমি জিন এবং মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে কোন রিযিক চাই না কিংবা তারা আমাকে খাওয়াবে তাও চাই না। আল্লাহ নিজেই রিযিকদাতা এবং প্রবল শক্তিধর ও পরাক্রমশালী"। (সূরা আয যারিয়াত: ৫৬-৫৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾

"তোমার রব এ ফায়ছালা দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া তোমরা অন্য কারো ইবাদত করো না। আর মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো"। (সূরা বানী ইসরাঈল: ২৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল পাঠিয়েছি। তার মাধ্যমে এ নির্দেশ দিয়েছি যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো আর তাগুতকে বর্জন করো"। (সূরা আন-নাহাল: ৩৬)

সমস্ত রসূলই এ সহীহ আকীদার দাওয়াত নিয়ে এসেছেন। সমস্ত আসমানী কিতাবই এ সহীহ আকীদার বিশদ বিবরণ দেয়ার জন্য নাযিল হয়েছে এবং এটাকে ভঙ্গকারী অথবা এটাকে ত্রুটিযুক্তকারী বিষয়গুলো স্পষ্ট করার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক মানুষকেই তা গ্রহণ করার আদেশ করা হয়েছে।

সুতরাং আকীদার বিষয়টি যেহেতু এত মর্যাদাবান ও গুরুত্বপূর্ণ, তাই সর্বপ্রথম এর প্রতি গুরুত্ব দেয়া, এ নিয়ে গবেষণা করা এবং এর জ্ঞান অর্জন করা জরুরী। কেননা এ পরিশুদ্ধ আকীদার উপরই মানুষের ইহ-পরকালীন সৌভাগ্য নির্ভর করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

''যে ব্যক্তি 'তাগুতকে'[1] অস্বীকার করে এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সে ধারণ করে নেয় সুদৃঢ় হাতল, যা বিচ্ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ''। (সূরা আল বাকারা: ২৫৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ সঠিক আকীদা থেকে হাত গুটিয়ে নিবে, সে এ বিষয়ে নিজস্ব খেয়াল-খুশী ও বাতিল ধারণার দিকে ধাবিত হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে সে তার সামনে বাতিল ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পাবে না।

সূরা হাজ্জের ৬২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ﴾

''আল্লাহই সত্য; আর তার পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা বাতিল''।

সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত লোকের পরিণাম জাহান্নামের দিকেই হবে। তা কতই না নিকৃষ্ট বাসস্থান।

[1]. মোটকথা তাগুতকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত কারো ইসলাম পরিশুদ্ধ হবে না। কালেমায়ে তায়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর মর্মার্থ এটিই। সুতরাং لاإله এই কথার মাধ্যমে প্রত্যেক ঐ তাগুতকে অস্বীকার করা হয়েছে, আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করা হয়। আর إلا الله কালেমার এ অংশের মাধ্যমে কেবল আল্লাহর একত্ব সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। তার মাধ্যমে এ নির্দেশ দিয়েছি যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, আর তাগুতকে বর্জন করো" (সূরা আন নাহাল: ৩৬)

সুতরাং আল্লাহর ইবাদতকে একটি বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। আর তাগুতের ইবাদতকে অন্য একটি বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং একজন মানুষ কেবল তখনই মুসলিম বলে গণ্য হবে, যখন সে আল্লাহর ইবাদত করবে এবং একই সাথে তাগুত থেকে দূরে থাকবে।

আর طاغوت শব্দের উৎপত্তি হয়েছে الطغيان থেকে। তাগুত বলা হয় এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে, যে অন্যায় ও বিদ্রোহে সীমা লংঘন করে। আল্লাহ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালামকে লক্ষ্য করে বলেছেন,

﴿ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴾

"এখন তুমি যাও ফেরাউনের কাছে। কেননা সে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে"। (সূরা ত্বহা:২৪) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾

"যে সময় পানির তুফান সীমাঅতিক্রম করলো তখন আমি তোমাদেরকে জাহাজে আরোহন করিয়েছিলাম"। (সূরা আল হাক্কাহ: ১১) অর্থাৎ পানি যখন অত্যন্ত বেড়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴾

"তাই সামূদ জাতিকে একটি সীমাহীন বিপদ দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে"। (সূরা আলহাক্কাহ: ৫)

অর্থাৎ বিকট ও ভয়াবহ একটি চিৎকারের মাধ্যমে। সুতরাং যে ব্যক্তি বা বিষয় সীমা অতিক্রম করে, তাকেই তাগুত বলা হয়। শয়তানকে আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার কারণে এবং সীমালংঘন করার কারণে তাগুত বলা হয়। আল্লাহ ব্যতীত

অন্য যে মাবুদের ইবাদত করা হয়, সে মাবুদ যদি উক্ত ইবাদতের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে তাকে তাগুত বলা হয়। যাদুকর এবং গণক উভয়ই তাগুত। এমনি আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেক মাবুদই তাগুত।

আকিদা

আকিদা (আরবি: العقيدة–আল্-আকিদাহ ; বহুবচন: العقائد–আল-আকা'ইদ), যা ইসলামি ধর্মতত্ত্ব নামেও পরিচিত, হল একটি ইসলামি পরিভাষা, যার অর্থ 'কিছু মূল ভিত্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন'। বিশ্বাস বা ধর্মবিশ্বাস বুঝাতে মুসলিম সমাজে সাধারণত দুইটি শব্দ ব্যবহৃত হয়: ঈমান ও আকিদা। তবে কুরআন ও সহীহ হাদীসে সর্বদা 'ঈমান' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। "আকিদা" ব্যবহৃত হয়নি। হিজরি দ্বিতীয় শতক থেকে তাবেয়ীগণ (সাহাবীদের ছাত্র) ও পরবর্তী যুগের ঈমামগণ (ধর্মীয় বিশ্লেষক) ধর্মবিশ্বাসের খুঁটিনাটি বিষয় আলোচনার জন্যে "ঈমান" ছাড়াও আরো কিছু পরিভাষা ব্যবহার শুরু করেন। এসকল পরিভাষার মধ্যে রয়েছে 'আল-ফিকহুল আকবার', 'ইলমুত তাওহীদ', 'আস–সুন্নাহ', 'আশ-শরীয়াহ', 'উসূলুদ্দীন', 'আল-আক্বীদাহ' ইত্যাদি। [১] এসবের মধ্যে 'আকিদাহ' শব্দটিই অধিক প্রচলিত।

সামগ্রিক অর্থে আকিদা হল, ইসলামের যেসকল ভিত্তি কিতাব, সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের ঐক্যমত দ্বারা নির্দেশিত তা নির্দ্বিধায় অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা এবং বিনা বাক্যে মেনে নেওয়া এবং এক্ষেত্রে অন্তরে কোনো ধরনের কপটতার স্থান নাদেওয়া। সে সকল বিষয় হল: আল্লাহ, ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল, কেয়ামত, তাকদিরের ভালো ও মন্দে বিশ্বাস করা এবং কুরআনে যা কিছু এসেছে তার সমস্ত কিছুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা সেই সাথে নবী সা. যা কিছু আল্লাহর তরফ থেকে নিয়ে এসেছেন তা বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া। এছাড়াও অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহর একত্ববাদ এবং মহত্ত্ব, তার নির্দেশিত পথে উপাসনা করা, কুফরী বাতিল বা অসত্য হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, ইসলামে অবিশ্বাসী ও আল্লাহর সাথে অপরকে শরীককারী সকলের প্রতি

অস্বীকৃতি জ্ঞাপন, আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়া, তাঁকে দেখা ও হাশরের মাঠে তাঁর পুরস্কার ও পরিণতির প্রতি বিশ্বাস রাখাও আকিদার অন্তর্ভুক্ত।

ঈমান ও আকীদার সম্পর্ক

ঈমান অর্থ হলো স্বীকৃতি দেওয়া বা স্বীকার করা, যার তিনটি ধাপ, প্রথম ধাপটি হলো অন্তরে বিশ্বাসের মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান, দ্বিতীয় ধাপটি হলো মুখ দ্বারা অর্থাৎ প্রকাশ্যে বলে ঘোষণার মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান, আর তৃতীয় ধাপটি হলো কাজের মাধ্যমে বা কাজে পরিণত করার মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান। এর মধ্যে অন্তরে বিশ্বাসের মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান করার ধাপটি আকিদার বা বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যা ঈমানের মূল বা মৌলিক ভিত্তি বা শিকড়স্বরূপ। এর প্রমাণ বা দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদিসটিঃ

আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, ''তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন গর্হিত কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়। যদি (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, তাহলে নিজ জিভ দ্বারা (উপদেশ দিয়ে পরিবর্তন করে)। যদি (তাতেও) সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করে)। আর এ হল সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।''

— সহীহুল বুখারী ৯৫৬, মুসলিম ৪৯, তিরমিযী ২১৭২, নাসায়ী ৫০০৮, ৫০০৯, আবূ দাউদ ১১৪০, ৪৩৪০, ইবনু মাজাহ ১২৭৫, ৪০১৩, আহমাদ ১০৬৮৯, ১০৭৬৬, ১১০৬৮, ১১১০০, ১১১২২, ১১১৪৫, ১১৪৬৬, দারেমী ২৭৪০১

এছাড়া আলেমগণ আকীদা ও ঈমানের পার্থক্য করে বলেন যে, আকীদা বলতে ধর্মবিশ্বাসের সকল মত, পথ, প্রচলন, বৈচিত্র্য ও বর্ণালীকে বোঝায় আর ঈমান শুধু সুনির্দিষ্ট বিশুদ্ধ ইসলামী ধর্মবিশ্বাসকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া আরবি ভাষায় আভিধানিকভাবে আকীদা শব্দটির অর্থ বিশ্বাস, এবং ঈমান শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো স্বীকৃতি দেওয়া, স্বীকার করা বা মেনে নেওয়া। অর্থাৎ কোন বিষয়ে বিশ্বাসের

প্রকৃতি বা ধরনের নাম হলো আকীদা, আর কোন আকীদা বা বিশ্বাসকে স্বীকৃতি দেওয়া বা মেনে নেওয়ার নাম হলো তার উপর ঈমান আনা।

সূচনা

ইসলামি আকিদার একমাত্র উৎস হচ্ছে ওহী। ইসলামি বিশ্বাস অনুসারে দু প্রকারের ওহী প্রেরিত হয়েছে : কিতাব (কুরআন) ও সুন্নাত (হাদীস)। কুরআন অনুসারে আল্লাহ রাসূলের প্রতি কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন।[৫] হিকমতকে রাসূলের সুন্নাহ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। কুরআনের সাথে সুন্নাহর পার্থক্য হল, সুন্নাহর শব্দাবলী আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। তবে উভয়টিরই তথ্যসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত।[৬]

কর্ম বা আমলের বিষয়ে ইসলামের বিধান নির্ণয়ে কিয়াস বা অনুমানের উপরে নির্ভর করা যায়। কিন্তু ইসলামি বিশ্বাস গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ের উপর নয়। মুসলিম পণ্ডিতদের মতে, এ সকল বিষয়ে মানুষ ওহীর নির্দেশনা ছাড়া অনুমান করে অথবা গবেষণা করে কোনো সমাধান দিতে সক্ষম নয়। এছাড়া ওহীর ব্যাখ্যা সেভাবেই করতে হয়,যেভাবে সাহাবী ও তাবেয়ীগণ ব্যাখ্যা করেছেন।

বিশ্বাসের ছয়টি স্তম্ভ

ঈমানের বা ইসলামি আকীদা বিশ্বাসের উপর স্বীকৃতির ছয়টি বা মতান্তরে সাতটি স্তম্ভ এসেছে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে (আরকান আল-ঈমান)[৭]। যা সব মুসলমানদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে। বিশ্বাসের স্তম্ভগুলো হল:

1. আল্লাহকে বিশ্বাস
2. ফেরেস্তাগণকে বিশ্বাস
3. আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত কিতাবসমূহে বিশ্বাস (কুরআনসহ)
4. আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত সকল নবী এবং রাসুলকে বিশ্বাস

5. আখিরাত বা পরকালে বিশ্বাস

6. তাকদীরে বিশ্বাস

7. পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস

উমার বলেন,

একদিন আমরা আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট বসেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি আমাদের সামনে উপস্থিত হয় ..... এরপর বলল: "আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন"। তিনি বললেন: "তা হচ্ছে এই- আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও আখেরাতের উপর ঈমান আনা এবং তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনা।"..... [সহীহ্ মুসলিম, হাদীসটি জিবরাঈলের হাদীস নামে পরিচিত]

তাওহীদ

মূল নিবন্ধসমূহ: তাওহিদ, রব, ইলাহ ও আসমাউল হুসনা

তাওহিদ (আরবি: توحيد) ইসলাম ধর্মে এক আল্লাহর ধারণাকে বোঝায়।[৯] তাওহিদ শব্দের অর্থ একত্ববাদ।[১০] ইসলামি পরিভাষায় তাওহিদ হল সৃষ্টি ও পরিচালনায় আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে বিশ্বাস করা, সকল ইবাদাত-উপাসনা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য করা, অন্য সবকিছুর উপাসনা ত্যাগ করা, আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ ও সুউচ্চ গুণাবলীকে তার জন্য সাব্যস্ত করা এবং দোষ ত্রুটি থেকে আল্লাহকে পবিত্র ও মুক্ত ঘোষণা করা।

ঈমান

ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ স্বীকার করা, স্বীকৃতি দেওয়া, মতান্তরে দৃঢ় বিশ্বাস করা। ইসলাম ধর্মে ঈমানের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক[১৩]। ঈমানের সাতটি স্তম্ভ হচ্ছেঃ

এক. একক ইলাহ হিসেবে আল্লাহকে বিশ্বাস করা।

দুই. আল্লাহর ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস করা।

তিন. সমস্ত আসমানী কিতাব সমূহতে বিশ্বাস।

চার. সকল নবী ও রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস।

পাঁচ.তাক্বদীর বা ভালো মন্দের ওপর আল্লাহর ক্ষমতা রয়েছে বলে বিশ্বাস করা।

ছয়. আখিরাত বা পরকালের প্রতি বিশ্বাস।

সাত. মৃত্যুর পর পুনঃজীবিত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস।

আল-কোরআনের সূরা-বাকারা এর দুই হতে চার আয়াতে ঈমান সম্পর্কে এই বিষয় গুলি উল্লেখ করা হয়েছে।

জিব্রাঈলের হাদীস: জিব্রাইলের হাদিসে "হে আল্লাহর রসূল, ইসলাম কি?" প্রশ্নের উত্তরে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ (তাওহিদ, সালাত, সাওম, জাকাত, হজ) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই হাদিসটিকে কখনও কখনও "সত্যিকারের প্রথম এবং সবচেয়ে মৌলিক আক্বীদা" বলা হয়।

সালাত

নামাজ/নামায বা সালাত বা সালাহ্ ইসলাম ধর্মের একটি দৈনিক নিয়মিত ইবাদত। একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নামাজ আদায় করতে হয় যা কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত আছে। এটি মুসলমানদের জন্য প্রতিদিন অবশ্যকরণীয় একটি ধর্মীয় কাজ। তবে প্রতিদিন আবশ্যকরণীয় বা ফরজ ছাড়াও বিবিধ নামাজ রয়েছে যা সময়ভিত্তিক বা বিষয়ভিত্তিক।

সালাত একটি সুনির্দিষ্ট প্রকৃতির ইবাদত যার পদ্ধতি ‘ইসলামী শরী‘আতে পরিপূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। নামাজ ‘তাকবিরে তাহরিমা’ দ্বারা শুরু হয় ও ‘সালাম ফিরানো’ দ্বারা শেষ হয়’।[১৯]

নামাজ (সালাত) ইসলামের পাঁচটি রোকনের মধ্যে দ্বিতীয় রোকন। নামাজ প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধি-জ্ঞান সম্পন্ন, নারী পুরুষ নির্বিশেষে, প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ বা অবশ্যকরণীয়।

সাওম

রোযা বা রোজা (ফার্সি روزه *রুজ়ে*), সাউম বা সাওম (আরবি صوم *স্বাউম্*, অর্থঃ সংযম), বা *সিয়াম* ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মূল ভিত্তির তৃতীয়। সুবহে সাদেক বা ভোরের সূক্ষ আলো থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার,পাপাচার, কামাচার এবং সেই সাথে যাবতীয় ভোগ-বিলাস থেকেও বিরত থাকার নাম রোযা। ইসলামী বিধান অনুসারে, প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের জন্য রমযান মাসের প্রতি দিন রোজা রাখা ফরজ, (فرض *ফ়ার্দ্ব*) যার অর্থ অবশ্য পালনীয়।

যাকাত

যাকাত (আরবি: زكاة *zakāt*, "যা পরিশুদ্ধ করে", আরও আরবি: زكاة ألمال, "সম্পদের যাকাত"[২০]) হলো ইসলাম ধর্মের পঞ্চস্তম্ভের একটি। প্রত্যেক স্বাধীন, পূর্ণবয়স্ক মুসলমান নর-নারীকে প্রতি বছর স্বীয় আয় ও সম্পত্তির একটি নির্দিষ্ট অংশ, যদি তা ইসলামী শরিয়ত নির্ধারিত সীমা (নিসাব পরিমাণ) অতিক্রম করে তবে[২১], গরীব-দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণের নিয়মকে যাকাত বলা হয়।[২২][২৩] সাধারণত নির্ধারিত সীমার অধিক সম্পত্তি হিজরি ১ বছর ধরে থাকলে মোট সম্পত্তির ২.৫ শতাংশ (২.৫%) বা ১/৪০ অংশ[২৪][২৫][২৬] বিতরণ করতে হয়। ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে হজ্জ্ব এবং যাকাত শুধু শর্তসাপেক্ষ যে, তা সম্পদশালীদের জন্য ফরয বা আবশ্যিক হয়। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআনে "যাকাত" শব্দের উল্লেখ এসেছে ৩২ বার। নামাজের পরে সবচেয়ে বেশি বার এটি উল্লেখ করা হয়েছে।

হজ্জ

হজ্ব বা *হজ্জ* বা *হজ* (আরবি: حج) ইসলাম ধর্মাবলম্বী অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য একটি আবশ্যকীয় ইবাদত বা ধর্মীয় উপাসনা। এটি ইসলাম ধর্মের চতুর্থ স্তম্ভ। শারীরিক ও আর্থিকভাবে সক্ষম প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য জীবনে একবার হজ সম্পাদন করা ফরজ বা আবশ্যিক।[২৮][২৯][৩০] আরবি জিলহজ মাসের ৮ থেকে ১২ তারিখ হজের জন্য নির্ধরিত সময়।[৩১][৩২] হজ পালনের জন্য বর্তমান সৌদি আরবের মক্কা নগরী এবং সন্নিহিত মিনা, আরাফাত, মুযদালিফা প্রভৃতি স্থানে গমন এবং অবস্থান আবশ্যক। এটি পৃথিবীর বাৎসরিক তীর্থযাত্রা।[৩৩] শারীরিক ও আর্থিকভাবে হজ পালনে সক্ষম হয়ে ওঠার অবস্থাকে ইস্তিতাহ বলা হয় এবং যে মুসলমান এই শর্ত পূরণ করে তাকে মুস্তি বলা হয়। হজ হ'ল মুসলিম জনগণের সংহতি, এবং আল্লাহর নিকটে তাদের আনুগত্যের প্রদর্শনী।[৩৪][৩৫] যিনি হজ সম্পাদনের জন্য গমন করেন তাকে বলা হয় হাজী। হজ শব্দের অর্থ "একটি যাত্রায় অংশ নেওয়া", যা ভ্রমণের বাহ্যিক কাজ এবং উদ্দেশ্যগুলির অভ্যন্তরীণ কাজ উভয়কেই বোঝায়।

জিহাদ

জিহাদ (আরবি: جهاد), যার অর্থ সংগ্রাম; কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লাভের জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োগ করাকে বোঝানো হয়। এর আভিধানিক অর্থ পরিশ্রম,সাধনা,কষ্ট, চেষ্টা ইত্যাদি। তবে সচরাচর ইসলামী পারিভাষিক অর্থে 'জিহাদ' কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কুরআনে জিহাদের কথা ৪১ বার উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে "আল্লাহের পথে সংগ্রাম করা" অর্থে 'জিহাদ' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।[৩৭][৩৮] জিহাদের সাথে জড়িত ব্যক্তিকে মুজাহিদ বলা হয়। জিহাদকে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসাবে গণ্য করা হয়। কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী স্থানভেদে জিহাদ তিন রূপ হতে

পারেঃ (ক) পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য স্বীয় কুপ্রবৃত্তির বিরূদ্ধে জিহাদ, (খ) মুসলিম সমাজকে উন্নয়নের সংগ্রাম, এবং (গ) যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রাম।

দাওয়াত

দা'ওয়াহ বা *দাওয়াহ* (আরবি: دعوة, প্রতিবর্ণীকৃত: *"আমন্ত্রণ"*) মানে ইসলামের প্রচার। দা'ওয়াহ আক্ষরিক অর্থে "আমন্ত্রণ" করাকে বোঝায়, ক্রিয়ার সক্রিয় অংশগ্রহণ যার অর্থ বিভিন্নভাবে "ডাকা" বা "আমন্ত্রণ জানানো"। একজন মুসলিম যিনি ধর্মীয় কর্মী হিসাবে বা স্বেচ্ছাসেবক সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় দা'ওয়াহ অনুশীলন করেন, তাকে দাঈ, বহুবচন দু'আত বলা হয়। এইভাবে একজন দাঈ এমন একজন ব্যক্তি যিনি মানুষকে একটি সংলাপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইসলাম বোঝার জন্য আমন্ত্রণ জানান, এবং কিছু ক্ষেত্রে মিশনারির ইসলামিক সমতুল্য হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে, যিনি মানুষকে বিশ্বাস, প্রার্থনা বা ইসলামিক জীবনে আমন্ত্রণ জানান।ইলমুল আখিরাত বা পরকালবিদ্যা আখিরাত (আরবি: الآخرة) একটি ইসলামী শব্দ যেটির দ্বারা মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে বোঝানো হয়।[৪১] মুসলিমদের বিশ্বাস অনুযায়ী আখিরাত বা পরকালের জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। আখিরাতে মানুষের দুনিয়ার কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে এবং অতঃপর ভালো কাজের জন্য পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে।

পরকালবিদ্যা ও গুরুত্ব

ইসলামী সকল পণ্ডিতগণ বলে থাকেন যে, প্রথমত আকীদা বা বিশ্বাস দ্বিতীয়ত মানহাজ বা পদ্ধতি সঠিক না হলে আমল আল্লাহর নিকট কবুল হয় না। অর্থাৎ আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হলো প্রথমত আকীদা বা বিশ্বাস ঠিক হওয়া ও দ্বিতীয়ত মানহাজ বা পদ্ধতি ঠিক হওয়া। সালাফি আলেমদের মতে, মানহাজ বা পদ্ধতির দ্বারাই আকীদা বা বিশ্বাস নির্ধারিত হয়, তাই তারা বলেন, সকল কাজের মানহাজ বা পদ্ধতির ক্ষেত্রে সালাফদের পূর্নাঙ্গ অনুসরণ করা উচিৎ, কারণ তাদের মতে, একমাত্র এর মাধ্যমে

ইসলামী সঠিক আকীদা বা বিশ্বাস ধারণ করা ও আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য আমল সম্পাদন করা সম্ভব।মনজুর এলাহি তার "সমাজ সংস্কারে সঠিক আকীদার গুরুত্ব" বইতে "সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও সে ক্ষেত্রে সঠিক ইসলামী আকীদার ভূমিকা ও গুরুত্ব" সম্পর্কে বলেন, মানুষ তার ব্যক্তি জীবনের সকল চাহিদা মেটানোর জন্যই সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে। যে কোনো সমাজ গঠনের প্রধান লক্ষ্যই হল সে সমাজের সকল সভ্যের সার্বিক কল্যাণ সাধন ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিতকরণ। কিন্তু ব্যক্তি জীবনের অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও স্বার্থপরতা সমাজ জীবনে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলে সমাজকে দুর্নীতি, বৈষম্য, বিভক্তি, হানাহানি প্রভৃতি ব্যাধিতে কলুষিত ও বিষাক্ত করে তোলে। তখনই দেখা দেয় সমাজ সংস্কারের বিরাট প্রয়োজনীয়তা, যেমনটি আমরা অনুভব করছি আমাদের বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে। সমাজের বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি সমস্যা জর্জরিত দুর্নীতিগ্রস্ত ঘুণে ধরা এ সমাজের মানুষের মধ্যে সঠিক আকীদার জ্ঞান নেই বললেই চলে। এরই অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে আকীদায় অনৈক্য এবং প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী যার যেমন ইচ্ছা তেমন আকীদা পোষণ, কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক এর যথার্থতা থাকুক বা নাই থাকুক। অন্যদিকে মানুষের ঈমান হয়ে পড়েছে অত্যন্ত দুর্বল, অন্তর থেকে তাকওয়ার বিদায় ঘটেছে, পরকালীন শাস্তির কথা সে বিস্মৃত হয়েছে। ফলে সমাজে দেখা দিয়েছে অস্থিরতা, অস্থিতিশীলতা, লুটে-পুটে খাওয়ার প্রবণতা, নানা প্রকার সন্ত্রাস ও অপসংস্কৃতির বিস্তার ইত্যাদি আরো অনেক সমস্যা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাতে আমরা দেখি তিনি তৎকালীন জাহেলী সমাজকে বদলে দিয়ে একে পরিণত করেছিলেন তখনকার সর্বোৎকৃষ্ট সমাজে। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনের যে আন্দোলন তিনি শুরু করেছিলেন নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে, তার প্রাথমিক প্রক্রিয়াই ছিল আকীদাগত সংস্কার। এ সম্পর্কে সাইয়েদ কুতুব তার مقومات التصور الإسلامي (ইসলামিক উপলব্ধির উপাদান) গ্রন্থে বলেন:

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন এমন এক সময়ে যখন জাযিরাতুল আরব উত্তরে রোমান ও দক্ষিণে পারস্যের মধ্যে লুটেরা সম্পদ হিসাবে

বন্টিত ছিল। এরা তাদের হাত প্রসারিত করেছিল জাযিরাতুল আরবের উর্বর ভূমি, সমুদ্রোপকুল, সম্পদ ও বাণিজ্যের সকল উৎসের প্রতি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনই এক সময়ে প্রেরিত হয়েছেন যখন বিরাজমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা দাসত্ব যুগের প্রতিনিধিত্ব করত বিপুল সমারোহে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনই এক সময়ে প্রেরিত হয়েছেন যখন মদ, যেনা, জুয়া, খেল-তামাশা, মন্দ ও বিপর্যয় সৃষ্টিতে মানব চরিত্র জাহেলিয়াতের ধারায় বহমান ছিল। এ সবের কোনোটি দিয়েই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংস্কার কাজ শুরু করেননি। জাযিরাতুল আরবের উর্বর ভূমি থেকে রোমান ও পারসীদের তাড়ানোর জন্য তিনি জাতীয়বাদী ঐক্যের দিকে আরবদেরকে আহ্বান করতে সক্ষম ছিলেন। যুদ্ধের সকল শক্তি তিনি তাদের ব্যাপারে নিয়োগ করতে পারতেন এবং জাতীয় শত্রুদের প্রতি তিনি আরবদের ক্ষেপিয়ে তুলতে পারতেন। ফলত তারা তার নেতৃত্বের প্রতি অনুগত হত এবং তাদের সকল হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে যেত।......কিন্তু আল্লাহ জানতেন, তিনি তাঁর নবীকে জানিয়েছিলেন এবং নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে, এটা সঠিক পথ নয় এবং এটা মূল কাজ নয়। মূলকাজ হচ্ছে মানুষ তার সত্যিকার রবকে জানা এবং শুধু তাঁরই দাসত্ব মেনে নেওয়া, আর তাঁর বান্দাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়া এবং পরিশেষে আল্লাহর কাছ থেকে যা-ই তাদের কাছে আসে তার সব কিছু গ্রহণ করা....”।

...লক্ষ্যণীয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াতের পর মাক্কী জীবনের ১৩ বৎসরে আকীদা বিষয়ক জ্ঞান প্রচারের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। নবী সা. ই শুধু নয়, বরং সকল নবী ও রাসূলগণের প্রথম কাজই ছিল সঠিক আকীদার প্রতি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে আহবান। আল-কুরআনের ভাষায় তাদের সেই আহবান ছিল: “হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো সত্যিকার ইলাহ নেই।” [আল-আ‘রাফ: ৫৮] এর কারণ ছিল একটিই, আকীদা শুদ্ধ না হলে ব্যক্তি জীবন শুদ্ধ হয় না, আর ব্যক্তি শুদ্ধ না হলে সমাজও শুদ্ধ হয় না।

...(১) বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য স্থাপনে সঠিক আকীদার ভূমিকা: সঠিক আকীদার উপর একমত হওয়া ছাড়া বৃহত্তর ঐক্য স্থাপন করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সারা বিশ্বের

মুসলিম উম্মাহর পক্ষেও ঐক্যবদ্ধ হওয়া সুদূর পরাহত। এ প্রসঙ্গে (ড.) উমার সুলায়মান আল-আশকার বলেন: "একই আকীদা যতক্ষণ মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম ঐক্য বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব না।" প্রকৃতপক্ষে আকীদাগত বিভ্রান্তিই সমাজে অনৈক্যের বীজ বপন করে। সমাজ হয়ে পড়ে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত। যদি প্রশ্ন উঠে যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ আকীদা ও বিশ্বাসকে সঠিক বলে মনে করে। সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো আকীদাকে সঠিক ধরে নিয়ে একমত হওয়া সম্ভব হবে না। কারণ প্রত্যেক দল নিজ মতের প্রতি আস্থাশীল। এ প্রশ্নের উত্তরে (ড.) উমার সুলাইমান আল-আশকার বলেন: "বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদা বিষয়ে কুরআন ও সুন্নায় স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। এ আকীদার প্রতিটি মৌলিক ও খুটিঁনাটি বিষয়ে দলীল পেশ করা সম্ভব। আর সালাফে সালেহীন সত্য ইসলামী আকীদার উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তারা এ আকীদা এতটাই ভালোভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, তা ফেরকাবাজী ও বিভ্রান্ত লোকদের আকীদা থেকে পুরোপুরি পৃথক। এ মহান ব্যক্তিত্বদের মধ্যে রয়েছেন আল্লামা ত্বহাবী, যিনি একটি আকীদা গ্রন্থ লিখেন যা তার নিজের নামেই বিখ্যাত। এ গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখেছেন মুহাম্মাদ ইবন আবিল ইয্ আল-হানাফী। বিষয়টি এখানেই থেমে থাকেনি, বরং সহীহ আকীদার উপর বহু আলেম এর আগে ও পরে লিখেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আহমাদ, ইবনু তাইমিয়াহ, শওকানী ও সাফারীনী প্রমুখ।"

(২) দুর্নীতি, রাহাজানি, যুলুম-নির্যাতনমুক্ত সুশীল সমাজ গঠনে সঠিক আকীদা এমন একটি মজবুত ভিত তৈরী করে।যার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় সমাজের সকল কাজ-কর্ম, পারস্পরিক লেন-দেন। অতএব আকীদা যদি হয় বিকৃত বিভ্রান্ত ও মিথ্যার উপর স্থাপিত, তাহলে সামাজিক জীবন হয়ে পড়বে বিপন্ন, বিপর্যস্ত ও ধ্বংসের মুখোমুখী। আজ আমাদের সমাজ যে অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে, তার কারণ মূলত এটাই। সুতরাং সমাজকে বিকৃতি, বিপর্যয় ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে সঠিক আকীদার দিকেই ফিরে আসতে হবে।

(৩) সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সঠিক আকীদায় গুরুত্ব: একজন মুসলিম ব্যক্তির আকীদার অবিচ্ছেদ্য অংশ এই যে, সে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুম অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করাকে অপরিহার্য মনে করে এবং তাদের হুকুমের নাফরমানী করা অবৈধ বলে বিশ্বাস করে। আল্লাহ বলেন: "আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না।" [আল-আহযাব: ৩৬] সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা যখন মুসলিমদেরকে পরস্পরের ভাই বলে অভিহিত করেন, কোনো ব্যক্তির জান ও মালের উপর চড়াও হওয়াকে গুরুতর অপরাধ বলে সনাক্ত করেন, চুক্তিবদ্ধ সকল অমুসলিমের সাথে কৃত চুক্তি পালনের নির্দেশ প্রদান করেন, সে তখন দ্বিধাহীন চিত্তে সে নির্দেশ মেনে নেয়, কেননা এভাবে মেনে নেয়াটা তার আকীদারই অংশ। আল্লাহ বলেন: "অতএব তোমাদের রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।" [আন-নিসা: ৬৫]

(৪) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নে সঠিক আকীদার গুরুত্ব: ইসলামী আকীদার অপরিহার্য একটি মৌলিক বিষয় হচ্ছে এ বিষয়ে দৃঢ় ঈমান রাখা যে, আল্লাহ যেমন এ বিশ্ব জগতের সৃষ্টি কর্তা, তেমনি তিনিই এর শাসন-কর্তৃত্ব ও নির্দেশের মালিক। আল্লাহ বলেন: "জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই।" [আল-আরাফ: ৫৪] "বল, নিশ্চয় সব বিষয় আল্লাহর।" [আলে ইমরান: ১৫৪] "হুকুম তো কেবল আল্লাহরই।" [আল-আন'আম: ৫৭] এছাড়া আল্লাহই সকল সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক এবং একমাত্র আইনদাতা ও বিধানদাতা। এটা তাকে রব হিসাবে মেনে নেয়ারই অন্যতম অর্থ। আমাদের সমাজে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তখনই ফিরে আসতে পারে যখন এ আকীদার প্রতি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দৃঢ় প্রত্যয় থাকবে। মূলত মানব রচিত আইন দিয়ে কোনো মুসলিম সমাজেই শান্তি, শৃংখলা ও স্থিতিশীলতা আসতে পারে না। সম্ভবত বাস্তবতাই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ ও সাক্ষী।

(৫) অপসংস্কৃতি রোধে সঠিক আকীদার গুরুত্ব: বিজাতীয় ভিনদেশী ও ভিন্ন ধর্মের অনুকরণে আমাদের বাংলাদেশী সমাজে সংস্কৃতির নামে বর্তমানে যে সব কিছুর চর্চা হচ্ছে, তাকে অপসংস্কৃতি নামে অভিহিত করলে বোধকরি কোনো অত্যুক্তি হবে না। কেননা এসব সংস্কৃতি যেমনি আমাদের দেশীয় চিন্তা-চেতনা ও ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে না, তেমনি তা মুসলিম আকীদার সাথে বহুলাংশেই সাংঘর্ষিক। স্মরণ রাখতে হবে আমাদের এ দেশটি মুসলিম প্রধান দেশ। তাই যদি আমরা আমাদের সকল সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানকে সঠিক ইসলামী আকীদার আলোকে বিন্যস্ত করি, তাহলেই দেশ উপহার পেতে পারে একটি সুন্দর, রুচিশীল, শালীন ও সুস্থ-সংস্কৃতি।

(৬) চিন্তার ক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও বিভ্রান্তি এবং শির্ক ও বেদ'আত থেকে সমাজকে মুক্ত করার ব্যাপারে সঠিক আকীদার গুরুত্ব: সঠিক ইসলামী আকীদার জ্ঞানই পারে সমাজের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর চিন্তা জগতকে আলোকিত করতে যা দিয়ে তারা জাতিকে দিতে পারবেন সত্য পথের দিশা। আজ একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবিদের চিন্তার ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য ও বিভ্রান্তি আমরা লক্ষ্য করছি, মুসলিম নামধারী হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের বিরুদ্ধে তারা যে কলমযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে তার সম্ভবত সবচেয়ে বড় কারণ এই যে, ইসলামকে তারা বিকৃতভাবে জেনেছেন, সঠিক ইসলামী আকীদা অর্জনের সৌভাগ্য তাদের হয় নি। একই কথা প্রযোজ্য সে সকল শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মুসলিমদের ক্ষেত্রেও যারা ইবাদাত মনে করে শির্ক ও বেদ'আতের মধ্যে নিমজ্জিত। কুরআন ও সুন্নার আলোকে তারা শির্ক ও বেদ'আতের পরিচয় পায় নি। শির্ক ও বেদ'আতকে চেনার যে সকল মূলনীতি রয়েছে তারা সেসব সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল। সঠিক আকীদার প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আকীদার জ্ঞান অর্জনই নিশ্চয়তা দিতে পারে এসব বিভ্রান্তি এবং শির্ক ও বেদ'আত থেকে সমাজের সবাইকে মুক্ত করার।

অতএব সহীহ ইসলামী আকীদার জ্ঞান অর্জনই আল্লাহর প্রকৃত মু'মিন ও মুসলিম বান্দা হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার একমাত্র পন্থা। অনুরূপভাবে একটি সমাজকে পরিপূর্ণ ইসলামী সমাজ রূপে গড়ে তুলতে চাইলে সমাজের সকলকে সহীহ আকীদার জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার কোনো বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইসলামী

সংগঠনগুলোকে গুরু দায়িত্ব পালন করতে হবে। ইসলামী শরীয়াহ ও স্টাডিজের উপর যারা দক্ষ তারা সহীহ আকিদা বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করে এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় লিখিত বইয়ের যে অপ্রতুলতা রয়েছে তা দূর করতে পারেন। এ ব্যাপারে মসজিদের ইমাম, খতিব ও মাদরাসা শিক্ষকদের সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য তার আগে তাদেরকে সহীহ আকিদার জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে হবে। সহীহ আকিদা প্রসারের প্রচেষ্টার মাধ্যমে এভাবে আমাদের সমাজ গড়ে ওঠতে পারে শির্ক ও বেদ'আতমুক্ত একটি সুন্দর সুশীল সমাজ হিসাবে।

আকিদার মতবাদসমূহ

প্রথাগত সুন্নি মতবাদসমূহ

1. কালাম

   কালাম (সুন্নি)

   1. আশআরী(সুন্নি)
   2. মাতুরিদি (সুন্নি)

2. আছারী (সুন্নি)

কালাম:

আরও দেখুন: ইসলামী দর্শন ও সুফি অধিবিদ্যা

কালাম, অর্থাৎ *ইলমুল কালাম* (বাচনের প্রজ্ঞা) হচ্ছে ধর্মতত্ত্বের মূলনীতিসমূহকে পারম্পারিক যুক্তিতর্কের মাধ্যমে অনুসন্ধান করার ইসলামি দর্শন। আরবি ভাষায়, কালাম শব্দের অর্থ হলো "কথা"। কালামে পারদর্শী পন্ডিতকে বলা হয় মুতাকাল্লিম (মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদ, বহুবচনে মুতাকাল্লিমীন)।

মনজুর এলাহি তার "সমাজ সংস্কারে সঠিক আকীদার গুরুত্ব" বইতে কালামশাস্ত্র সম্পর্কে বলেন

মুতাকাল্লিমীনগণ আকীদা শাস্ত্রকে ‘‘ইলমুল কালাম’’ এবং দার্শনিকগণ ‘‘আল-ফালসাফা আল-ইসলামিয়্যাহ’’ বা ইসলামী দর্শন, ‘‘আল-ইলাহিয়্যাত’’ ও ‘‘মেটাফিজিক্স’’ (অতিপ্রাকৃতিকতা) নামে অভিহিত করেছেন। শেষোক্ত এ নামগুলো সম্পর্কে ড. নাসের আল-আকল সহ আরো অনেকে বলেন যে, ইসলামী আকীদাকে এসকল নামে অভিহিত করা মোটেই শুদ্ধ নয়। এর কারণ বর্ণনায় মুহাম্মদ ইবরাহীম আল হামাদ বলেন, ‘‘কেননা ইলমুল কালামের উৎস হল মানব বুদ্ধি-বিবেক, যা হিন্দু ও গ্রিক দর্শন নির্ভর। পক্ষান্তরে তাওহীদের মূল উৎস হল ওহী। তাছাড়া ইলমুল কালামের মধ্যে রয়েছে অস্থিরতা, ভারসাম্যহীনতা, অজ্ঞতা ও সংশয়-সন্দেহ। এজন্যই সালাফে সালেহীন ইলমুল কালামের নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। আর তাওহীদ হল জ্ঞান, দৃঢ় বিশ্বাস ও ঈমান নির্ভর,..... আরেকটি কারণ এও বলা যেতে পারে যে, দর্শনের ভিত্তি অনুমান, বাতিল আকীদা, কাল্পনিক চিন্তা ও কুসংস্কারচ্ছন্ন ধারণার উপর স্থাপিত’’। ইমাম হারাওয়ী ذم الكلام وأهله নামে ৫ খন্ডের একটি বই এবং ইমাম গাযযালী تهافت الفلاسفة নামে একটি বই রচনা করেছেন। এছাড়া ‘ইলমুল কালাম’ ও ‘ফালসাফা’ যে সঠিক ইসলামী আকীদার প্রতিনিধিত্ব করে না, সে বিষয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়েমসহ আরো বহু মুসলিম স্কলার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

মুতাজিলা

ইবাদি (খারেজি)

মুজাতিলা মতাবলম্বীরা মানুষ ও তাদের স্রষ্টার মধ্যকার সম্পর্কের মধ্যে অদৃষ্টবাদের উপর মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে জোড় দেয় এবং ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতার উপর ঈশ্বরের ন্যায়বিচারকে অর্পণ করে। মুতাজিলা মতাবলম্বীরাও কুরআনের প্রকৃত অর্থ নির্ধারণের জন্য যুক্তির ব্যবহারে বিশ্বাস করে। এটি এবং ইজতিহাদের মূলনীতি, তাদের গতিশীল ফিকহের প্রতি বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করেছিল।

আশআরী

আশ'আরিবাদ বা আশআরী আকিদা বা আশ'আরি ধর্মতত্ত্ব[৪৪][৪৫] (আরবি: أشعرية, প্রতিবর্ণীকৃত: al-ʾAšʿarīyah বা الأشاعرة) হল সুন্নি ইসলামের প্রধানতম ধর্মতাত্ত্বিক মাজহাব যা শাস্ত্রীয় কর্তৃত্ব, যৌক্তিকতা[৪৬][৪৭] এবং অর্ধ-যুক্তিবাদের[৪৬][৪৮][৪৯][৫০] ভিত্তিতে সর্বজনগৃহীত আকিদাগত দিকনির্দেশনা প্রদান করে।[৫১] আরব ধর্মতত্ত্ববিদ আবুল হাসান আল-আশআরি এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।[৫২] এই মতাবলম্বীদের আশ'আরি[৪৬] এবং মতবাদকে আশ'আরি মাজহাব[৪৬] নামেও অবিহিত করা হয়। আশ'আরিবাদ সুন্নি ইসলামের সবচেয়ে প্রভাবশালী ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তাধারা।[৫৩] এটিকে মাতুরিদি[৫৪][৫৫] ও আসারি মাজহাবের পাশাপাশি সুন্নি ইসলামের অন্যতম অর্থোডক্স ধর্মতাত্ত্বিক মাজহাব হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মাতুরিদি

মাতুরিদি (আরবি: الماتريدية) হল সুন্নি ইসলামের অন্তর্গত অন্যতম প্রধান ধর্মতাত্ত্বিক মাজহাব। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন আবু মনসুর আল-মাতুরিদি যিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নিদের মধ্যে ইতোমধ্যে বিদ্যমান আকিদাগুলোকে একটি সুসংবদ্ধ কালামশাস্ত্রীয় চিন্তাধারায় উপনীত করেন এবং যৌক্তিকতা[৫৭] ও যুক্তিবাদের[৫৮][৫৯] ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মাতুরিদি মতবাদকে আশআরি মতবাদের পাশাপাশি সর্বজনগৃহীত বা অর্থডক্স সুন্নি আকিদা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৬০]

মাতুরিদিবাদ পারস্যের সুন্নি মুসলমান, হানাফি ও আহলে আর রায়ের মাঝে বরাবরই প্রভাবশালী ছিল এবং অটোমান সাম্রাজ্য ও মোগল সাম্রাজ্যে অগ্রগণ্য মাজহাবের মর্যাদা লাভ করেছিল। এর বাইরে অধিকাংশ তুর্ক, মধ্য এশীয় ও দক্ষিণ এশীয় সুন্নি মুসলমানরা মাতুরিদি আকিদায় বিশ্বাসী। আরব মুসলিমদের মধ্যেও মাতুরিদিবাদী পণ্ডিত বিদ্যমান।[৬১]

পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, তুর্কিস্তান, আমু দরিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় এলাকাসমূহ, যেমন: উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, বুখারা, সমরকন্দ, তাশখন্দ, তিরমিজ ইত্যাদি অঞ্চলের অধিকাংশ মুসলমান মাতুরিদি মতাবলম্বী।

আছারী

আসারি (আরবি: الأثرية, *"আল-আসারিয়্যাহ"*), অন্যান্য নাম: *সনাতনবাদী ধর্মতত্ত্ব, প্রথাবাদী ধর্মতত্ত্ব, ঐতিহ্যবাদী ধর্মতত্ত্ব, পরম্পরাবাদী ধর্মতত্ত্ব* বা *মূলগ্রন্থবাদী ধর্মতত্ত্ব* বা *ইসলামী অক্ষরবাদী ধর্মতত্ত্ব,* হলো একটি ইসলামি পাণ্ডিত্যনির্ভর আন্দোলন, যা ৮ম শতাব্দীর শেষের দিকে উদ্ভূত হয়, যারা কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জাহির অর্থবাচকতার সমর্থনের ফলশ্রুতিতে ইলমুল কালামকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে।[৬২][৬৩] এই নামটি কৌশলগত দৃষ্টিকোণ হতে আরবি শব্দ "হাদিস"-এর অনুবাদ হিসেবে আছার (প্রথা বা ঐতিহ্য) নামক শব্দ থেকে এসেছে। একে মাঝেমধ্যে অন্যান্য নামেও ডাকা হয়, যেমন সহীহ আকীদা, সালাফী আকীদা, আহলে হাদীস আকীদা, সালফে সালেহীনদের আকীদা ইত্যাদি।

ঐতিহ্যবাদী ধর্মতত্ত্বের অনুসারীগণ কুরআনের *জাহির* (আক্ষরিক, প্রত্যক্ষ) অর্থে বিশ্বাস করে এবং হাদিস হলো তাদের বিশ্বাস ও আইনকানুনের সকল বিষয়ে বিধিবিধানের একমাত্র ভিত্তি এবং তাদের কাছে যৌক্তিক সমালোচনা হল নিষিদ্ধ, এমনকি যদি তা সত্য যাচাই করার জন্য হয় তবুও।[৬৪] তাঁরা কুরআনকে আক্ষরিক অর্থে পড়ে থাকে এবং তাঁরা কুরআনকে রূপকার্থে ব্যাখ্যা করার (*তা'উইল*) বিরোধিতা করে। তাঁরা কুরআনের অর্থকে যুক্তির ভিত্তিতে ধারণা করার প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকে এবং তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের বাস্তবতা শুধু আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা উচিত, যাকে *তাফউইদ* বলা হয়।[৬৫] মোটকথা, কুরআন ও হাদিসের লেখনীকে তাঁরা কোনো রকম প্রশ্ন করা ব্যতিরেকে গ্রহণ করে থাকে, যাকে বলা হয় "বি-লা কাইফা", যার ফলে এই মতবাদটিকে কুরআনীয় অক্ষরবাদী বা ইসলামী অক্ষরবাদী মতবাদও বলা হয়ে থাকে।

ঐতিহ্যবাদী ধর্মতত্ত্ব বা আসারি মতবাদ মুহাদ্দিসদের মাঝে বিস্তৃতি লাভ করে, যারা পরবর্তীতে আহমদ ইবনে হাম্বলের (৭৮০-৮১৫) অনুসরণে "আহলুল হাদিস" নামে একটি আন্দোলনের মাধ্যমে সংগঠিত হন।[৬৬] ধর্মবিশ্বাসের বিষয়সমূহে, তাঁরা মুতাজিলা ও সমসাময়িক অন্যান্য ধর্মতত্ত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, এবং তারা সেসকল ধর্মতত্ত্বের মূলনীতির বিভিন্ন বিষয়কে দোষারোপ করতো, যার মধ্যে অন্যতম ছিল অন্যান্যদের নিজস্ব আত্মরক্ষামূলক যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যাপদ্ধতি।[৬৬] ১০ম শতাব্দীতে, আশআরী ও মাতুরিদি ধর্মতত্ত্ব মুতাজিলা যুক্তিবাদ ও হাম্বলি আক্ষরিকতাবাদের মাঝখানে মুতাজিলাদের যুক্তিনির্ভর ব্যখাপদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে মধ্যস্থতা তৈরি করে, যাকে মুতাজিলাগণ আছারীদের অধিকাংশ বিশ্বাসকে প্রতিহত করতে ব্যবহার করত।[৬৭] যদিও যে সকল হাম্বলি পণ্ডিত এই সংমিশ্রণকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাঁরা ছিল সংখ্যালঘু, তাদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি তাদের আবেগপ্রবণ ও বর্ণনা-ভিত্তিক পদক্ষেপ কিছু এলাকার শহুরে লোকজনের মধ্যে প্রভাবশালী অবস্থায় থেকে গিয়েছিল, আর তা ছিল প্রধানত আব্বাসীয় খিলাফতের শাসনামলে বাগদাদ এলাকায়।[৬৮]

যদিও আশআরী ও মাতুরিদি মতবাদকে প্রায়শই সুন্নি "সনাতন ধারা" বলে ডাকা হয়, আছারী মতবাদও এদের পাশাপাশি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, যার অনুসারীরা একে সনাতন সুন্নি ধর্মবিশ্বাস বলে দাবি করে আসছে।[৬৯] আধুনিক যুগে, ইসলামী ধর্মতত্ত্বের উপর আছারী মতবাদের একটি ধারণাতীত প্রভাব রয়েছে, যা ওয়াহাবি ও অন্যান্য সমসাময়িক ঐতিহ্যবাদী (আসারি) সালাফি অনুসারীদের দ্বারা অনুসৃত হচ্ছে এবং তা হাম্বলি মতাদর্শের সীমা অতিক্রম করে আরও বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়ছে।[৭০]

আছারী আকীদা সম্পর্কে ছালিহ ইবনে ফাউজান আল-ফাউজান বলেন, "যে ব্যক্তি শুধু ভালোবাসা নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে, সে সুফী বলে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি শুধু ভয় নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে, সে খারেজী। যে শুধু আশা-আকাঙ্খা নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে, সে মুর্জীয়া। আর যে ভালোবাসা, ভয়-ভীতি, এবং আশা-আকাঙ্খা নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে, সেই প্রকৃত মুমিন।

শিয়া

জাফরি (শিয়া; ইসমাইলিসহ)

1. জায়েদি (শিয়া)
2. দ্বাদশী (উসূল আল দীন) (শিয়া)

   শিয়া মুসলমানরা বিশ্বাস করেন যে আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের পাঁচটি দিক রয়েছে: ঐশ্বরিক একত্ব (ইসলামে যাকে "তাওহিদ" বলা হয়), ন্যায়বিচার, নবুওয়ত (নবিত্ব), ইমামত্ব ও পরকালবিদ্যা।

জায়েদি

জায়েদি (আরবি: الزيدية, প্রতিবর্ণীকৃত: *al-Zaidiyyah*; *পঞ্চমী* নামে পরিচিত) হল শিয়া ইসলামের একটি শাখা যা ধর্মতাত্ত্বিক দিক দিয়ে ইবাদি ও মুতাজিলা চিন্তাধারার এবং ফিকহশাস্ত্রীয় ক্ষেত্রে হানাফি মাজহাবের নিকটবর্তী। অষ্টম শতাব্দীতে শিয়া চিন্তাধারা থেকে জায়েদি মতবাদ উৎপত্তিলাভ করে।[৭২] তৃতীয় ইমাম হোসাইন ইবনে আলীর দৌহিত্র এবং চতুর্থ ইমাম আলী ইবনে হোসাইনের পুত্র জায়েদ ইবনে আলীর নামানুসারে জায়েদিদের নামকরণ করা হয়।[৭২] জায়েদি মাজহাবের অনুসারীদের জায়েদি শিয়া নামে অবিহিত করা হয়। জায়েদিরা ইয়েমেনের মোট মুসলিম জনসংখ্যার ৫০% যা দেশটির বৃহত্তম শিয়া মুসলমান সম্প্রদায়।

বাতেনি

বাতিন (আরবি: باطن) শব্দের আক্ষরিক অর্থ- "ভিতর", "অভ্যন্তরীণ", "লুকানো" ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, কুরআনের বাহ্যিক বা আপাত অর্থে, যহিরের বিপরীতে একটি লুকানো অর্থও আছে। সুফিরা বিশ্বাস করে যে প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মার জগতে একটি বাতিন আছে। ইহা ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ সত্ত্বা; যখন আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের আলো দ্বারা শুদ্ধ করা হয়, তখন তা আধ্যাত্মিকভাবে উন্নীত হয়।[৭৫][৭৬] এই ধারণা লুকানো আল্লাহর গুণাবলীর সাথে সংযুক্ত, যাকে দেখা যায় না কিন্তু জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যমান।

ইসনা আশারিয়া

ইসনা আশারিয়াত যার বাংলা অর্থ *দ্বাদশী* (আরবি: اِثْنَا عَشَرِيَّة, প্রতিবর্ণীকৃত: *ʾIthnā ʿAšarīyah*; ফার্সি: شیعه دوازده‌امامی, প্রতিবর্ণীকৃত: *Šī'eh-ye Davâzdah-Emâmī*), যা *ইমামিয়াত* (আরবি: إِمَامِيَّة, প্রতিবর্ণীকৃত: *Imāmīyah*) নামেও পরিচিত, হল শিয়া ইসলামের বৃহত্তম শাখা। *দ্বাদশী* শব্দটি দ্বারা এর অনুসারীদের বারোজন ঐশ্বরিকভাবে মনোনীত নেতা তথা বারো ইমামে বিশ্বাস এবং সর্বশেষ ইমাম মুহম্মদ আল-মাহদীকে অন্তর্হিত ইমাম ও প্রতীক্ষিত মাহদী হিসেবে বিশ্বাস করাকে বোঝানো হয়। শিয়া ঐতিহ্য অনুসারে মাহদীর শাসনামল নবী ঈসার দ্বিতীয় আগমনের সমসাময়িক হবে এবং ঈসা মাহদীকে দজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহযোগিতা করবেন।

ইসনা আশারিয়ারা বিশ্বাস করে যে বারো ইমাম হলেন নবী মুহাম্মদের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক উত্তরসূরী। এই ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী বারো ইমাম অনুকরণীয় মানবীয় ব্যক্তিত্ব যাঁরা ন্যায়বিচারের সাথে সমাজ পরিচালনার পাশাপাশি শরীয়ত ও কোরআনের গূঢ়ার্থ সংরক্ষণ ও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। মুহাম্মদ ও ইমামদের কথা ও কাজ (সুন্নত) জনসমাজের জন্য অনুসরণীয় পথপ্রদর্শক ও আদর্শ; ফলে তাঁদের অবশ্যই ত্রুটি ও পাপমুক্ত হতে হবে এবং অবশ্যই মুহাম্মদের মাধ্যমে ঐশী ফরমান বা নাস দ্বারা মনোনীত হতে হবে।[৭৭][৭৮][৭৯]

ইসনা আশারিয়া মতবাদ শিয়া ইসলামের বৃহত্তম শাখা যা গোটা শিয়া সম্প্রদায়ের ৮৫% এবং সংখ্যায় প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ মিলিয়ন।

জাহমি

জাহমি (আরবি: جهمي) একটি মতবাদ। জা'দ ইবন দিরহাম (১১৮ হি) নামক একজন নতুন প্রজন্মের পারসিক মুসলিম মহান আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকার করে তাঁকে 'নির্গুণ' বলে দাবি করতে থাকেন। তার ছাত্র জাহম ইবন সাফওয়ান সামারকান্দী (১২৮ হি)। তিনি এ মতটিকে জোরালোভাবে প্রচার করতে থাকেন এবং এর সাথে অনেক দর্শনভিত্তিক মতবাদ তিনি প্রচার করেন।

কাদারিয়া

মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণকারী হিসেবে ইসলামে *কাদারিয়া* সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। তাদের কাদারিয়া বলা হয় কারণ তারা এই মত পোষণ করেন মানুষের কাজ করার 'কাদর' বা শক্তি আছে।[৮৫][৮৬] এই মতবাদের প্রবক্তারা মানুষের ইচ্ছা বা কর্মের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। কাদারিয়াদের মতে, আল্লাহ বা বিধাতা কাজের জন্য সরাসরি দায়ী হতে পারেন না, কারণ কাজ ভালো বা মন্দ উভয়ই হতে পারে। মানুষ তার নিজের কাজের মালিক কিন্তু তার কাজ করার ক্ষমতা বিধাতা কর্তৃক প্রদত্ত। এই অর্থে বিধাতা চূড়ান্তভাবে কাজের কর্তা বা মালিক। কোনো বহিঃশক্তি দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে মানুষ তার নিজের কাজের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে তার নিজস্ব শক্তি আছে।[৮৭] এই সম্প্রদায়ের কেউ কেউ দাবি করেন যে মানুষের কাছে কিছু ঐশী ক্ষমতা হস্তান্তর বা অর্পণ করা হয়েছে এবং মানুষের যেটা সঠিক এবং যেটা ভুল তা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নিঃশর্ত বিবেচনামূলক ক্ষমতা আছে।[৮৮] তাদের কিছু মতবাদ পরে মু'তাজিলিদের দ্বারা গৃহীত হয় এবং আশআরিয়দের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়।[৮৭]

কাদারিয়া ইসলামের প্রথমদিকে দার্শনিক ধর্মতত্ত্বের একটি। এই আন্দোলন নিয়ে পাওয়া প্রাচীনতম দলিল হচ্ছে হাসান আল-বসরির রিসালা, যা ৭৫/৬৯৪ থেকে ৮০/৬৯৯ এর মধ্যে লেখা হয়। অবশ্য ইসলামে মুক্ত ইচ্ছা নিয়ে বিতর্ক এই লেখার পূর্বে পাওয়া যায়।

সুন্নি সূত্র মতে, জরাথুস্ট্রবাদের সাথে তুলনা দিয়ে মুহাম্মদ নিজেই এর নিন্দা জানিয়েছেন।[৮৯] সুনান আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে: "আব্দুল্লাহ ইবনে উমর: নবী বলেন, "কাদারিয়াহ হল এই সম্প্রদায়ের মাজিয়ান। যদি তারা অসুস্থ হয়, তবে তাদের কাছে যাবেন না, আর যদি তারা মারা যায় তবে তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যাবেন না।"

মুহাক্কিমা

বিচারের ঘটনার শেষে যে দলগুলো আলীর সেনাবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল তারা মুহাক্কিমা (আরবি: محكمة) নামক শাখা গঠন করেছিল। তারা প্রধানত খারেজী ও ইবাদি নামে দুটি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত।

খারেজি

খারিজি (আরবি: الخوارج, *আল-খাওয়ারিজ,* একবচন خارجي, *খারিজি*), *আশ-শুরাহ*ও বলা হয় (আরবি: الشراة, প্রতিবর্ণীকৃত: *আশ-শুরাহ* "যে (টাকা) ভাঙিয়ে দেয়") শব্দ দ্বারা ইসলামের প্রথম যুগে উদ্ভব হওয়া একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে বুঝায়। ৭ম শতাব্দীতে এই গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল। ইরাকের দক্ষিণাশে তারা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। সুন্নি ও শিয়াদের থেকে খারিজিরা ভিন্ন মত পোষণ করত। পরবর্তীতে সময়ের সাথে সাথে খারিজিরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। খলিফা আলি ইবনে আবি তালিবের শাসন শুরু হওয়ার পর তারা প্রথমে তা মেনে নেয়, তবে পরে তার শাসন প্রত্যাখ্যান করে। আলি নিজেও আবদুর রহমান ইবনে মুলজাম নামক একজন খারিজির হাতে নিহত হন।

ইবাদি

ইবাদি: ইসলাম (আরবি: الإباضية, প্রতিবর্ণীকৃত: al-Ibāḍiyyah), ইবাদি মতবাদ বা ইবাদি আন্দোলন হল ইসলামের একটি শাখা যা ওমানে সবচেয়ে প্রভাবশালী।[৯০] এছাড়া আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, লিবিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে এর অস্থিত্ব রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে এই আন্দোলন ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে বা মহানবী হজরত মুহম্মদের (স.) মৃত্যুর ২০ বছর পর শুরু হয় যা সুন্নি ও শিয়া মতবাদের চেয়েও প্রাচীন। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এর উৎপত্তি সন্ধান করতে গিয়ে একে খারিজি আন্দোলনের একটি মধ্যপন্থী ধারা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।৩ সমসাময়িক ইবাদিরা তাদের খারিজি হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করার তীব্র বিরোধিতা করেন, যদিও তারা স্বীকার করেন যে তাদের আন্দোলন ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দের খারিজি বিদ্রোহ থেকে উৎপত্তিলাভ করেছে।

ইবাদি ইসলামের একটি ক্ষুদ্র মাযহাব। এই মাযহাব সুন্নি বা শিয়া পন্থার অন্তর্ভুক্ত নয়। এর আবির্ভাব ইবাদি আন্দোলন থেকে। এই আন্দোলন মহানবীর প্রয়াণের ২০ বছর পর শুরু হয় বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। আব্দুল্লাহ ইবন ইবাদ আল-তামিমিকে এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। কিন্তু এই মাযহাবের অনুসারীরা দাবি করেন যে এর প্রতিষ্ঠাতা জাবির ইবন জাইদ আল-আজদি। এই মতবাদের ওপর খারিজিদের প্রভাব আছে বলে মনে করা হয়। ইবাদিরা নিজেদের "মুসলমান" বা "সরলতার লোক" বলে উল্লেখ করেন।

মুরজিয়া

মুরজিয়াহ (আরবি: المرجئة) ছিল একটি প্রাথমিক ইসলামী বিদ্যালয় যার অনুসারীরা আরবিতে "মুরজিউন" বা "আল-মুরজিউন" (المرجئون) নামে পরিচিত। পাপ এবং ধর্মত্যাগের (রিদা) মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে এটি খারিজিদের প্রাথমিক প্রশ্নের জবাবে মুরজিয়া একটি ধর্মতাত্ত্বিক বিদ্যালয় হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। মুরজিয়াহরা বিশ্বাস করতেন যে পাপ একজন ব্যক্তির বিশ্বাস (ইমান) প্রভাবিত করে না বরং তাদের পূণ্য বা তাকওয়াই ইমানকে প্রভাবিত করে। অতএব, তারা "বিলম্বিত রায়" (ইরজা) ধারণার পক্ষে ছিল। মুর্জিয়ারা বলে যে, যে কেউ ন্যূনতম ঈমান ঘোষণা করে তাকে অবশ্যই মুসলমান হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং শুধু পাপই কাউকে কাফের করতে পারে না। মুরজিয়ার মতবাদ শেষ পর্যন্ত খারিজিদের উপর প্রাধান্য পায় এবং সুন্নি ইসলামের মূলধারার মত হয়ে ওঠে। সুন্নি ধর্মতত্ত্বের পরবর্তী বিদ্যালয়গুলো তাদের অবস্থানকে নিজেদের ভেতরে গ্রহণ করে এবং তা থেকে আরও বিকশিত ধর্মতাত্ত্বিক বিদ্যালয় এবং ধারণা তৈরি করে।

তাশবিহ

তাশবিহ (আরবি: تشبيه) একটি ইসলামিক ধর্মীয় ধারণা যার অর্থ নৃতাত্ত্বিকতা, ঈশ্বরকে তাঁর সৃষ্টির সাথে একীভূত করা/তুলনা করা। ইসলামী ধর্মতত্ত্বে, দুটি বিপরীত শব্দ আল্লাহর প্রতি আরোপিত হয়, তাশবিহ এবং তানজিহ (অতিক্রম)।

তাশবিহের পূর্ণ অর্থ হল 'সাদৃশ্য নিশ্চিত করা', অর্থাৎ ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সাদৃশ্য নিশ্চিত করা। এই ধারণাটি চিরন্তনভাবে আল্লাহর তানজিহ (অতিক্রম বা 'অসংগতি ঘোষণা') এর সাথে যুক্ত।

তা'তিল, ঈশ্বরকে তাঁর গুণাবলী থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া এবং তাশবিহ, নৃতাত্ত্বিকতা, উভয়কেই সুন্নিদের দ্বারা ধর্মদ্রোহিতা বলে মনে করা হয়।

শিয়া শিক্ষায় তাশবিহ বহুল প্রচলিত ছিল, বিশেষ করে ৮ম শতকের খ্রিস্টাব্দের জাইদি ইমাম আল-কাসিম আল-রাসি-এর চিন্তাধারায়।

কারিমিয়াত

কাররামিয়াহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন কাররাম। ইবনে কাররাম মনে করতেন যে ঈশ্বর একটি পদার্থ এবং যখন তিনি আরশের সংস্পর্শে আসেন তখন নির্দিষ্ট দিকে তাঁর একটি সসীম দেহ (জিসম) ছিল।

চরমপন্থী শিয়া ইতিহাসে আল্লাহর মানবরূপ ধারণ:

অবতারের বিশ্বাস প্রথমে সাবাইয়াতে আবির্ভূত হয়েছিল, এবং পরে কিছু ব্যক্তিত্বকে যেমন মুহাম্মদ ইবনে আল-হানাফিয়া, আবু মুসলিম, সানপদ, ইসহাক আল-তুর্ক, আল-মুকান্না, বাবাক খোররামদিন, মাজিয়ার এবং প্রথম ইসমাইলকে আল্লাহর অবতার হিসেবে গুলাত শিয়াগণ বিশ্বাস করতেন।

আহমদীয়া

আহমদীয়া; পূর্ণরূপে *আহমদীয়া মুসলিম জামাত* (উর্দু: احمدیہ مسلم جماعت; আরবি: الجماعة الإسلامية الأحمدية) একটি মুসলিম ধর্মীয় পুনর্জাগরণ অথবা মসিহবাদী আন্দোলন যার উদ্ভব হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ব্রিটিশ ভারতের কাদিয়ান এলাকার মির্যা গোলাম আহমদের জীবন ও শিক্ষার ভিত্তিতে। মির্যা গোলাম আহমদ (১৮৩৫-১৯০৮) দাবী করেছিলেন যে আল্লাহ তাকে আখেরী জামানায় প্রতিশ্রুত ও মুসলমানদের প্রতীক্ষিত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ (যীশু বা ঈসা)

উভয় হিসেবেই প্রেরণ করেছেন ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় শান্তিপূর্ণভাবে সংঘটিত করতে এবং অন্যান্য ধর্মীয় মতবাদের প্রতীক্ষিত পরকালতাত্ত্বিক ব্যক্তিত্বদের মূর্ত করতে। নবী মোহাম্মদের বিকল্প নাম 'আহমদ' থেকে এই আন্দোলন ও সদস্যগণ ('আহমদী মুসলিম' বা সংক্ষেপে 'আহমদী') নিজেদের নামকরণ করলেও সাধারণভাবে মুসলিম বিশ্বে তাদের প্রতিষ্ঠাতার জন্মগ্রহণকারী অঞ্চলের নাম কাদিয়ান এর নামে কাদিয়ানী হিসেবেই আখ্যায়িত করা হয়।আহমদীরা বিশ্বাস করে যে মির্যা গোলাম আহমদ ইসলামকে তার আসল প্রথমযুগীয় অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কিতাবে উল্লেখিত যীশু বা ঈসার গুণবিশিষ্ট ইমাম মাহদী হয়ে এসেছেন ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করতে ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তির লক্ষ্যে এর নৈতিক ব্যবস্থা চলমান করতে। তারা আরও বিশ্বাস করে যে মির্যা গোলাম আহমদ ইসলামের শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ(সা.) এর প্রদর্শিত পথে পাঠানো একজন “উম্মতী নবী”। তাদের মতে নবুয়াত খাতামান্নাবিঈন এর অর্থ নবুয়াত এর সমাপ্তি নয় বরং খাতামান্নাবিঈন মানে "নবীগনের মোহর" বা নবীগনের সত্যায়নকারী। তাদের মতে নবী মোহাম্মদ এর প্রকৃত অনুসরনে নতুন নবী আসতে পারবেন তবে তিনি হবেন ‘উম্মতী নবী’ ও তিনি কোনো নতুন শরীয়ত আনবেন না।[৯৮] আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বা সুন্নীদের মতে, এই ‘উম্মতী নবীর’ ধারণা কুরআন ও হাদীস দ্বারা সমর্থিত নয় এবং তারা তাদেরকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত মানে না।[৯৯][১০০] আহমদীয়াদের মতে যেহেতু তারা কালিমা তৈয়্যিবা ‘লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ’ মনে প্রাণে বিশ্বাস করে বলে তাদের ‘অমুসলিম’ ঘোষণা করার অধিকার কারো নেই।

মুসলমানদের ১০৫ মৌলিক আকিদা ও বিশ্বাস

১. নিশ্চয়ই আল্লাহ এক ও একক। তাঁর কোনো শরিক (অংশীদার) নেই।

২. তাঁর (আল্লাহর) মতো কিছুই নেই।

৩. কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না।

৪. তিনি (আল্লাহ) ছাড়া আর কোনো (সত্য) ইলাহ নেই।

৫. তিনি কাদিম বা প্রাচীন, যার কোনো শুরু নেই. তিনি অনন্ত, যার কোনো অন্ত নেই।

৬. তাঁর (আল্লাহর) ক্ষয় নেই, ধ্বংস নেই।

৭. তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছু সংঘটিত হয় না।

৮. (মানুষের) কল্পনাসমূহ তাঁর (সম্পর্কে জানার জন্য) ধারে-কাছে পৌঁছাতে পারে না, এবং কারো জ্ঞান তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না।

৯. আর তিনি সৃষ্ট বস্তুর সদৃশ নন।

১০. তিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যুবরণ করবেন না, চিরজাগ্রত, নিদ্রা যান না।

১১. তিনি (এমন) সৃষ্টিকর্তা, যাঁর সৃষ্টির প্রতি কোনো প্রয়োজন নেই, তিনি কোনো ধরনের ক্লান্তি ছাড়াই (সবার) রিজিকদাতা।

১২. তিনি নির্ভয়ে প্রাণ সংহারকারী এবং বিনা ক্লেশে পুনরুত্থানকারী।

১৩. সৃষ্টির বহু আগ থেকেই তিনি (আল্লাহ) তাঁর অনাদি গুণাবলি বিদ্যমান ছিলেন, আর সৃষ্টির কারণে তাঁর নতুন কোনো গুণের সংযোজন ঘটেনি এবং তিনি তাঁর গুণাবলিসহ যেমন অনাদি ছিলেন, তেমনি তিনি স্বীয় গুণাবলি অনন্ত থাকবেন।

১৪. সৃষ্টির কারণে তাঁর (আল্লাহর) গুণবাচক নাম 'খালেক' (সৃষ্টিকর্তা) হয়নি। বিশ্বজাহান সৃষ্টির কারণে তাঁর গুণবাচক নাম 'বারী' (উদ্ভাবক) হয়নি।

১৫. প্রতিপাল্যের অবর্তমানেও তিনি ছিলেন 'রব' বা প্রতিপালক, আর মাখলুক সৃষ্টির আগেও তিনি ছিলেন 'খালেক' বা সৃষ্টিকর্তা।

১৬. মৃতদের জীবন দান করার ফলে যেমন তাঁকে 'জীবনদানকারী' বলা হয়ে থাকে, তেমনি তাদের জীবনদান করার আগেই তিনি এই (জীবনদানকারী) নামের অধিকারী ছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি সৃষ্টিকুলের সৃজনের পূর্বেই 'সৃষ্টিকর্তা' নামের অধিকারী ছিলেন।

১৭. এটা এই জন্য যে তিনি সব কিছুর ওপর সমপূর্ণ ক্ষমতাবান এবং প্রতিটি সৃষ্টিই তাঁর অনুগ্রহপ্রার্থী। আর সব কিছুই তাঁর জন্য সহজ। তিনি কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন।

১৮. তিনি (আল্লাহ) স্বীয় জ্ঞানে সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন।

১৯. এবং আল্লাহ সৃষ্ট বস্তুর জন্য সব কিছুর পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন।

২০. এবং তাদের জন্য মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট করেছেন।

২১. সৃষ্টির আগে কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন ছিল না। জীবজগতের সৃষ্টির আগেই তাদের সৃষ্টির পরবর্তী কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন।

২২। এবং তিনি তাদের তাঁর আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন। অবাধ্যাচরণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

২৩. আর সব কিছু তাঁর নির্ধারণ ও ইচ্ছা অনুসারে পরিচালিত হয়ে থাকে। তাঁর ইচ্ছা কার্যকর হয়েই থাকে। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া বান্দার কোনো ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয় না।

২৪. তিনি অনুগ্রহ করে যাকে ইচ্ছা হিদায়াত, আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান করেন। আর যাকে ইচ্ছা ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে পথভ্রষ্ট করেন। অপমানিত করেন ও বিপদগ্রস্ত করেন।

২৫. আর সবাইকে তাঁর ইচ্ছা ও অনুগ্রহ এবং ন্যায়বিচারের মধ্যে ঘুর্ণয়মান।

২৬. তাঁর (আল্লাহর) সিদ্ধান্তের পরিবর্তনকারী কেউ নেই এবং তাঁর নির্দেশ বাতিল করার কেউ নেই। তাঁর নির্দেশকে পরাভূত করারও কেউ নেই।

২৭. তিনি (আল্লাহ) কারো প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সমকক্ষ হওয়ার ঊর্ধ্বে।

২৮. উল্লিখিত সব কিছুর ওপরই আমরা ঈমান এনেছি এবং দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করছি যে এসব কিছু আল্লাহর তরফ থেকে আগত।

২৯. নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা.) তাঁর নির্বাচিত বান্দা, মনোনীত নবী এবং সন্তোষপ্রাপ্ত রাসুল।

৩০. তিনি [মহানবী (সা.)] নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী, মুত্তাকিদের ঈমাম, রাসুলদের নেতা এবং সৃষ্টিকুলের মালিকের হাবিব।

৩১. আর তাঁর [মহানবী (সা.)] পরবর্তী যুগে নবুয়তের যেসব দাবি উত্থাপিত হয়েছে, তার সবই ভ্রষ্টতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ।

৩২. তিনি [মহানবী (সা.)] সত্য, হিদায়াত, নুর ও জ্যোতিসহ সব জিন ও মাখলুকের প্রতি প্রেরিত।

৩৩. নিশ্চয়ই কোরআন আল্লাহর কালাম। যা আল্লাহর কাছ থেকে কথা হিসেবে শুরু হয়ে এসেছে। তবে এর কোনো ধরন নির্ধারণ করা যাবে না। এই কালামকে তিনি তাঁর রাসুল (সা.)-এর প্রতি ওহি হিসেবে নাজিল করেছেন। আর ঈমানদাররা তাঁকে এ ব্যাপারে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন।

৩৪. যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মানবীয় কোনো গুণ আরোপ করবে, সে কাফের হয়ে যাবে।

৩৫. আর জান্নাতিদের জন্য আল্লাহকে দেখার বিষয়টি সত্য। অর্থাৎ জান্নাতে আল্লাহকে দেখতে পাবে। তবে সে দেখা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে নয়, আর তার পদ্ধতিও আমাদের অজানা।

৩৬. আনুগত্য স্বীকার আর আত্মসমর্পণ ছাড়া কারো পা ইসলামের ওপর দৃঢ় থাকতে পারে না।

৩৭. যে ব্যক্তি জান্নাতিদের দ্বারা আল্লাহকে দেখতে পাওয়া সম্পর্কে কোনো ধারণার বশবর্তী হবে, (অথবা সেটাকে অনিশ্চিত বিষয় জ্ঞান করবে) অথবা নিজের বুঝ অনুসারে সে দেখার ভুল ব্যাখ্যা দেবে, তার ঈমান বিশুদ্ধ হবে না।

৩৮. আল্লাহ তাআলা সীমা, পরিধি থেকে ঊর্ধ্বে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সাজ-সরঞ্জাম থেকে মুক্ত। অন্য সৃষ্ট বস্তুর মতো ষষ্ঠ দিক বেষ্টিত হয় না।

৩৯. মিরাজ সত্য, নবী (সা.)-কে নৈশভ্রমণ করানো হয়েছিল, তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে ঊর্ধ্ব আকাশে উত্থিত করা হয়েছিল।

৪০. হাউস (পানির আধার) যা আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (সা.)-কে তাঁর উম্মতের পিপাসা নিবারণার্থে প্রদান করে সম্মানিত করেছেন, তা অবশ্যই সত্য।

৪১. নবী (সা.)-এর শাফাআত, যা তিনি উম্মতের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন; তা সত্য।

৪২. 'মি-ছাক' (দৃঢ় অঙ্গীকার), যা আল্লাহ তাআলা আদম এবং তাঁর সন্তানদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন—তা সত্য।

৪৩. মহান আল্লাহ শুরু থেকে এবং এখন, সব সময়েই ভালো করেই জানেন। কত লোক জান্নাতে যাবে আর কত লোক জাহান্নামে যাবে। এতে ব্যতিক্রম হবে না। তাই এ সংখ্যা কমবেও না, বাড়বেও না।

৪৪. অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে আগ থেকেই অবহিত এবং যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কাজ তার জন্য সহজসাধ্য করে দেওয়া হয়েছে।

৪৫. 'তাকদির' সম্পর্কে আসল কথা এই যে এটা সৃষ্টিকুলের ব্যাপারে আল্লাহর একটি রহস্য, যা নৈকট্যপ্রাপ্ত কোনো ফেরেশতা কিংবা প্রেরিত কোনো নবীও অবহিত নন। এ সম্পর্কে তথ্য আবিষ্কার করতে যাওয়া অথবা অনুরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আশাহত হওয়ার কারণ। বঞ্চনার সিঁড়ি এবং সীমা লঙ্ঘনের ধাপ।

৪৬. (তাকদির বিষয়ে যা জানা ও যার ওপর ঈমান আনার প্রয়োজন), তা রহস্যময় কারণে সংক্ষিপ্তভাবে বিধৃত হয়েছে। আল্লাহর ওলি তথা বন্ধুদের এতটুকু জানাই প্রয়োজন। আর এটিই হচ্ছে জ্ঞানে সুগভীর প্রজ্ঞা বিভূষিতদের স্তর।

৪৭. আর আমরা লাওহে মাহফুজে ও কলমের ওপর ঈমান রাখি। আর যা আল্লাহ লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন, যা সংঘটিত হবে বলে আল্লাহ এ লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন। সব সৃষ্ট জীব একত্র হয়েও রোধ করতে চায় তারা সেটা করতে সক্ষম

হবে না। পক্ষান্তরে, তাতে যে বিষয় সংঘটিত হওয়ার কথা তিনি লিখেননি, সব সৃষ্ট জীব একত্র হয়েও তা ঘটাতে পারবে না।

৪৮. বান্দার এ কথা জেনে রাখা উচিত যে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত যাবতীয় ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ব থেকে অবহিত আছেন। অতএব তিনি সেটাকে অকাট্য ও অবিচল তাকদির হিসেবে নির্ধারিত করেছেন। আসমান ও জমিনের কোনো মাখলুক এটাকে বানচালকারী অথবা এর বিরোধিতাকারী নেই, অনুরূপ একে কেউ অপসারণ অথবা পরিবর্তন করতে পারবে না।

৪৯. আরশ ও কুরসি সত্য।

৫০. আল্লাহ তাআলা আরশ ও অন্যান্য বস্তু থেকে অমুখাপেক্ষী।

৫১. তিনি সব বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি সব কিছুর ঊর্ধ্বে। সৃষ্টিজগৎ তাঁকে পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে অক্ষম।

৫২. আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইবরাহিম (আ.)-কে খলিল বা অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং মুসা (আ.)-এর সঙ্গে কথোপকথন করেছেন।

৫৩. আর আমরা আল্লাহর ফেরেশতা, নবী-রাসুলদের ওপর প্রেরিত কিতাবের ওপর ঈমান রাখি। আমরা আরো সাক্ষ্য প্রদান করি যে তাঁরা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

৫৪. আমাদের কিবলাকে (বায়তুল্লাহকে) যারা কিবলা বলে স্বীকার করে আমরা তাদের মুসলিম ও মুমিন বলে আখ্যায়িত করি, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নবী (সা.) কর্তৃক নিয়ে আসা শরিয়তকে স্বীকার করে এবং তিনি যা কিছু বলেছেন তাকে সত্য বলে গ্রহণ করে।

৫৫. আমরা আল্লাহর সত্তা (জাত) সম্পর্কে অন্যায় গবেষণায় প্রবৃত্ত হই না। তাঁর দ্বিন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হই না।

৫৬. কোরআন সম্পর্কে আমরা কোনো তর্কে লিপ্ত হই না এবং সাক্ষ্য প্রদান করি যে কোরআন বিশ্ব চরাচরের রবের কালাম। এটা নিয়ে জিবরিল আমিন অবতীর্ণ হয়েছেন।

অতঃপর তিনি তা সব রাসুলের নেতা মুহাম্মদ (সা.)-কে শিক্ষা দেন। এ কোরআন আল্লাহ তাআলার কালাম (বাণী), কোনো সৃষ্টির কথা এর সমতুল্য নয়। আর আমরা একে সৃষ্ট বলি না। এবং (এ ব্যাপারে) আমরা মুসলিম মিল্লাতের বিরুদ্ধাচরণ করি না।

৫৭. কোনো গুনাহর কারণে কোনো আহলে কিবলা (মুসলিমকে) কাফির বলে অভিহিত করি না; যতক্ষণ সে ওই গুনাহকে হালাল (জায়েজ) মনে না করে।

৫৮. আর আমরা বলি না যে ঈমান আনার পর কোনো গুনাহ করাতে ক্ষতি নেই।

৫৯. আমরা আশা করি যে সৎকর্মশীল মুমিনদের আল্লাহ ক্ষমা করবেন এবং স্বীয় অনুগ্রহে তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমরা তাদের সম্পর্কে নিঃশঙ্ক হয়ে যাব না। আর তাদের জান্নাতি বলে ঘোষণাও করব না।

৬০. নিঃশঙ্ক ও নৈরাশ্যবোধ একজন মুসলিমকে ইসলামী মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। আহলে কিবলার জন্য সত্য পথ তো এতদুভয়ের মাঝামাঝি থাকার মধ্যেই নিহিত।

৬১. কোনো মানুষ ওই সব বিষয় অস্বীকার করলেই ঈমানহারা, যা স্বীকার করে সে তাতে প্রবেশ করেছে।

৬২. আর ঈমান হচ্ছে, মুখে স্বীকৃতি দেওয়া এবং অন্তর দিয়ে সত্যায়ন করা।

৬৩. ইসলামী শরিয়ত ও তার ব্যাখ্যায় যা রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রাপ্ত হয়েছে, তা সবই হক বা সত্য।

৬৪. ঈমান এক। আর ঈমানদার ব্যক্তিরা সে মৌলিক দিক থেকে সবাই সমান। তবে তাদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য হয়ে থাকে।

৬৫. সব মুমিন দয়াময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ওলি বা বন্ধু। আর তাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তাঁর বেশি অনুগত এবং কোরআনের বেশি অনুসারী।

৬৬. আর ঈমান (এর বিস্তারিত রূপ) হচ্ছে, আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর গ্রন্থ, তাঁর রাসুলরা, শেষ দিবস এবং তাকদিরের ভালো-মন্দ, মিষ্টি ও তিক্ত, সবই আল্লাহর অনুমতিতে ঘটে থাকে; এ ঈমান রাখা।

৬৭. আর আমরা উল্লিখিত বিষয় সবটির ওপর ঈমান পোষণ করি। আমরা রাসুলদের মধ্যে (ঈমানের ক্ষেত্রে) কোনো তারতম্য করি না। তাঁরা যেসব বিধিবিধান নিয়ে এসেছিলেন তা সবই সত্য বলে স্বীকার করি।

৬৮. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর উম্মতের মধ্যে যারা (শিরক ছাড়া) কবিরা গুনাহ করবে তারা তাওবা না করলেও জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না; যদি তারা তাওহিদ তথা একত্ববাদী হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

৬৯. আর আমরা প্রত্যেক সৎ ও পাপী মুসলিমের পেছনে নামাজ আদায় করা এবং প্রত্যেক মৃত মুসলিমের জন্য জানাজার নাামাজ আদায় করার পক্ষে মত প্রদান করি।

৭০. আমরা তাদের কাউকে জান্নাতি ও জাহান্নামি বলে আখ্যায়িত করব না। তাদের কারো বিরুদ্ধে আমরা কুফর ও শিরক অথবা নিফাকের সাক্ষ্য প্রদান করব না, যতক্ষণ এগুলোর কোনো একটি তাদের মধ্যে প্রকাশ্যে দৃষ্টিগোচর না হয়। তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার আমরা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিই।

৭১. আমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতদের কারো বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার পক্ষে মত দিই না, যদি এমন কেউ না হয় যার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা ওয়াজিব।

৭২. আমির ও শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে আমরা বৈধ মনে করি না, যদিও তারা অত্যাচার করে। আমরা তাদের অভিশাপ দিব না এবং আনুগত্য হতে হাত গুটিয়ে নেব না।

৭৩. আমরা আহলে সুন্নাত এবং জামাআতের অনুসরণ করব। আমরা জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং জামাআতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হতে বিরত থাকব।

৭৪. আমরা ন্যায়পরায়ণ ও আমানতদার ব্যক্তিদের ভালোবাসব এবং অন্যায়কারী ও আমানতের খিয়ানতকারীদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করব।

৭৫. যেসব বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অস্পষ্ট সেসব বিষয়ে আমরা বলব, 'আল্লাহ তাআলা বেশি জানেন।'

৭৬. সফরে ও গৃহে অবস্থানকালে আমরা হাদিসের নিয়মানুসারে মোজার ওপর মাসেহ করার পক্ষে মত প্রদান করি।

৭৭. মুসলিম শাসক ভালো হোক কিংবা মন্দ হোক—তার অনুগামী হয়ে হজ ও জিহাদ করা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এ দুটি জিনিসকে কোনো কিছুই বাতিল কিংবা ব্যাহত করতে পারবে না।

৭৮. আমরা কিরামান-কাতিবিন (সম্মানিত লেখকবৃন্দ) ফেরেশতাদের ওপর ঈমান রাখি, আল্লাহ তাআলা তাদের আমাদের ওপর পর্যবেক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছেন।

৭৯. আমরা মৃত্যুর ফেরেশতার ওপর ঈমান রাখি। তাকে সৃষ্টিকুলের রুহ কবজ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

৮০. আমরা শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিদের জন্য কবরের আজাবের প্রতি ঈমান রাখি এবং এও ঈমান রাখি যে কবরে মুনকার-নাকির (দুই ফেরেশতা) মৃত ব্যক্তির রব, দ্বিন ও নবী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।

৮১. কবর জান্নাতের বাগিচাসমূহের অন্যতম অথবা তা জাহান্নামের গহ্বরসমূহের অন্যতম।

৮২. আমরা পুনরুত্থান, কিয়ামত দিবসে আমলের প্রতিফল, (আল্লাহর সমীপে) পেশ করা, হিসাব-নিকাশ, আমলনামা পাঠ, সওয়াব, শাস্তি, পুলসিরাত এবং মিজান—এসবের ওপর ঈমান রাখি।

৮৩. (আরো ঈমান রাখি যে) জান্নাত ও জাহান্নাম পূর্ব থেকে সৃষ্ট হয়ে আছে। এ দুটি কোনো দিন লয় বা ক্ষয় হবে না। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং যাকে ইচ্ছা জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। আর তা হবে তার ন্যায়বিচার।

৮৪. ভালো-মন্দ উভয়টি বান্দার জন্য নির্দিষ্ট করে লেখা হয়েছে।

৮৫. 'সামর্থ্য' (যা প্রত্যেক কর্মের জন্য অপরিহার্য। আর তা) দুই ধরনের। (১) যে সামর্থ্য বান্দার কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (কর্ম বাস্তবায়িত করার সময় থাকা অপরিহার্য) যেমন—কাজটির তাওফিক (যথাযথভাবে সম্পন্ন করার সুযোগ) তা কোনো সৃষ্টির গুণ হতে পারে না, (বরং তা শুধু আল্লাহর হাতে) এ ধরনের সামর্থ্য শুধু কার্য সম্পাদনের সময়েই অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে (২) যে 'সামর্থ্য' বলতে বোঝায় বান্দার সুস্থতা, সচ্ছলতা, সক্ষমতা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিরাপত্তা, তা অবশ্যই কর্মের আগেই থাকা প্রয়োজন। আর এটার সঙ্গেই তাকলিফ (তথা বান্দার জন্য আল্লাহর নির্দেশনা) সম্পৃক্ত।

৮৬. বান্দাদের যাবতীয় কর্ম আল্লাহর সৃষ্টি এবং তা বান্দাদের উপার্জন।

৮৭. আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের ওপর তাদের সামর্থ্যের বেশি দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন না।

৮৮. পৃথিবীতে যা কিছু সংঘটিত হয়, তা আল্লাহর ইচ্ছা, তাঁর জ্ঞান ও ফায়সালা এবং তাঁর বিধান অনুসারেই হয়ে থাকে। তাঁর ইচ্ছা সব ইচ্ছার ওপর। তাঁর ফায়সালা সব কৌশলের ঊর্ধ্বে। যা ইচ্ছা, তিনি তাই করেন। তিনি কখনো অত্যাচার করেন না। তিনি সর্ব প্রকার কলুষ ও কালিমা হতে পবিত্র এবং সব রকমের দোষ-ক্রতিমুক্ত। তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না। পক্ষান্তরে, অন্য সবই স্বীয় কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

৮৯. জীবিত ব্যক্তিদের দোয়া এবং দান-খয়রাত দ্বারা মৃত বক্তিরা উপকৃত হয়ে থাকে।

৯০. তিনি (আল্লাহ) দোয়া কবুল করেন ও বান্দাদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন।

৯১. তিনি (আল্লাহ) সব কিছুর মালিক এবং কেউ তাঁর মালিক নয়। মুহূর্তের জন্যও কারো পক্ষে আল্লাহর অমুখাপেক্ষী হওয়া সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি মুহূর্তের জন্য আল্লাহর অমুখাপেক্ষী হতে চায়, সে কাফের হয়ে যাবে এবং লাঞ্ছিত হবে।

৯২. আল্লাহ তাআলা ক্রুদ্ধ এবং রুষ্ট হন, তবে তা মাখলুকের মতো নয়।

৯৩. আমরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবিদের ভালোবাসি, তবে তাদের কারো ভালোবাসার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করি না এবং তাদের কারো থেকে বিমুক্তি ঘোষণা করি

না। তাঁদের সঙ্গে যারা বিদ্বেষ পোষণ করে অথবা যারা তাদের অসম্মানজনকভাবে স্মরণ করে আমরা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। আমরা তাদের শুধু কল্যাণের সঙ্গেই স্মরণ করি। তাদের সঙ্গে মহব্বত রাখা দ্বিন ও ঈমান এবং ইহসানের অংশ। আর তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, কুফরি, মুনাফিকি ও সীমা লঙ্ঘন করার পর্যায়ভুক্ত।

৯৪. আমরা রাসুল (সা.)-এর পর সর্বপ্রথম আবু বকর (রা.) খেলাফতকে স্বীকৃতি দিই। অতঃপর পর্যায়ক্রমে ওমর ইবনুল খাত্তাব, ওসমান ও আলী (রা.)-কে খলিফা বলে স্বীকার করি। তাঁরাই ছিলেন সুপথগামী খলিফা ও হিদায়াতপ্রাপ্ত নেতা।

৯৫. রাসুলুল্লাহ (সা.) যে ১০ জন সাহাবির নাম উল্লেখ করে তাদের সম্পর্কে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন, আমরা তাদের জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য প্রদান করি। কারণ এ সম্পর্কে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.) সুসংবাদ দান করেছেন এবং তাঁর উক্তি সত্য।

৯৬. যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবি, তাঁর পবিত্র স্ত্রীরা ও সম্মানিত বংশধরদের সম্পর্কে ভালো মন্তব্য করে সে মুনাফিকি থেকে নিষ্কৃত।

৯৭. আগে গত হওয়া সালাফে সালেহিন আলেমরা এবং তাঁদের যথাযথ পদাঙ্ক অনুসারী কল্যাণের অধিকারী হাদিসবিদরা ও ফিকহের জ্ঞানের অধিকারী গবেষকদের আমরা যথাযথ সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করি। আর যারা এদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে, তারা সঠিক পথের পথিক নয়।

৯৮. আমরা কোনো ওলিকে কোনো নবীর ওপর প্রাধান্য দিই না; বরং আমরা বলি, যেকোনো একজন রাসুল সব ওলি থেকে শ্রেষ্ঠ।

৯৯. ওলিদের কারামত সম্পর্কে যে বার্তা আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং যা বিশ্বস্তসূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আমরা তার ওপর ঈমান রাখি।

১০০. আমরা কিয়ামতের নিম্নলিখিত নিদর্শনাবলির প্রতি ঈমান রাখি—দাজ্জালের আবির্ভাব, আসমান থেকে ঈসা (আ.)-এর অবতরণ। আর আমরা পশ্চিম গগনে সূর্যোদয় এবং দাব্বাতুল আরদ নামক প্রাণীর স্বীয় স্থান থেকে আবির্ভাবের ওপর ঈমান রাখি।

১০১. আমরা কোনো ভবিষ্যৎ বক্তা অথবা কোনো জ্যোতিষীকে সত্য বলে বিশ্বাস করি না। এবং ওই বক্তিকেও সত্য বলে মনে করি না, যে আল্লাহর কিতাব, নবী (সা.)-এর সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখে।

১০২. আমরা (মুসলিম জাতির) ঐক্যকে সত্য ও সঠিক বলে মনে করি এবং তা থেকে বিচ্ছিন্নতাকে বক্রতা ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে মনে করি।

১০৩. নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহর দ্বিন এক ও অভিন্ন। তা হচ্ছে ইসলাম।

১০৪. ইসলাম মধ্যপন্থী দ্বিন। (বিধিবিধানের) বাড়াবাড়ি ও শিথিলতার মাঝামাঝি তার অবস্থান। (আল্লাহর সত্তা, নাম ও গুণাবলি) সাদৃশ্য স্থাপন কিংবা অর্থহীন করার মাঝে তার অবস্থান। (জবর) তথা ক্ষমতাহীন বাধ্য ও (কাদর তথা) নির্ধারণহীনতামুক্ত এ দুয়ের মধ্যে তার অবস্থান। অনুরূপ (আল্লাহর ভয় ও ক্ষমার ব্যাপারে) নিশ্চিন্ততা ও নৈরাশ্যের মধ্যবর্তীতে তার অবস্থান।

১০৫. এগুলোই হচ্ছে আমাদের দ্বিন এবং আমাদের মৌলিক বিশ্বাস। প্রকাশ্যে এবং অন্তরে তা-ই আমরা ধারণ করি। ওপরে যা আমরা উল্লেখ করলাম এবং বর্ণনা করলাম যারাই তার কোনো কিছুর বিরোধিতা করে, তাদের সঙ্গে আমাদের (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের) কোনো সম্পর্ক নেই।

(আকিদাতুত তাহাবি থেকে সংক্ষেপিত)

তকদীর

নির্ধারিত ভাগ্য, তাকদীর

তাকদীরঃতাকদীর আরবি শব্দ।এর আভিধানিক অর্থ হলো: নিয়তি।তাকদীর হল নির্ধারিত ভাগ্য। এ মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটবে আল্লাহ তার পূর্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী সেসব কিছু নির্ধারণ করেছেন। এর প্রতি বিশ্বাসকে ইসলামে তাকদীর বলা হয়।[১]

ইসলামে তাকদীরের ওপর বিশ্বাস করা আল্লাহ তা'আলার রবুবিয়াত বা প্রভুত্বের ওপর বিশ্বাস করার অন্তর্ভুক্ত এবং তা ঈমানের ছয়টি রুকনের অন্যতম একটি রুকন।

ঈমান ও আকিদা

হালাল উপার্জন। মানব জীবনে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব –

হালাল বলতে আমরা সাধারণত যাবতীয় বৈধ পন্থাকেই বুঝি। যা কল্যানকর ও হিতকর এবং যাবতীয় অবৈধ ও অকল্যাণকর হতে মুক্ত। ইসলামে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। মহান আল্লাহ মানব জাতিকে উপার্জনের জন্যে উৎসাহ দিয়েই ক্ষান্ত হননি; বরং যাবতীয় বৈধ ও অবৈধ পন্থাও বাতলে দিয়েছেন। অতএব হালাল উপার্জন বলতে বুঝায় উপার্জনের ক্ষেত্রে বৈধ ও শরী'আত সম্মত পন্থা অবলম্বন।

হালাল উপায়ে জীবিকা উপার্জনের ফলে সমাজ ব্যবস্থায় ধনী দরিদ্রের মাঝে সুষম ভারসাম্য ফিরে আসে; কৃষক দিন মজুর, ক্রেতা-বিক্রেতা, শ্রমিক-মালিক এবং অধস্তনদের সাথে উর্ধ্বতনদের সুদৃঢ় ও সংগতিপূণ সম্পর্ক তৈরী হয়। ফলে সকল শ্রেণীর নাগরিকই তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পায় এবং সমাজ সংসারে নেমে আসে শান্তির সুবাতাস।

মহান আল্লাহ মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এটি শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রোযা, যাকাত প্রভৃতির উপরই সীমাবদ্ধ নয়। জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপ রেখার প্রণেতা হিসেবে ইসলামে রয়েছে জীবন ধারনের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক নির্দেশনা। এ দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে হালাল উপায়ে উপার্জনের ব্যবস্থা গ্রহণও অন্যতম একটি মৌলিক ইবাদত। শুধু তাই নয়, ইসলাম এটিকে অত্যাবশ্যক (ফরয) কাজ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

আল্লাহ পবিত্র, তিনি শুধু পবিত্র জিনিসই কবুল করেন। ইসলাম পবিত্র ধর্ম। পবিত্র বিশ্বাস এবং পবিত্র কর্মই ইবাদত। ইমানের প্রথম বাক্য হলো কালেমা তাইয়েবা, এর মানে হলো পবিত্র বাণী। যার মাধ্যমে মানুষ পবিত্র জীবনে প্রবেশ করে। সুতরাং একজন

বিশ্বাসী অনুগত বান্দা সারা জীবন এই পবিত্রতা রক্ষা করে চলেন। পবিত্র বস্তু ছাড়া আল্লাহ কোনো কিছু গ্রহণ করেন না।

নবী করিম (সা.) বলেন, 'হারাম দ্বারা পুষ্ট দেহ জান্নাতে যেতে পারবে না।' (মুসনাদে আহমাদ ও দারামি)।

মানুষ জীবনে যা যা ভোগ বা উপভোগ করে, সবই তার রিজিক। হালাল রিজিক ইবাদত কবুলের অন্যতম প্রধান শর্ত। রিজিক হালাল বা পবিত্র এবং বৈধ হওয়ার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে। প্রথমত, ব্যবহার্য, ভোগ্য বা উপভোগ্য বস্তু বা বিষয়টি হালাল তথা পবিত্র ও অনুমোদিত হতে হবে। দ্বিতীয়ত, তা প্রাপ্তি বা অর্জনের পথ বা মাধ্যম হালাল বা বৈধ হতে হবে। এ দুইয়ের কোনো একটির ব্যত্যয় ঘটলে ওই রিজিক হালাল বা পবিত্র হবে না।

নবী-রাসুলরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ, তাঁরা নিষ্পাপ। তবু আল্লাহ তাআলা কোরআন মাজিদে বলেন, 'হে রাসুলগণ! তোমরা হালাল পবিত্র উত্তম রিজিক খাও আর সৎকর্ম করো।' (সুরা-২৩ মুমিনুন, আয়াত: ৫১)।

অতঃপর সকল বিশ্ববাসীর উদ্দেশে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা হালাল উত্তম রিজিক আহার করো, যা আমি তোমাদের দিয়েছি।' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ১৭২)।

হালাল সম্পদকেও প্রতিবছর হিসাব করে জাকাত প্রদানের মাধ্যমে পবিত্র করতে হয়। সঠিকভাবে জাকাত আদায় না করলে বৈধ সম্পদও হারাম হয়ে যায়। অজু-গোসল বা পবিত্রতা ছাড়া যেমন নামাজ শুদ্ধ হয় না, ঠিক তেমনি হালাল জীবিকা ছাড়া কোনো ইবাদতই আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। হারাম বস্তু হালাল পন্থায় অর্জন করলেও তা যেমন হালাল হবে না, অনুরূপ হালাল বস্তু হারাম পন্থায় লাভ করলে তা-ও হালাল বা বৈধ হবে না।

হালাল উপার্জন অন্যতম ফরজ ইবাদত। হাদিস শরিফে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'হালাল জীবিকা সন্ধান করা নির্ধারিত ফরজসমূহের পরে বিশেষ একটি ফরজ।' (শুআবুল

ইমান, বায়হাকি; কানযুল উম্মাল: ৯২০৩)। 'সকল মুসলিম নারী ও পুরুষের ওপর হালাল উপার্জন ফরজ।' (জামিউল আখবার: ১০৭৯)। 'হালাল উপার্জন একটি জিহাদ।' (কানযুল উম্মাল: ৯২০৫)।

হালাল ও সৎ উপার্জনের ফজিলত সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি স্বহস্তে উপার্জিত হালাল রিজিক আহার করল, সে বিদ্যুৎগতিতে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে।' (জামিউল আখবার: ৩৯০)।

'যে ব্যক্তি স্বহস্তে পরিশ্রম করে জীবিকা উপার্জন করে জীবন ধারণ করে, আল্লাহ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকান এবং তাকে কখনো শাস্তি দেবেন না।' (জামিউল আখবার: ১০৮৫)।

'যে ব্যক্তি স্বহস্তে পরিশ্রম করে হালাল রিজিক আহার করল, তার জন্য জান্নাতের দরজাগুলো খোলা থাকবে, সে যেখান দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।' (জামিউল আখবার: ১০৮৭)।

নবীজি (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি স্বহস্তে পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করল, কিয়ামতের দিন সে নবীগণের সঙ্গে শামিল হবে এবং অনুরূপ পুণ্য লাভ করবে।' (জামিউল আখবার: ১০৮৮)।

হালাল রিজিক ও সৎ উপার্জনের সব প্রচেষ্টাই ইবাদত। জীবিকার জন্য প্রিয় নবীজি (সা.) চাকরি করেছেন, ব্যবসা করেছেন। শ্রমিক তাঁর মনিবকে ফাঁকি দিলে তাঁর উপার্জন হালাল হবে না। মনিব তাঁর শ্রমিককে ঠকালে, ন্যায্য পাওনা না দিলে তাঁর সম্পদ হালাল হবে না। কর্মচারী মালিকের সঙ্গে প্রতারণা করলে তাঁর উপার্জন হালাল হবে না, মালিক তাঁর কর্মচারীর প্রতি জুলুম ও অবিচার করলে তাঁর সম্পদ হালাল হবে না।

ব্যবসায়ী পণ্যে ভেজাল দিলে, ওজনে বা পরিমাণে কম দিলে, নকল পণ্য বিক্রি করলে; মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিলে তাঁর উপার্জন হালাল হবে না। ক্রেতাও যদি কোনোভাবে বিক্রেতার সঙ্গে প্রতারণা করে, তবে তাঁর রিজিকও হালাল হবে না।

কোরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'ওই সকল লোকের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ, যারা মানুষ থেকে গ্রহণ করার সময় ঠিকমতো নেয় এবং মানুষকে দেওয়ার সময় কম দেয়।' (সুরা-৮৩ মুতাফ্‌ফিফিন, আয়াত: ১-২)।

সৎ ব্যবসায়ীদের প্রশংসায় প্রিয় নবীজি (সা.) বলেছেন, 'সত্যবাদী বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দিক, শহীদদের সঙ্গে থাকবে।' (তিরমিজি ও ইবনে মাজা)।

আল্লাহ বলেন, হে ইমানদাররা, তোমরা নিজেদের মধ্যে একজন অপরজনের অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করও না (বাকারা ২৩)।

হালাল উপার্জন করতে হলে মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়। বসে বসে অবৈধ উপায়ে উপার্জনে তেমন কষ্ট করতে হয় না; কিন্তু হালাল উপার্জনের জন্য তিলে তিলে সময়, শ্রম, মেধা ব্যয় করতে হয়। এতে মানুষের কর্মবিমুখতা দূর হয়। তাই বিশ্বনবী (সা.) বলেছেন, তোমরা ফজরের সালাত আদায় হয়ে গেলে জীবিকা অনুসন্ধান না করে ঘুমিয়ে পড়বে না।

বিখ্যাত সাহাবি হজরত উমর (রা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন জীবিকার্জনের চেষ্টায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বসে না থাকে। পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল এসেছেন, তারা সবাই নিজ হাতে হালাল উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। তাই হালাল উপার্জন সব নবী-রাসূলের সার্বজনীন সুন্নাত।

হালাল উপার্জন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হালাল ছাড়া অন্য উপায়ে অবৈধভাবে উপার্জনের সম্পদ দ্বারা যে শরীর বা প্রজন্ম গড়ে উঠবে, তা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। তা দিয়ে নিজের দুনিয়ার জীবন ধ্বংস হবে, পরিবার-পরিজনের জীবন নষ্ট হবে- আখিরাতের শাস্তি তো আছেই। কাজেই হালাল উপার্জনে সবাইকে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

কোন মানুষের সাধ্য নেই, আল্লাহ যে রিযক নির্ধারণ করেছেন, তাতে সামান্য রদবদল বা পরিবর্তন করা। কিন্তু এটা ঠিক যে, আল্লাহ যার জন্য যে পরিমাণ রিযকের আসবাব নির্ধারণ করেছেন, তাকে সে পরিমাণই তিনি রিযক প্রদান করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে প্রান্তরে বিচরণ কর এবং তাঁর রিযক থেকে তোমরা আহার কর। আর তাঁর নিকটই পুনরুত্থান। সূরা মুলক : (১৫)

তিনি অন্যত্র বলেন :তাই আল্লাহর কাছে রিযক তালাশ কর, তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। সূরা আনকাবুত : (১৭)

রিযকের জন্য আসবাব গ্রহণ বা তার জন্য চেষ্টা-তদবির করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী বা আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযক নির্ধারিত না হওয়া প্রমাণ করে না। এ পার্থিব জগতের সাধারণ নিয়মে আল্লাহ কাউকে সরাসরি রিযক প্রদান করেন না, এ দুনিয়া দারুল আসবাব বা উপায় অবলম্বনের জগত, সবাইকে তিনি রিযকের জন্য উপায় অবলম্বনের নির্দেশ দেন, যেমন মারইয়াম আলাইহাস সালামকে দিয়েছেন :

আর তুমি খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে তোমার দিকে নাড়া দাও, তাহলে তা তোমার উপর তাজা পাকা খেজুর ফেলবে'। সূরা মারইয়াম : (২৫)

আল্লাহ চাইলে নাড়া ব্যতীতই তার নিকট খেজুর পড়ত, কিন্তু তিনি তাকে আসবাব গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই সকলের কর্তব্য রিযকের আসবাব গ্রহণ করে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা।

রিযকের জন্য প্রত্যেক মুসলমানের উচিত আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করা এবং হালাল রিযকের উপায় অবলম্বন করা ও হারাম থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ তার ইচ্ছা ও হিকমতের দাবি অনুসারে প্রত্যেককে রিযক প্রদান করেন। অতএব যার জন্য আল্লাহ যে পরিমাণ রিযক নির্ধারণ করেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকা এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন। এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না।সূরা তালাক : (২-৩)

তিনি আরো বলেন :আর আল্লাহ যদি তার বান্দাদের জন্য রিযক প্রশস্ত করে দিতেন, তাহলে তারা যমীনে অবশ্যই বিদ্রোহ করত। কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট পরিমাণে যা ইচ্ছা নাযিল করেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে পূর্ণ অবগত, সম্যক দ্রষ্টা। সূরা শুরা : (২৭)

ইবনে কাসির রহ. বলেছেন : কিন্তু আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককে সে পরিমাণ রিযক প্রদান করেন, যাতে তার কল্যাণ নিহিত। এ ব্যাপারে তিনিই বেশী জানেন। অতএব যে সম্পদের উপযুক্ত তাকে তিনি সম্পদ দান করেন। আর যে অভাবের উপযুক্ত তাকে তিনি অভাবে রাখেন।

যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন। এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না।সূরা তালাক: (২-৩)

হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য:

জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জনের গুরুত্ব ইসলামে যেমনি রয়েছে, ঠিক তেমনি হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও অত্যাধিক। ইসলাম মানুষের জন্য যাবতীয় জীবনোপকরণকে সহজসাধ্য, সুস্পষ্ট, ও পবিত্র করার নিমিত্বে সঠিক ও বৈজ্ঞানিক নির্দেশনা দিয়েছে। অতএব নির্দেশনা বহির্ভূত যাবতীয় উপার্জনই হারাম বা অবৈধ হিসেবে বিবেচিত। ইসলামের বক্তব্য হল মানুষকে নিজের সার্মথ্য ও যোগ্যতানুযায়ী নিজেই নিজের প্রয়োজনীয় অর্থ ও দ্রব্য সামগ্রীর সন্ধান করবে। এটি মানুষের অন্যতম অধিকার। তবে ইসলাম মানুষকে এ অধিকার দেয়নি যে, সে অর্থ সম্পদ উপার্জনের জন্য স্বীয় খেয়ালখুশিমত যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে পারবে। তাইতো ইসলাম অর্থসম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের পার্থক্য সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সমাজ রাষ্ট্র ও ব্যাক্তির জন্য কল্যানকর যাবতীয় ব্যবস্থাকে ইসলাম হালাল করেছে। নিম্নে এ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হল:

এক. হালাল উপার্জন একটি অলঙ্ঘনীয় বিধানঃ

ইসলাম মানুষের জন্য হালাল ও হারামের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরূপন করেই শেষ করেনি, বরং হালাল উপার্জনে রয়েছে এর সুস্পষ্ট নির্দেশনা। ফরজ ইবাদত সমূহের আদায়ের পর এ মহতি কর্মে ঝাপিয়ে পরতে উৎসাহিত করা হয়েছে। উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল ও বৈধ উপায় অবলম্বন করা ব্যবসায়ীসহ সকল মানুষের উপর ইসলামের একটি অলঙ্ঘনীয় বিধান। যারা উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল ও হারামের প্রশ্নে সতর্কতা অবলম্বন করে না তাদের ব্যপারে নবী করিম সতর্কবাণী করেছেন। তিনি বলেন:

«□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□»

"মানুষের নিকট এমন একটি সময় আসবে, যখন ব্যক্তি কোন উৎস থেকে সম্পদ আহরন করছে, তা হালাল না হারাম, সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ করবে না।"[4]

দুই. হালাল উপার্জন দু'আ কবুলের পূর্বশর্তঃ

মানুষের প্রত্যহিক ও জাগতিক জীবনের চাহিদার কোন অন্ত নেই। তবে এগুলো মানুষের কাঙ্খিত ও বাঞ্চিত হলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মহান স্রষ্ট্রার অনুগ্রহের, ভূমিকাই সবচেয়ে বেশী। আর এর জন্য প্রয়োজন একান্তে তাঁর দরবানে আরাধনা করা। মহান আল্লাহ ও মানুষে এ ব্যপারে সাড়া দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এটি অন্যতম ইবাদত ও বটে। রাসূল সা. বলেন :

"দোয়া হচ্ছে ইবাদত"[5] অতএব দু'আ ইসলামে অন্যতম একটি ইবাদতে পরিণত হয়েছে, যার মাধ্যমে বান্দার সাথে আল্লাহর গভীর প্রেম নিবেদন করা চলে এবং যাবতীয় প্রয়োজন পূনণে সহায়ক হয়। এ গুরুত্বপূর্ণ কর্মটি আল্লাহর দরবারে গৃহীত হতে হলে উপার্জন অবশ্যই হালাল হতে হবে। কেননা আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণ করেননা, অতএব অবৈধ উপার্জন যারা করে তাদের খাদ্যের উপার্জন হয়

অবৈধ অর্থে হওয়ায় ইসলম যাবতীয় রক্ত গোশত সবই হারাম দ্বারা পুষ্ট হয়। ফলে এ ধরনের ব্যক্তির প্রার্থনাকে ইসলামে কখনো সমর্থন করেনা। এ মর্মে রাসূল সা. বলেন:

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআল পবিত্র। তিনি শুধু পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করেন। তিনি মুমিনদের সেই আদেশই দিয়েছেন, যে আদেশ তিনি দিয়েছিলেন রাসূলগণের।” আল্লাহ তা’আলা বলেন : “হে ইমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুযী হিসেবে দান করেছি।” অতঃপর রাসূল সা. এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দীর্ঘ সফরে থাকা অবস্থায় এলোমেলো চুল ও ধূলি-ধুসরিত ক্লান্ত-শ্রান্ত বদনে আকাশের দিকে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা করে ডাকছেঃ হে আমার প্রভূ! হে আমার প্রভূ! অথচ সে যা খায় তা হারাম, যা পান করে তা হারাম, যা পরিধান করে তা হারাম এবং হারামের দ্বারা সে পুষ্টি অর্জন করে। তার প্রার্থনা কিভাবে কবুল হবে?”

ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছেঃ

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একদা এ আয়াতটি তেলাওয়াত করা হল। “হে মানবমন্ডলী ! পৃথিরীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষন কর।” তখন সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লহর কাছে দু’আ করুন যেন আমার দু’আ কবুল হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে সা‘দ, তোমার পানাহারকে হালাল কর, তবে তোমার দু’আ কবুল হবে।”[7]

তিন. হালাল উপার্জনে বরকত লাভ হয়ঃ

উপার্জনে বরকত লাভ করতে হষে একমাত্র হালাল পন্থায় হতে হবে। কেননা বরকত দানের মালিক মহান আল্লাহ। তিনি শুধু বৈধ উপার্জনেকেই বরকত মন্ডিত করেন। এবং যাবতীয় অবৈধ উপার্জনের বারকত নষ্ট করে দেন। আর যেখানে অপচয় বৃদ্ধি

পায়। ফলে সম্পদের প্রাচুর্যতা লাভে বিলম্ব হয়। অন্যদিকে হালাল উপার্জন কম হলেও তাতে বরকতের কারণে খুব স্বল্প সময়েই বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

চার. হালাল উপার্জন জান্নাত লাভের একমাত্র উপায়ঃ

মানুষের দু'টি জীবন রয়েছে, একটি ইহলৌকিক, অপরটি পরলৌকিক। অতএব হালাল পন্থায় উপার্জনকারী পরকালে জান্নাতে যাবে। আর অবৈধ পন্থায় উপার্জনকারী ব্যাক্তি দুনিয়ার জীবনে সম্পদের পাহাড় গড়লেও পরকালীন জীবনে তার জন্য ভয়াবহ আযাব ও শাস্তি অপেক্ষা করছে।

পাঁচ. অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জনকারীর জন্য জাহান্নাম অবধারিতঃ

ইবন আব্বাস রা.বর্ণিত হাদীসে রাসূল সা. বলেছেনঃ

"আর যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা গড়ে উঠে তার জন্য দোযখের আগুনই উত্তম।"[8]

কাব ইবন উজরাহ রা. রাসূলে কারীম সা. থেকে বর্ণনা করেন:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامٍ»

"যে শরীর হারাম পেয়ে হৃষ্ট পুষ্ট হয়েছে, তা জান্নাতে যাবে না।"[9]

দুনিয়ার জীবনের কৃতকর্মের উপর ভিত্তি করে মহান আল্লাহ মানুষের জন্য পুরুস্কার ও শাস্তি উভয়ের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। যারা তাঁর অনুগত বান্দা তারাই পুরুস্কার প্রাপ্ত হবে। যেহেতু অবৈধ উপায়ে উপার্জনকারী ব্যক্তি তার অবাধ্য ও দুশমন তাই তাদের জন্য ও শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। অতএব এ পন্থা অবলম্বনকারী ব্যক্তি জাহান্নামী।

ছয়. হালাল উপার্জন ইবাদত কবুলের শর্তঃ

অর্থ-সম্পদ দ্বারাই মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে, খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে তার দেহের বৃদ্ধি ঘটে এবং সুস্বাস্থ্য লাভ হয়। কিন্তু এ উপকরণ ক্রয়ের অর্থ যদি অবৈধ উপায়ে উপার্জিত

হয় তবে তা কিভাবে বৈধ শারিরিক বৃদ্ধি হতে পারে। ফলে তার শরীরের রক্তে ও গোশতে অবৈধ বিষয়ের সংমিশ্রন ঘটে। আর এর দ্বারা যত ইবাদতই করা হোক না তা গ্রহনযোগ্য হতে পারে না। কেননা আল্লাহ অপবিত্র কোন কিছুই গ্রহণ করে না। অতএব হালাল উপার্জন ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত হিসেবে শিরোধার্য। সালাত, যাকাত ও হজ্জ ইত্যাদি ফরয ইবাদতসমূহ কবুল হওয়ার জন্র অবশ্যই বৈধ পন্থায় উপার্জন করতে হবে।

[1] . সূরা আল-বাকারা: 168।

[2] .সূরা নিসা:২৯।

[3] . সূরা আল-বাকারাহ্: ১৮৮।

[4] . ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, হাদীস নং ২০৫৯।

[5] . আবু দাউদ, সুনান, হাদীস নং ১৪৭৯।

[6] . ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ১০১৫।

[7] . ইমাম তাবারানী, মু'জামুল আওসাত, খ. ৬, পৃ. ৩১০

[8] .তাবারানী।

[9]. আবু ইয়া'লা, মুসনাদ আবী ইয়া'লা, খ.১ পৃ. ৮৪।

আগামীকাল কী খাবো? রিজিক নিয়ে যত বৃথা সংশয়, যত অহেতুক ভয় !

আমরা দুনিয়ার জীবনে সুন্দরভাবে বাঁচার জন্য যতগুলো বিষয় নিয়ে খুব বেশি ভাবি, চিন্তিত হই, দুশ্চিন্তা করি, সেগুলোর মধ্যে প্রথম দিকে আছে খাওয়া সংক্রান্ত রিজিক নিয়ে চিন্তা। কাল কী খাবো, কালকের খাবার ফ্রিজে থাকলে পরশু কী খাবো সেই চিন্তা। দুচার দিনের খাবার মজুদ থাকলে আগামী মাসে কী খাবো, কীভাবে সংসার চলবে, কীভাবে পরিবারের সদস্যরা খাবে? মেহমান আসলে কী খাবে?

এসব স্বাভাবিক চিন্তা মুহুর্তের মধ্যে দুশ্চিন্তায় রূপান্তরিত হয়ে যায় শুধু একটি কারণে।সেই কারণটি হচ্ছে, আগামীকালের রিজিক বা খাওয়ার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব যে মহান আল্লাহর সেই আল্লাহর ওপর আমাদের ভরসা কমে গেছে।আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি, তিনি আমাদের বানিয়েছেন, জীবন দিয়েছেন, মৃত্যু দেবেন, তিনি রিজিকদাতা- আমাদের খাদ্যের ব্যবস্থাও তিনি করেন তা আমরা জানি কিন্তু আমরা বাস্তব জীবনে সংকটে পড়লে আমরা তা ভুলে যাই।

রিজিক নিয়ে চিন্তা সবারই কমবেশি আছে। থাকাটা স্বাভাবিক।কিন্তু আমাদের চিন্তাগুলো স্বাভাবিক না থেকে তা দুশ্চিন্তায় রূপান্তরিত হওয়ায় আমরা একটুতেই হতাশ হয়ে পড়ি। রিযিকের ব্যাপারে কুরআনের আয়াতগুলো আর হাদীসগুলো যদি একজায়গায় করে আমরা মনোযোগ দিয়ে পড়তাম তাহলে আমাদের অন্তত রিজিক নিয়ে এই দুশ্চিন্তা কমতো।কারো কারো থাকতোই না। আমি দুয়েকটা আয়াত আপনাদের সাথে শেয়ার করি।

আল্লাহ কুরআনে একাধিক জায়গায় বলেছেন, তিনি যাকে চান তাকে বিনা হিসাবে রিজিক দান করেন। (১)

আল্লাহ রিজিক দেন, তিনিই রিযিকের মালিক–এসব কথা আল্লাহ কুরআনের অসংখ্য জায়গায় বলেছেন।জাহিলী যুগে কিছু মানুষ ছিলো যারা ভাবতো, সন্তান হলে কী খাওয়াবে? সন্তানরা তাদের সাথে খাওয়ায় ভাগ বসাবে এই ভয়ে তারা তাদের সন্তানদের হত্যা করতো।এখনো দেখা যায় অনেকেই বেশি সন্তান নিতে ভয় পায় এই জন্য শুধু যে, তাকে খাওয়াবে কীভাবে?তার কাছে তো যে সম্পদ আছে তাতে যারা পরিবারের সদস্য হিসাবে আছে তাদেরই খাওয়ানো কঠিন হয়ে যাচ্ছে, নিজেরাই ঠিক মতো খেতে পারছি না, আবার আরেকজন সন্তান আসলে তাকে কী খাওয়াবো?

এই চিন্তায় আধুনিক যুগের সভ্য অনেক পরিবার সন্তান মায়ের পেটেই নষ্ট করে দেয় বিশেষ করে মেয়ে বাচ্চা।অথচ সন্তানকে খাওয়ানোর ভয়ে সন্তানকে নষ্ট করে ফেলা

বা সন্তান নিতে না চাওয়া জাহিলী নীতি।এই নীতিকে চরমভাবে আঘাত করে আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন।

তিনি বলেছেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদের দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না। আমি তাদেরকেও রিযিকের ব্যবস্থা করবো, তোমাদেরও।" (২)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "আমরা তোমাদেরকেও রিজিক দেবো এবং তাদেরকেও দেবো।" (৩)

এই আয়াতদুটি স্পস্টভাবে বলে দিচ্ছে, আল্লাহ এমন রিজিকদাতা, তিনি অনাগত সন্তানদের রিযিকের ব্যবস্থাও করবেন। আর সে ব্যবস্থা তোমাদের রিজিক থেকে নিয়ে না বরং তোমাদের জন্য রিযিকের আলাদা বরাদ্দ থাকবে।

তোমাদের কারো রিযিকের জন্য দুশ্চিন্তা করতে হবে না।রিযিকের ব্যাপারে একটা হাদীস যেদিন থেকে পড়েছি এবং বুঝেছি সেদিন থেকে মাথা থেকে রিযিকের দুশ্চিন্তা যতটুকু ছিলো তাও দূর হয়ে গেছে।আশা করি আপনাদেরও যাদের রিজিক নিয়ে দুশ্চিন্তা আছে তাদের জন্য এই হাদীসটি একটি বড় আশার খুশির উপায় হতে পারে।রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি তোমরা সত্যিকারভাবে আল্লাহর উপরে ভরসা করতে তাহলে তোমাদেরকে সেভাবে রিজিক দেয়া হতো যেভাবে পাখিদেরকে রিজিক দেয়া হয়।

পাখিরা সকাল বেলা খালি পেটে বের হয়ে যায় আর সন্ধাবেলায় ভরা পেটে নীড়ে ফিরে আসে।" (৪)

এই হাদীসটি আবার পড়ুন।দেখুন আল্লাহ তার ওপরে ভরসাকারীদেরকে কিভাবে রিজিক দেয়ার ওয়াদা করেছেন।আমরা দেখি, পাখিরা বনজঙ্গলে থাকে, লোকালয়েও থাকে, সেখানেই থাকুক তারা সকাল বেলা খালি পেটে খাবারের সন্ধানে বের হয়ে যায়।

তাদের জন্য কেউ বনে জঙ্গলে রান্না করে খাবার রেখে আসেনি, কেউ তাদের জন্য খাবার রান্না করে বাড়ির ছাদেও রেখে আসে নি, বাড়ির সামনেও ছিটিয়ে দেয়নি, এই পাখপাখালি, জীব-জানোয়ারদের খাবারের জন্য দেশের খাদ্য মন্ত্রণালয় কিংবা বিশ্ব খাদ্য সংস্থাও কোনো উদ্যোগ নেয়নি।তাহলে প্রতিদিন স্থলভাগের অসংখ্য পশু-পাখি আর

পানির মধ্যের অগণিত জলজ প্রাণী কীভাবে বেঁচে আছে?কে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করছে প্রতিদিন?অবশ্যই কোনো মানুষ নয়।মানুষের নিয়ন্ত্রণের কোনো সংস্থা নয়। এইসব প্রাণীর রিযিকের ব্যবস্থা প্রতিদিন করে দিচ্ছেন বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ সুবহানু ওয়া তাআলা।

তিনি যেভাবে এই হাজার কোটি পশুপাখির রিযিকের ব্যবস্থা করেন সেভাবেই দুনিয়ার এই সাতশ কোটি মানুষের রিযিকের ব্যবস্থা করেন।এটি আল্লাহর কাছে কোনো ব্যাপারই না। আল্লাহ শুধু তার ওপরে সত্যিকারের জন্য ভরসা করতে বলেছেন। ভরসা মানে কোনো উপায় অবলম্বন না করে ঘরে বসে থেকে ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করা নয়। সত্যিকারের ভরসা মানে সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করার পর এর ফলাফলের জন্য আল্লাহর দিকে চেয়ে থাকা।পাখিরা কিন্তু সকাল বেলা নীড় থেকে খালি পেটে বের হয়।ঘরে বসে থাকে না। বের হয়ে এগাছ থেকে ওগাছে। এই জায়গা থেকে ঐ জায়গায়। ঘুরে বেড়ায় আর উড়ে বেড়ায়। এরই মাঝে আল্লাহ তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করে দেন।

শুধু তাদেরই না বরং তাদের বাসায় যদি তাদের বাচ্চারা থাকে তাহলে তাদের জন্যও রিযিকের ব্যবস্থা আল্লাহ করে দেন, যা তারা মুখে নিয়ে বাসায় ফেরে।রিযিকের সাথে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় জড়িত।সেটি হচ্ছে রিজিক অন্বেষণ ও উপার্জনের সময় অবশ্যই দেখতে হবে রিজিকটি হালাল কিনা এবং হালাল উপায়ে অর্জিত হচ্ছে কিনা।কিয়ামতের আগে একটা সময় আসবে যখন উপার্জন হালাল না হারাম তা বাছবিচার করবে না বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভবিষ্যতবাণী করেছেন।

আজকে দেখতেও পাচ্ছি তাই।মানুষ হালাল-হারামের তোয়াক্কাই করছে না।পাঁচ ওয়াক্ত নামাযী হাজী সাহেবও আয়-উপার্জনের সময় সুদ-ঘুষ সহ হালাল-হারামের বাছ-বিচার করছেনই না।করলেই অনেকটা শিথিল।কিন্তু স্বাভাবিকভাবে হালাল ছাড়া কিছু খাওয়া কোনো মুসলিমের জন্য জায়েয নয়।তাই আমাদের অবশ্য কর্তব্য, সবসময় হালাল রিজিক তালাশ করা এবং তাই খাওয়া ও পরিবারকে খাওয়ানো।

অনেকেই মনে করে রিযিকের সাথে মনে হয় দৈহিক শক্তির অনেক সম্পর্ক। শক্তিশালী হলেই রিজিক পাবো, নয়তো পাবো না।এ কথা সঠিক নয়।শারীরিক শক্তির কারণে যদি কেউ রিজিক পেতো তাহলে ছোট্ট চড়ুই পাখি কখনো রিজিক পেতো না আর বিশালদেহী শক্তিশালী তিমি, হাতি কিংবা সিংহ কখনো না খেয়ে থাকতো না।কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, চড়ুই রিজিক পায় যদিও তার দেহ ছোট, শক্তিও কম, অপরদিকে শক্তিশালী সিংহও মাঝে মাঝে না খেয়ে থাকে দিনের পর দিন।তাই শারীরিক শক্তির মাধ্যমে রিজিক বন্টিত হয় না। রিজিক বন্টিত হয় সাত আসমানের উপর থেকে।

সারা দুনিয়ার মানুষ মিলেও যদি আপনার রিজিক বন্ধ করতে চায় আল্লাহ না চাইলে কেউ পারবে না আর আল্লাহ রিজিক দিতে না চাইলে সারা দুনিয়ার মানুষ মিলেও আপনাকে এক লোকমা খাবার খাওয়াতে পারবে না। রিযিকের মালিক তো আল্লাহ। তিনিই রিজিক বণ্টন করেন। এই বণ্টনে কোনো মানুষের হাত নেই।তাই মানুষ চাইলেই আপনার রিজিক বন্ধ করতে পারবে না আবার মানুষ চাইলেই আপনার রিযিকের ব্যবস্থাও করে দিতে পারবে না। তাই রিজিক বন্ধে মানুষের কোনো হুমকিতে কান দেয়ারও দরকার নেই আবার কেউ যদি বলে "আমি আপনাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করেছি"–সে কথায়ও উচ্ছ্বসিত হওয়ার কিছু নেই।আমরা রিযিকের জন্য মানুষের পেছনে দৌড়াই। আমাদের দৌড়াদৌড়ি দেখলে মনে হবে, মানুষই মনে হয় রিযিকের মালিক।

অথচ আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর কাছে রিজিক তালাশ করো এবং তারই ইবাদাত করো।" (৫)

আল্লাহর কাছে যেমন রিজিক চাইতে হবে তেমনি মাঠেঘাটে যেখানে রিজিক পাওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখানে গিয়ে চেষ্টা করতে হবে।আল্লাহ কারো রিযিকের ব্যবস্থা করে রেখেছেন সমুদ্রের মাঝে, আবার কারো রিযিকের ব্যবস্থা করে রেখেছেন লোকালয়ে অফিস-আদালতে।কারোটা করে রেখেছেন দেশের মাটিতে, কারোরটা বিদেশে।যেখানে যার রিজিক আছে আল্লাহ সেখানে তাকে নিয়ে যাবেন।যার জন্য যতটুকু রিজিক বরাদ্দ আছে তা ভোগ না করে সে মৃত্যুবরণ করবে না।

তাই রিজিক হারাবার ভয় কিসের?চলুন, রিযিকের পেছনে দৌড়ানোর সাথে সাথে রিযিকের মালিকের পেছনেও দৌড়াই। আর রাযযাক আল্লাহর ওপরে সত্যিকারের ভরসা রাখি।তিনিই রিযিকের মালিক।sতিনিই আমাকে-আপনাকে সবাইকে রিজিক দিবেন।

রিজিকের সর্বনিম্ন স্তরঃ টাকা, পয়সা, অর্থ, সম্পদ ।সর্বোচ্চ স্তরঃ শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা। সর্বোত্তম স্তরঃ পুণ্যবান স্ত্রী ও পরিশুদ্ধ নেক সন্তান পরিপূর্ণ স্তরঃ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি। রিজিক খুব গভীর একটি বিষয় যদি আমরা বুঝতে পারি। আমি পুরো জীবনে কত টাকা আয় করবো সেটা লিখিত, কে আমার জীবনসঙ্গী হবে সেটা লিখিত, কবে কোথায় মারা যাবো সেটা লিখিত। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, আমি কতগুলো দানা ভাত দুনিয়াতে খেয়ে তারপর মারা যাবো সেটা লিখিত। একটি দানাও কম না, একটিও বেশি না।

ধরেন এটা লিখিত যে আমি সারাজীবনে ১ কোটি টাকা আয় করবো, এই সিদ্ধান্ত আল্লাহ্ তায়ালা নিয়েছেন। আমি হালাল উপায়ে আয় করবো না হারাম উপায়ে আয় করবো সেই সিদ্ধান্ত আমার। যদি ধৈর্য ধারণ করি, আল্লাহ্ তায়ালার কাছে চাই, তাহলে হালাল উপায়ে ওই ১ কোটি আয় করেই আমি মারা যাবো, হারাম উপায়ে হলেও ওই ১ কোটিই... নাথিং মোর, নাথিং লেস!

আমি যেই ফলটি আজকে ঢাকা বসে খাচ্ছি, সেটা হয়ত ইতালি কিংবা থাইল্যান্ড থেকে ইমপোর্ট করা। ওই গাছে যখন মুকুল হয়েছে তখনই এটা নির্ধারিত যে সেটি আমার কাছে পৌঁছাবে। এর মধ্যে কত পাখি ওই ফলের উপর বসেছে, কত মানুষ এই ফলটি পাড়তে গেছে, দোকানে অনেকে এই ফলটি নেড়েচেড়ে রেখে গেছে, পছন্দ হয় নি, কিনে নি। এই সব ঘটনার কারণ একটাই, ফলটি আমার রিজিকে লিখিত। যতক্ষণ না আমি কিনতে যাচ্ছি, ততক্ষণ সেটা ওখানেই থাকবে।

এর মধ্যে আমি মারা যেতে পারতাম, অন্য কোথাও চলে যেতে পারতাম, কিন্তু না। রিজিকে যেহেতু লিখিত আমি এই ফলটি না খেয়ে মারা যাবো না। রিজিক জিনিসটা

এতোটাই শক্তিশালী!কিংবা যেই আত্মীয় কিংবা বন্ধু-বান্ধব আমার বাসায় আসছে, সে আসলে আমার খাবার খাচ্ছে না। এটা তারই রিজিক, শুধুমাত্র আল্লাহ্ তায়ালা আমার মাধ্যমে তার কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। হতে পারে এর মধ্যে আমাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে। আমরা হালাল না হারাম উপায়ে খাচ্ছি সেটা নির্ভর করছে আমি আল্লাহ্ তায়ালার উপর কতটুকু তাওয়াক্কাল আছি, কতটুকু ভরসা করে আছি। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সঠিক পথ ও রিজিক এর তৌফিক দান করুন, আমিন

❒ ফুটনোটঃ

[১] সূরাহ আল-বাকারাহ, আয়াত ২১২ এবং সূরাহ আলে-ইমরান, আয়াত ৩৭।

[২] সূরাহ বানী-ইসরাঈল, আয়াত ৩১।

[৩] সূরাহ আল-আন'আম, আয়াত ১৫১।

[৪] জামি তিরমিযী, হাদিস নং ২৩৪৪।

[৫] সূরাহ আল-আনকাবূত, আয়াত ১৭।

লেখা: উস্তায শাহদাত ফয়সাল (রহ.)

তাহাদের ইখলাস,আমাদের ইখলাস

|ধূলিমলিন উপহার,রামাদান✿

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইখলাস বিহীন আমলের নমুনা ঐ মুসাফিরের মতো, যে একটি ময়লা পানি ভর্তি পাত্র বহন করছে, এই পাত্রটি বহন করতে তার অনেক কষ্ট হয় কিন্তু পানিতে ময়লা থাকায় এটা তার কোন উপকারে আসে না। চমৎকার তুলনা। আসলেই ময়লা পানি যেমন আমাদের কোনো কাজে লাগে না, তেমনি ইখলাস বিহীন আমলও আমাদের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না।

দাউদ ইবনে আবি হিন্দ রাহিমাহুল্লাহ চল্লিশ বছর যাবত সিয়াম রেখেছিলেন, অথচ তার স্ত্রীও এ ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। তিনি পশমের কাপড় বানাতেন। প্রত্যেক দিন তার স্ত্রী খাবার তৈরি করতেন এবং দাউদ কাজে বের হওয়ার সময় তার সাথে ঐ খাবার দিয়ে দিতেন। আর দাউদ বাজারে গিয়ে খাবারটি একজন গরীব মানুষকে দিয়ে দিতেন এবং মাগরিবের পর বাসায় ফিরে তার স্ত্রীর সাথে খাবার খেতেন অর্থাৎ ইফতার করতেন। বাজারের লোকজন ভাবত যে তিনি তার স্ত্রীর সাথে খাবার খেয়ে এসেছেন আর তার স্ত্রী ভাবতেন তিনি বাজারে গিয়ে খাবার তার তৈরি করে দেয়া খাবার খাবেন, কিন্তু দাউদ সিয়াম রাখতেন আর সাথে করে আনা খাবার একজন গরীব লোককে দিয়ে দিতেন। সুবহানআল্লাহ! এটাই তো ইখলাস। শুধু তা ই নয়, তিনি বিশ বছর ধরে কিয়ামুল লাইল (রাতের নামাজসহ অন্যান্য ইবাদত) করেছেন, কিন্তু তার স্ত্রী এটাও কখনো জানতে পারেন নি। চিন্তা করে দেখুন ইবাদতের ক্ষেত্রে তাদের ইখলাস এবং আমাদের ইখলাস এর মাঝে কি পরিমাণ ফারাক!

আইয়্যুব আস সাখতিয়ানি রাহিমাহুল্লাহ সারারাত নামাজ পড়তেন আর ফজরের কিছুক্ষণ আগে থেকে কিছুটা আওয়াজ করে কুরআন তিলাওয়াত করতেন যাতে মানুষ মনে করে যে তিনি ফজরের কিছুক্ষণ আগে ঘুম থেকে উঠেছেন, অথচ তিনি সারারাতে একটুও ঘুমাননি। এই ছিল তাদের ইখলাস, এখন নিজেকে একটু প্রশ্ন করুন আমাদের, আপনাদের কি অবস্থা !

হাসান ইবনে আবি সিনানের (রাহিমাহুল্লাহ) স্ত্রী বলেছেন "আমার স্বামী প্রায়ই আমার সাথে চালাকি করে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতেন যেমনটি আমরা আমাদের বাচ্চাদের চালাকি করে ঘুম পাড়িয়ে দেই, আর যখনই আমি ঘুমিয়ে পড়তাম তখন তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। একবার হাসানের স্ত্রী তাকে নামাজ পড়তে দেখে ফেললেন আর বলে উঠলেন, "আবু আব্দুল্লাহ! কেন নিজেকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছেন? নিজের উপর একটু রহম করুন। আবু আব্দুল্লাহ উত্তর দিলেন, "কী বোকার মতো কথা বলছ! তুমি আমাকে দুনিয়াতে ঘুমাতে বলছ! আমি অবশ্যই ঘুমাব, বিশ্রামও নেব কিন্তু সেদিন, যেদিন

আমাকে আর ঘুম থেকে উঠতে হবে না (মৃত্যু)। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে যেন সব উল্টো, ইখলাস খুজে পাওয়াই যেন দায় !

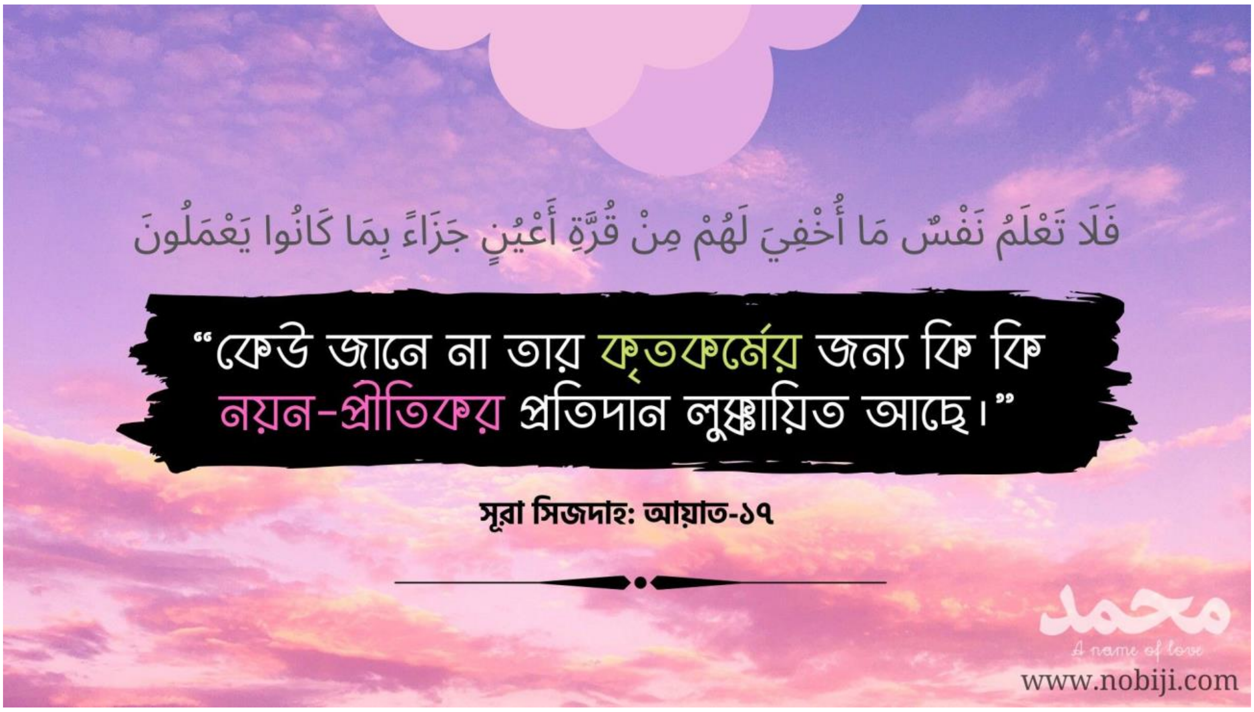

আলী ইবনে আবি তালিবের (রাদিআল্লাহু আনহু) এর নাতির ছেলে, যাইন আল আবিদীন রাহিমাহুল্লাহ দশ বছর ধরে মদীনার গরীব লোকদের খাবার দিতেন, কিন্তু কেও জানতে পারত না কে তাদের খাবার দিচ্ছে। প্রতিদিন সকালে তারা বাড়ির সামনে খাবার পেত। শেষ পর্যন্ত যাইন আল আবিদীন মারা গেলে তারা বুঝতে পারল যে তিনিই তাদের খাবার দিতেন কারণ যাইন মারা যাবার পর তারা আর খাবার পেত না। পরে যাইনকে গোসল করানোর সময় তারা তার পিঠে অনেক দাগ দেখতে পেল, এই দাগগুলো আসলে গরিবদের জন্য খাবার বহন করতে করতে তার পিঠে বসে গিয়েছিল।

একজন মানুষের ইখলাস কতটা মজবুত হলে এমনটা হতে পারে একবার ভেবে দেখুন। সেখানে আজকাল আমরা কাউকে সাহায্য করলে তা প্রচার করার জন্য যেন মরিয়া হয়ে উঠি। ছবি তুলে ফেসবুকে না দিতে পারলে আমাদের ইবাদাত যেন শুদ্ধ ই হয়না এমন একটা অবস্থা। আসলে ইখলাস কি সেটাই তো আমরা বুঝি না তাই আজ

আমরা ইবাদাতের মাঝে কোন শান্তি ও খুজে পাই না। সব যেন লোক দেখানো শো ওফ !

আল-আ'মিশ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ইব্রাহীম আন নাখা'ই রাহিমাহুল্লাহ এর কাছে গিয়ে দেখলাম, তিনি কুরআন পড়া শুরু করেছেন এবং একটানা পড়েই যাচ্ছেন। কিন্তু অন্য কেউ আসার সাথে সাথে তিনি কুরআন পড়া বন্ধ করে পাশে সরিয়ে রাখতেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে আমি তার এই গোপন আমলের কথা কাউকে বলব না। তাই আমাকে বলতেন, "আমি চাইনা লোকজন আমাকে কুরআন পড়া অবস্থায় দেখুক।" এই ছিলো তাদের ইখলাস ! আল্লাহু আকবার!

এই সব নেককার ব্যক্তি আর যারা আল্লাহর রাস্তায় এক বিন্দু ঘাম না ঝরিয়েও নিজেদের নিয়ে গর্ব করতে ব্যস্ত, তাদের মধ্যে কতই না পার্থক্য। যারা সাধারণ একটি খুতবা দিয়ে, অল্প কিছু এতীমের ভরণপোষণ দিয়েই গর্ব করে বেড়ায় অথবা পাঁচ মিনিটের হালাকা করে, রমাদানে দুই তিনবার তারাবির নামাজে গিয়েই অনেক বড়াই করে, মূলত তাদের এ সকল কাজে কোনো ইখলাস বা আন্তরিকতা থাকে না। আর যারা গোপনে আমল করে তাদের আমলে ইখলাস থাকে, এ ধরনের আমলই কার্যকর হয়।

ইবন আল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহ হিজরী ১৮০ সালে মারা যান। তিনি ছিলেন একজন আলিম, এবং ইখলাস এর ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন। এমনকি তিনি আশংকা করতেন যে, লোকেরা তার আমলের ব্যাপারে জেনে গেলে অথবা তার প্রশংসা করলে হয়তো তার ইখলাস বরবাদ হয় যাবে।

না'ঈম ইবন হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যখন ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহ হাদিস পড়ার সময় ঐভাবেই কাঁদতেন, কুরবানী করার সময় উট বা গাভী যেভাবে শব্দ করে কাঁদে। সুফিয়ান আস সওরী রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, আমার খুব ইচ্ছা হয়, আমি যেন অন্তত এক বছর হলেও আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের রহঃ মত আমল করতে পারি। কিন্তু আফসোস আমি তো মাত্র তিন দিনও এমন আমল করতে পারি না, যেটা আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের রহঃ তিনদিনের আমালের সমান হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহঃ

ছিলেন একজন মু'মিন, হক্ক আলিম এবং মুজাহিদ, যিনি তাঁর হক্ক ইলমকে কাজে পরিণত করেছিলেন।

ইবনে মুবারক রহ একবার রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদে গেলেন। দু'দল ছিল একে অপরের মুখোমুখি, লড়াই শুরু হবার উপক্রম। তখনকার যুদ্ধের রীতি ছিল উভয় দল থেকে একজন করে এসে মুখোমুখি লড়াই করবে। রোমানদের মধ্য থেকে একজন দাঁড়িয়ে বলল, কে আছো এমন যে আমার তরবারির সামনে দাঁড়াবে? অর্থাৎ এটা ছিল তরবারি লড়াইয়ের আমন্ত্রণ। একজন মুসলিম তার সাথে কিছুক্ষণ লড়াই করে আহত হল এবং রোমান লোকটি মুসলিম লোকটিকে শহীদ করে ফেলল। এরপর দ্বিতীয় মুজাহিদ এগিয়ে গেল এবং আল্লাহর ইচ্ছায় শহীদ হয়ে গেল।তৃতীয় বারও একই ফলাফল হলো। কিন্তু চতুর্থ মুজাহিদ আল্লাহর ইচ্ছায় অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই রোমান লোকটিকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিল। ফলে এই বীর মুজাহিদকে দেখার জন্য মুসলিম বাহিনী তার চারপাশে ভিড় করতে লাগল। ইবনে সুলাইমান বলেন, আমিও এই মুজাহিদের পরিচয় জানার জন্য ঐ ভিড়ের মধ্যে ছিলাম, কিন্তু ঐ মুজাহিদের মুখ ঢাকা ছিল। কারণ তিনি নিজেকে জাহির করতে চাচ্ছিলেন না,আর তিনি এমনভাবে ভিড় থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন যেন কিছুই হয়নি। ইবনে সুলাইমান বলেন, আমি তার মুখের কাপড় টান দিয়ে খুলে ফেললাম আর দেখলাম যে, এই বীর মুজাহিদ আর কেউ নন, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহঃ আমার কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, "আবু ওমর! (আবু ওমর ইবনে সুলাইমানের কুনিয়াত) তুমিও কী তাদের মতো, যারা মানুষকে অন্যের সামনে অনাবৃত/উন্মুক্ত করে দেয়? ইন্না লিল্লাহ ! জিহাদের ময়দানেও কি ছিলো তাদের ইখলাস !

ইবনে মুবারক মনে করতেন, নেক আমল অন্যের কাছে প্রকাশ হয়ে যাওয়া মানে অন্যের সামনে অনাবৃত/উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া। এ ব্যাপারে ইবন আল জাওযী রহঃ মন্তব্য করেন যে, ইবনে মুবারক রহঃ এমনই মুখলিস আলিম ছিলেন যে, তিনি আশংকা করতেন, কেউ যদি তার নেক আমল দেখে ফেলে বা তার আমলের প্রশংসা করে তবে এটা তার ইখলাস থেকে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আহমাদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ

বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারককে রহঃ তাঁর ইখলাস আর গোপন আমলের জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে সুউচ্চ মর্যাদায় পৌঁছেছিলেন।

✦ ইখলাস সংক্রান্ত ধারণা ✦

ইখলাস শব্দটি আরবি □□□□□ শব্দ হতে নির্গত। কোনো বস্তু নির্ভেজাল ও খাটি হওয়া এবং তার সাথে কোন কিছুর সংমিশ্রণ না থাকাকে ইখলাস বলে। যেমন, বলা হয়□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ অর্থাৎ, লোকটি তার দ্বীনকে কেবল আল্লাহর জন্যই খাস করল। লোকটি তার দ্বীনের বিষয়ে আল্লাহর সাথে কাউকে মিলায়-নি বা শরিক করে নি।

আল্লামা জুরজানী রহ. বলেন,"মানবাত্মার পরিচ্ছন্নতায় বিঘ্ন ঘটায় এ ধরনের যাবতীয় ময়লা-আবর্জনা থেকে অন্তর খালি করাকেই ইখলাস বলে। আর সেটার মূলকথা হচ্ছে, প্রতিটি বস্তুর ক্ষেত্রে এ কথা চিন্তা করা যায় যে, তার সাথে কোনো না কোনো বস্তুর সংমিশ্রণ থাকতে পারে, তবে যখন কোনো বস্তু অন্য কিছুর সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত হয়, তখন তাকে খালেস বা খাটি বস্তু বলা হয়। আর এ খাটি করার কাজটি সম্পাদন করার নাম হচ্ছে ইখলাস।"

হুযাইফা আল মুরআশী রহ. বলেন, "বান্দার ইবাদত প্রকাশ্য ও গোপনে উভয় অবস্থাতে একই পর্যায়ের হওয়ার নাম ইখলাস"।

আবার কেউ কেউ বলেন, ইখলাস হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে স্বীয় আমলের উপর সাক্ষ্য হিসেবে তালাশ না করা, আর বিনিময়দাতা হিসেবেও কেবল তাঁকেই গ্রহণ করা।

❝ ইখলাসের অর্থে সালাফে সালেহীনদের মত ❞

- যাবতীয় আমল একমাত্র আল্লাহর জন্য করা; যাতে গাইরুল্লাহ বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য সেখানে কোনো অংশ না থাকে।

- আমলকে সৃষ্টিকুলের সবার পর্যবেক্ষণ মুক্ত করে স্বচ্ছ করা (কেবল আল্লাহর পর্যবেক্ষণে রাখা)
- আমলকে যাবতীয় (শির্ক, রিয়া ইত্যাদির) মিশ্রণ থেকে স্বচ্ছ রাখা।

মুখলিসের সংজ্ঞা: মুখলিস সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর সাথে তার আত্মা খাটি ও সংশোধিত হওয়ায়, মানুষের অন্তর থেকে তার মান-মর্যাদা পুরোপুরি বের হওয়াতে কোনো প্রকার পরওয়া করে না। তার আমলের একটি কণা বা বিন্দু পরিমাণ বিষয়েও মানুষ অবগত হোক, তা সে পছন্দ করে না।

অনেক সময় দেখা যায়, মানুষের কথায় ও শরীয়তের ভাষায়, 'নিয়্যত' শব্দটি 'ইখলাস' এর স্থানে ব্যবহৃত হচ্ছে।তবে ফিকহবিদদের মতে নিয়্যতের মূল হচ্ছে, স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড থেকে ইবাদতকে পৃথক করা এবং এক ইবাদতকে অপর ইবাদত থেকে আলাদা করা।স্বাভাবিক কর্ম থেকে ইবাদতকে পৃথক করা, যেমন- পরিচ্ছন্নতার জন্য গোসল করা থেকে নাপাক হওয়ার কারণে গোসল করাকে আলাদা করা।এক ইবাদত থেকে অপর ইবাদতকে পৃথক করা। যেমন- যোহরের সালাতকে আছরের সালাত থেকে পৃথক করা।

উল্লেখিত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় যে, নিয়্যতের বিষয়টি আমাদের আলোচনার আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু যদি কেউ নিয়ত শব্দ বলে,আমল দ্বারা উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা বুঝায় এবং আমলটি মহান আল্লাহ- যার কোনো শরিক নাই- তার জন্য, নাকি আল্লাহ ও গাইরুল্লাহ উভয়ের জন্য? (তা নির্ধারণ করা বুঝায়) তাহলে এ ধরনের 'নিয়ত' 'ইখলাস' এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত। # গাইরুল্লাহ শব্দের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া অন্য আরো কারো ইবাদাত করা বা ইবাদাতের ক্ষেত্রে যাকে আল্লাহ্‌র সাথে শরিক করা হয় তাকেই গাইরুল্লাহ বলে। সুতরাং নিয়ত দ্বারা যদি গাইরুল্লাহর সাথে পার্থক্য করা বুঝায় তবে তা ইখলাস এর অন্তর্ভুক্ত।

✦ *ইখলাস বিহীন আমল মূল্যহীন* ✦

মুসলমান হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের ওপর স্রষ্টার হক রয়েছে। ফরজ-ওয়াজিব থেকে শুরু করে সাধারণ নফল কিংবা দু-এক টাকা দান-খয়রাতসহ সব কিছুই এ হক আদায়ের আওতাভুক্ত।

সামগ্রিক অর্থে এ সবগুলোকে আমরা ইবাদত বলে থাকি। প্রতিদিন আমরা বিভিন্ন রকমের ইবাদত করি, জীবন যাপনে মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার চেষ্টা করি। এ ইবাদত পালন কিংবা বিধি-বিধান মেনে চলার যেটুকু প্রচেষ্টা আমরা আমাদের সাধ্যমতো চালিয়ে যাচ্ছি, এর হিসাব-নিকাশ জমা হচ্ছে অপার্থিব আমলনামায়। কিন্তু এ জমা হওয়া কিসের ভিত্তিতে? সংখ্যাধিক্য নাকি গুণগত মান অথবা অন্যকিছু? ব্যস্ত জীবনে যেখানে ইবাদতের অবসর দিন দিন কমে আসছে, সেখানে কবুল হওয়া-না হওয়া নিয়ে ভাববার সময় ও সচেতনতাও হারিয়ে ফেলছি আমাদের অজান্তে। অথচ এ বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের, সবচেয়ে বেশি বিবেচনার এবং সচেতনতার দাবি রাখে।

কুরআন ও হাদিস থেকে প্রমাণিত সত্য হল- ইখলাস সব আমলের গ্রহণযোগ্যতার প্রথম শর্ত। ইখলাস বিহীন কোনো কিছুই আসমানি দরবারে কবুলযোগ্য নয়। বরং কখনো এমন আমল বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পার্থিব মোহ ও সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের যাবতীয় লোভ থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্য সমর্পিত আত্মার সামান্য আমলও ইখলাসের কারণে অনেক বেশি মূল্যবান। চারিদিকে সৌজন্যের ছড়াছড়ির এমন অস্থির সময়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি সাধারণ উদাসীনতা আমাদের সবার জন্য বড়ই বেমানান।

খুব সংক্ষেপে এটাই ইখলাসের প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে প্রচুর আয়াত ও হাদিস রয়েছে। পবিত্র কুরআনে সূরা বাইয়েনাতের ৫ নম্বর আয়াত, সূরা যুমারের ২ ও **১১** নং আয়াতসহ আরও নানা জায়গায় আল্লাহ পাক আমাদের ইখলাসের সঙ্গে একনিষ্ঠ হয়ে ইবাদতে মগ্ন হওয়ার জন্য আদেশ করেছেন। আর শিশুদের মক্তব থেকে শুরু করে বুখারি শরিফ

পর্যন্ত যে হাদিসটি আমরা অহরহ শুনছি- সেখানেও বলা হয়েছে, নিশ্চয়ই প্রতিটি আমল বা কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহ পাকের কাছে আমাদের যাবতীয় আমল গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে বাহ্যিক কোনো রঙ-ঢঙ কিংবা কোনো পার্থিব বিবেচনা যে উদ্দেশ্য নয়, তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ পাক তোমাদের শরীর এবং আকৃতির দিকে লক্ষ্য করেন না। বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি দৃষ্টি দেন। (বুখারি ও মুসলিম)

ইখলাসের সজ্ঞা দিতে গিয়ে হজরত আবু উসমান বলেছেন, নিজের প্রতি মহান আল্লাহর সার্বক্ষণিক দৃষ্টির কথা স্মরণ রেখে সৃষ্টজীবের সমুদয় কৃত্রিমতা ভুলে যাওয়ার নাম ইখলাস।

ইখলাসের ব্যাপারে আরও সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিখ্যাত বুযুর্গ ফুজাইল। তিনি বলেন, মানুষের কারণে আমল ছেড়ে দেওয়ার নাম- রিয়া, আর মানুষের জন্য আমল করার নাম-শিরক। কিন্তু এ দু'টো থেকে রেহাই পাওয়ার নামই হচ্ছে- ইখলাস।

বুযুর্গরা বলেন, অনেক ছোট কাজ নিয়তের কারণে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে অতিশয় মূল্যবান ও দামি হয়ে যায়। আবার অনেক বড় কাজ নিয়তের ক্রুটির কারণে তুচ্ছ হয়ে যায়। হজরত বিশর হাফি বলতেন, মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য যে আমল করে, সে সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে ভয় করে না।

প্রখ্যাত বুযুর্গ মারুফ কারখি নিজেকে আঘাত করে সজাগ করতেন এবং বলতেন, ইখলাস এর ব্যাপারে সতর্ক থাকো, মুক্তি মিলবে হয়তো।

হজরত ইয়াকুব আল মাকফুফ বলেছেন, একজন মুখলিস আমলদার মুমিন তার নেক কাজগুলো এমনভাবে গোপন রাখে যেভাবে সে তার কৃত পাপ কাজসমূহ লুকিয়ে রাখে।

বিশিষ্ট সাহাবি হজরত তামীম দারিকে কেউ জিজ্ঞেস করলো, আপনি প্রতি রাতে কতো রাকাত নামাজ আদায় করেন? এমন প্রশ্ন শুনে তিনি খুব রেগে গেলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম, রাতের অন্ধকারে গোপনে এক রাকাত নামাজ পড়া আমার

কাছে; এমন সারারাত নামাজের চেয়ে অনেক উত্তম- যা রাত পোহালে মানুষকে জানানো হয়।

নিজের ছোট-বড় নেক আমল মানুষের কাছে প্রচার না করে গোপন রাখার তাগিদ দিয়ে সাহাবি হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, পৃথিবী বাসীর কাছে নিজেদের পূণ্য কর্মগুলো গোপন রাখো, এখানে পরিচিত ও সমাদৃত না হয়ে তোমরা আকাশজগতে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখো।

হজরত মুহাম্মদ বিন ওয়াসে তার শিষ্যদের বলতেন, গোনাহ ও পাপের যদি কোনো দুর্গন্ধ থাকতো, তবে আমার কৃত পাপাচারের দুর্গন্ধে তোমরা কেউ আমার কাছেই আসতে পারতে না।

আমাদের পূর্বসুরি আল্লাহওয়ালারা এভাবেই নিজেদের সাধনা ও ইবাদতকে লোকসমাজ থেকে লুকিয়ে রাখতেন। যা কিছু ভালো ও পূণ্য তারা করতেন; তা কেবল আল্লাহ পাকের জন্যই করতেন। সমাজ ও মানুষের সব প্রশংসা ও বাহবা থেকে মোহমুক্ত হয়ে তারা নিমগ্ন হতেন ইখলাস যুক্ত জিকির-ইবাদতে।

আমলের মূলপ্রাণ ইখলাস। যে আমলে ইখলাস নেই সে আমল প্রাণহীন শরীরের মত। প্রাণহীন শরীর যেমন ওই ব্যক্তির কোনো কাজে আসে না; কেউ তাকে আক্রমণ করলে প্রতিহত করে পারে না—ইখলাসবিহীন আমলও তেমন। পরকালে সে আমল কোনো কাজে আসবে না।

একজন মানুষ গভীর রাতে পুরো পৃথিবীতে পিনপতন নীরবতা নেমে আসার পর জায়নামাজে দাঁড়িয়েছে, অনেক রাকআত তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ছে; কিন্তু তার অন্তরে যদি এ কথা উদয় হয় যে, আমি আসলেই কত বড় আল্লাহওয়ালা—গভীররাতে সবাই ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যাওয়ার পর আমি নামাজ পড়ছি! সে নামাজের কোনো মূল্য নেই আল্লাহর কাছে! আরেকজন জনসমক্ষে শুধুমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নামাজে দাঁড়িয়ে গেল, দুনিয়ার সকলে তার নামাজ দেখলেও তার নামাজ আল্লাহর কাছে কবুল হবে।

কুরআন-হাদিসের জায়গায় জায়গায় ইখলাসের কথা এসেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমার আমলকে ইখলাসপূর্ণ তথা খাঁটি করো। অল্প আমলই পরকালে তোমার মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে।'

সব কিছু ছেড়ে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার নাম ই কি তাওয়াককুল ইলাল্লাহ !

যেদিন নবিজী সাঃ আবু বাকার রাঃকে সাথে নিয়ে মক্কা ত্যাগ করেন, যে ঊষালগ্নে, সেদিন তাঁরা দুজনে একটা গুহার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পেছন থেকে শত্রু যখন একেবারে নাকের ডগায় চলে এলো, একেবারে গুহার মুখে, তখন ক্ষণিকের জন্য ভয় পেয়ে যান আবু বকর রাঃ। তিনি বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ সঃ! এই বুঝি তারা আমাদের দেখে ফেললো'। তখন নবিজী সাঃ প্রতিউত্তরে যা বলেছিলেন, তা কুরআনে স্থান পেয়ে গেছে। তিনি বলেছিলেন, 'হতাশ হয়োনা। নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন'।

নবিজী সঃ'র ওপর ঘনিয়ে এসেছিলো এক ঘোরতর বিপদ। মক্কার মুশরিকেরা তাঁকে হত্যা করার পাঁয়তারা করছিলো। তখন, আল্লাহর নির্দেশে নবিজী সঃ এই বিপদ এড়াতে মক্কা ছেড়ে মদীনা অভিমুখে রওনা করেন। দেখুন, বিপদ থেকে বাঁচার জন্য নবিজী সাঃ এর কি কোন তাওয়াক্কুল অর্থাৎ ভরসা ছিলোনা? তিঁনি কি ভেবেছেন, 'আরে! আল্লাহ বাঁচালে আমাকে মক্কাতেই বাঁচাবেন। মারলে মক্কাতেই মারবেন। আমি মক্কা ছাড়বো কেনো?'আর, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া'তায়ালাও কি তাঁকে দিয়ে এমনটা করিয়েছেন? না। তিঁনি বরং নবিজী সঃ'কে মক্কা ছেড়ে চলে যেতে বললেন। নবিজী সঃ'র তো তাকওয়ার কোন ঘাটতি ছিলোনা। তাওয়াক্কুলের/ ভরসার কোন কমতি ছিলোনা। এমন ধারণা করাই পাপ হবে। তাহলে কেনো তাঁকে সেদিন মক্কা ছাড়তে হলো? অবশ্যই সতর্কতার অংশ হিশেবে। শত্রুর চোখ এড়াতে কেনো তাঁকে গুহার মধ্যে আশ্রয় নিতে হলো? আল্লাহ তো চাইলে তাঁকে এমনিই বাঁচিয়ে দিতে পারতেন। এটাও সতর্কতা। আর, এই সতর্কতা কখনোই তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয়।

মুসা আঃ এর কথাই ধরুন। পেছনে ফেরাউনের বিশাল সৈন্যবহর, আর সামনে কূল-কিনারাহীন লোহিত সাগর। এমতাবস্থায় ঘাবড়ে গেলো মূসা আঃ এর সঙ্গীরা। ভাবলো, 'এই বুঝি তারা আমাদের ধরে ফেললো'। তখন মুসা আঃ শোনালেন অভয় বাণী।

বললেন, 'আল্লাহ সাথে আছেন' ।এমন মুহূর্তে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া'তায়ালা মুসা আঃকে কি করতে বললেন? তিঁনি মুসা আলাইহিস সালামকে বললেন তার লাঠি দিয়ে পানিতে আঘাত করতে। মুসা আঃ তা-ই করলেন, আর সাথে সাথে সমুদ্র দুভাগ হয়ে, তাতে তৈরি হয়ে গেলো একটি শুষ্ক রাস্তা। আচ্ছা, কেনোই বা মুসা আঃকে লাঠি দিয়ে পানিতে আঘাত করতে হলো? আল্লাহ কি চাইলে এমনিতেই রাস্তা তৈরি করে দিতে পারেন না? কিন্তু না, আল্লাহ চান বান্দা যেন তার চেষ্টাটুকু করে। বাকিটা আল্লাহর হাতে।

নূহ আঃএর কথা স্মরণ করুন। যখন তাঁর জাতি একেবারে অবাধ্য, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলো, যখন তাদের ওপর আল্লাহর আযাব অত্যাসন্ন হয়ে আসলো, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া'তায়ালা নূহ আঃকে বললেন একটা নৌকা তৈরি করে নিতে। তাঁর জাতির ওপরে যে ভয়ঙ্কর বন্যা আপতিত হবে, তা থেকে বাঁচার জন্যে তারা যেন সেই নৌকায় উঠে পড়ে।খেয়াল করুন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া'তায়ালা কি চাইলে নূহ আঃকে নৌকা বানানো ব্যতীতই সেই বন্যার হাত থেকে বাঁচাতে পারতেন না? অবশ্যই পারতেন। কিন্তু, তিনি কেনো তাহলে নুহ আঃকে নৌকা তৈরির আদেশ করেছিলেন? ওই যে, আল্লাহ চান বান্দা যেন তার নিজের চেষ্টাটুকু করে। সে যদি আন্তরিক হয়ে নিজের কাজটুকু করে ফেলে, সেটাকে সম্পূর্ণতা আল্লাহ দিয়ে দেন।

মারঈয়াম আঃ এর কথা স্মরণ করা যায় এখানে। ঈসা আঃকে গর্ভে ধারণ করার পরে যখন তার প্রসববেদনা শুরু হয়, সেদিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া'তায়ালা তাঁকে একটা খেঁজুর গাছের ডাল ধরে নাড়া দিতে বলেছিলো। ডাল ধরে নাড়া দিলে খেঁজুর ঝরে পড়বে এবং ওই খেঁজুর তিনি খেতে পারবেন।দেখুন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া'তায়ালা হুকুম করলে গাছ থেকে খেঁজুর কি এমনিই ঝরে পড়তো না মারঈইয়াম আঃ এর জন্য? অবশ্যই পড়তো। কিন্তু তিঁনি তা না করে, মারঈয়াম আঃকে ওই অবস্থায়, যখন

তিঁনি প্রসববেদনায় কাতর, তখন বললেন গাছের ডাল ধরে নাড়া দিতে। কেনো বলেছিলেন? আগেই বলেছি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া'তায়ালা চান বান্দা যেন তার নিজের দায়িত্বটুকু, নিজের চেষ্টাটুকু করে, আর বাকিটা আল্লাহর ওপর সোপর্দ করে দেয়।

আজকে, আমাদের সামনে এসেছে এক ভয়াবহ দুঃসময়। আমরা অবলোকন করছি একটি ভয়ঙ্কর মহামারী কাল। এই দুঃসময় কাটাতে হলে, আমাদের অবশ্যই অবশ্যই আমাদের দায়িত্বটুকু পালন করতে হবে। আমরা যদি আমাদের দায়িত্বটুকু পালন করি, আশা করা যায়, ইন শা আল্লাহ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া'তায়ালা এই বিপদ থেকে উত্তরণের পথ আমাদের জন্য সহজ করে দেবেন।

''এতো সতর্ক হয়ে কি হবে? আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে দেবেন। আর মরণ থাকলে তো মরতে হবেই''- এই জাতীয় কথাবার্তা যারা বলছেন, তাদের প্রতি অনুরোধ নবিজী সাঃ এর ঘটনাটা আরেকবার পড়ার জন্যে। তাঁকে হত্যার চক্রান্ত হচ্ছে জানতে পেরে তিঁনি মক্কা ত্যাগ করেছেন। শত্রুর চোখ এড়াতে তিঁনি গুহার ভিতরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বিপদের মুখে তিঁনি, 'আরে, আল্লাহ বাঁচিয়ে দেবে' বলে গা ছাড়া ভাব দেখাননি। বরং, বিপদ এড়াতে নিজের যেটুক করা দরকার, তার সবটুকু করেছেন। সাথে রেখেছেন আল্লাহর ওপর অগাধ তাওয়াক্কুল বা ভরসা। এটাই তো নববী পদ্ধতি। তাহলে, আমরা কিভাবে এতো উদাসীন হচ্ছি? এতো অসতর্ক থাকছি? ভাবুন তো, এটা কি সত্যিই তাওয়াক্কুলের অংশ কিনা? ঈমানের জজবা কিনা?

মুসা আঃ নিজের চেষ্টা করেননি? নূহ আঃ নিজের চেষ্টা করেননি? মারঈয়াম আঃ প্রসববেদনা নিয়ে নিজের চেষ্টা বাদ রেখেছিলেন? না। তাহলে, কোন ঈমানের বলে, কোন তাওয়াক্কুলের বলে আমরা এমন গা ছাড়া ভাব দেখাচ্ছি আর বলছি- 'আরে, আমার কিচ্ছু হবেনা?'

নবিজীসঃ'র একটা হাদিস থেকে আমরা জেনেছি, মহামারীতে কোন ঈমানদার ব্যক্তি মারা গেলে তিনি শহিদের মর্যাদা পাবেন। নিঃসন্দেহে খুব ভালো মর্যাদা। কিন্তু, এই

হাদিস টেনে যারা বলছেন, ‘‘আরে, মরলে তো শহিদ হবো। তাহলে এতো ভয় কিসের? শহিদ হওয়ার সাধ নেই মনে?’’

সত্যি? মহামারীতে মরলে শহিদ হবেন- এজন্যে আপনি মহামারীকে পাত্তা দিতে চাইছেন না? শহিদ হওয়ার জন্যে? তাহলে, নবিজী সাঃ যে বলেছেন, মহামারী আক্রান্ত এলাকায় বাইরে থেকে যেন কেউ না ঢুকে, ভিতরের কেউ যেন বাইরে না যায়’- এই হাদিসটাকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? শহিদ হওয়া এতো সহজ হলে তো তিনি উৎসাহ দিতেন বেশি করে মহামারী এলাকায় ঢুকার জন্যে। আর, সেদিন যে ওমর রাঃ এতোগুলো সাহাবিদের নিয়ে মহামারী আক্রান্ত এলাকায় না ঢুকে চলে এসেছিলেন, তাহলে তারা কি শহিদ হয়ে যাওয়ার সুযোগটা হারিয়েছেন? লুফে নেননি? আসলে, আপনি কি শহিদ হতে চাচ্ছেন না আত্মহত্যা করতে চাচ্ছেন, তা আরেকবার ভেবে দেখবেন কি?

হাদিস থেকে জানা যায়, আগুনে পুড়ে মরলেও শহিদ, আর পানিতে ডুবে মরলেও শহিদ। এমনকি, পেটের রোগে অসুস্থ হয়ে মারা গেলেও শহিদের মর্যাদা পাওয়া যাবে। তো, ভাইজানেরা, আপনার বাসায় আগুন লাগলে শহিদ হওয়ার জন্য আপনি কি বাসার মধ্যে বসে থাকবেন? আপনার লঞ্চ ডুবতে থাকলে আপনি কি সাঁতরাবেন না? নিজ থেকেই পানিতে গা এলিয়ে দেবেন? কিংবা, পেটের অসুখে ধরলে ডাক্তারের কাছেও যাবেন না?

লেখাঃ আরিফ আজাদ

অপেক্ষামান দূর্বিসহ বিচার দিবস এবং বিচার প্রদানে আল্লাহ ই যথেষ্ট !

একটা সময় ধারনা ছিল মুমিন যেহেতু একদিন না একদিন জান্নাতে যাবে, তো আমিওত জান্নাতে যাবই! কিভাবে এই চিন্তা করা সম্ভব? এমন না যে মৃত্যুর পরপরই জাহান্নাম আর তারপর কিছুদিন আজাব ভোগ করে এসে জান্নাত। কক্ষনও না! এমন নয়! ধরুন কেউ যদি জাহান্নামে কিছুক্ষন থেকে আল্লাহর দয়ায় জান্নাতে ফিরেও আসে তবুও তো

তাঁকে এমন কয়েকটি ধাপ পেরোতে হবে যার একটি অন্যটি থেকে ভয়ংকর। প্রথমেই মৃত্যু, যার ভয়াবহতাই জাহান্নমীদের জন্য যথেষ্ঠ।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, “যিনি ছাড়া কোন রব নেই সেই আল্লাহর কসম, যদি আমার কাছে দুনিয়ার সকল স্বর্ণ এবং রৌপ্য থাকতো, আমি সেগুলোর বিনিময়ে হলেও মৃত্যুর পরে যে ভয়াবহতা রয়েছে তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করতাম।” [সাহীহ আত-তাওতিক ফি সীরাত ওয়া হায়াত আল-ফারুক, পৃ ৩৮৩]

যারা পাপাচারী ব্যাক্তি এবং অবিশ্বাসী, সে যখন দুনিয়ার জীবন ত্যাগ করে আখিরাতের দিকে যেতে থাকবে, তখন মৃত্যুর অন্ধকার ফেরেশতা খসখসে কফিন নিয়ে আগমন করবে যেটা আমদানি হয়েছে জাহান্নাম থেকে। তার পাশে এসে বসে মৃত্যুর ফেরেশতা বলবেন, “হে পাপী আত্মা! আল্লাহ সুবহানু ওয়া তাআলার ক্রোধ এবং রোষের দিকে ছুটে আস।” তাকে বলা হবে যে, যে তোমাকে এখনই আসতে হবে এবং তোমার জন্য আল্লাহর ক্রোধ অপেক্ষা করছে। যখন মৃত্যুর ফেরেশতা এই ঘোষণা করবে, তখন তার আত্মা দেহের মধ্যে ছুটে বেড়াবে আর সে বের হয়ে আসতে চাইবে না। মৃত্যুর ফেরেশতারা তখন তার আত্মাকে খপ করে ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাবে,ভেজা পশমের মধ্য থেকে কাটাঁযুক্ত কিছুকে টেনে আনতে যেমন অবস্থা হয় তেমন। [আর-রুহ, ইমাম ইবনুল কায়্যুম]

মৃত্যুর ভয়াবহতা শেষ না হতেই কবরের নিঃসঙ্গতা ও ভয়ানক দুর্দশাগ্রস্থ জীবন। আপনার সাথে কেউ নাই, একা। কী দিন, কী রাত! সেখানে কেবল যন্ত্রনা আর যন্ত্রনা।

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন- ‘আমি কবরের দৃশ্য থেকে অধিক ভয়ানক দৃশ্য কখনো দেখিনি। [তিরমিযী/২৩০৮ (হাসান)]

যখন তাকে কবরস্থ করা হয় তখন কবর তাকে বলে, তোমার আগমন খারাপ আগমন। আর জেনে রাখ, তুমি খারাপ জায়গায়ই এসেছো, আমার উপর চলাফেরাকারীদের মধ্যে তুমিই আমার সবচেয়ে বড় দুশমন ছিলে। আজ তোমাকে আমার কাছে অর্পণ করা হয়েছে, তুমি আমার আয়ত্তে এসে গেছ, এখন তোমার সাথে আমি কিরূপ ব্যবহার করি

দেখে নাও। তারপর কবর তাকে এমনভাবে চাপ দেয় যে, তার ডান পাশের হাড় বাম পাশের হাড়ের ভিতর ঢুকে যায়। আল্লাহ তাআলা তার জন্য সত্তরটি এমন অজগর সাপ নিযুক্ত করে দেন, যার একটিও যদি জমিনের বুকে শ্বাস ফেলে তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত জমিনে কোন কিছু উৎপন্ন হবে না। হিসাবের জন্য তাকে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সাপগুলো তাকে কামড়াতে ও দংশন করতে থাকবে।' [তিরমিযী/২৪৬০ (যয়ীফ)]

এই দীর্ঘ্য যন্ত্রনাময় জীবন শেষ হবে শিংগার বিকট শব্দে। রূহসমূহ মৌমাছির মতো বের হয়ে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করে দেবে। অতঃপর রুহসমূহ দেহে প্রবেশ করবে। কিয়ামত!

মহান আল্লাহ বলেন,

শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যাদের রক্ষা করতে ইচ্ছে করেন তারা নয়। অতঃপর আবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দন্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে। [৩৯:৬৮]

অতঃপর হিসাবের জন্য হাশরের মাঠে অপমান আর লাঞ্চনার অপেক্ষা। "ইয়াওমুদ্দিন" অপরাধীদের দাড়ানোর কোন জায়গা থাকবে না, উপুর মুখে...আপনি চিন্তা করতে পারেন!

"আর আমি কিয়ামতের দিনে তাদেরকে একত্র করব উপুড় করে, অন্ধ, মূক ও বধির অবস্থায়। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম; যখনই তা নিস্তেজ হবে তখনই আমি তাদের জন্য আগুন বাড়িয়ে দেব" [১৭:৯৭]

এই ভীতিকর ও ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পাপাচারী, জালেম, মুনাফিকদের দেখা যাবে অবনত মস্তকে, অপলক ক্ষেত্রে। আর তাদের অন্তর থাকবে শূন্য। সেদিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না। সেদিন মানুষের হৃদয় থাকবে ওষ্ঠাগত, বিষন্ন।কিয়ামতের সে দিনটির দৈর্ঘ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর।

মহান আল্লাহ বলেন,

“হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা দেখবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্য দানকারিণী আপন দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভধারিণী তার গর্ভপাত করে ফেলবে, তুমি দেখবে মানুষকে মাতালসদৃশ, অথচ তারা মাতাল নয়। তবে আল্লাহর আযাবই কঠিন। [২২:১-২]

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন: ‘কিয়ামতের দিন মানুষ ঘামতে থাকবে। এমনকি তাদের ঘাম যমীনের সত্তর গজ নীচ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আর তা তাদেরকে বাকরুদ্ধ করে দেবে এবং তাদের কান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে [বুখারী/৬৫৩২]

অতঃপর মহান আল্লাহ ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করবেন। ছোট বড় কিছুই সেদিন বাদ যাবে না, মহান আল্লাহ বলেন,

“আমি কেয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদন্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট।” [২১:৪৭]

রসুলুল্লাহ (সা:) বলেন, তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তাআলা সরাসরি কথা বলবেন, মাঝখানে কোনো দোভাষী থাকবে না। তখন সে তার ডান দিকে তাকাবে এবং সেখানে সে তার কৃত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। সে বাম দিকে তাকাবে, সেখানেও সে তার কৃত আমল ছাড়া অন্যকিছু দেখবে না। সে তার সামনের দিকে তাকাবে এবং আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। সুতরাং আগুন থেকে বাচোঁ যদিও শুকনো খেজুরের এক টুকরো অথবা একটি ভালো কথা ব্যয় করে হলেও’ [মুসলিম/১০১৬]

সেখানে মানুষের আমলনামা প্রকাশ করা হবে লিখিত আকারে, আড় চোখের দৃষ্টিও যে সেদিন ফিরে আসবে মহা দুঃসংবাদ হয়ে..

আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে; তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবেঃ “হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা। এ যে ছোট

বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি-সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করবেন না।" [১৮:৪৯]

হিসাবের পর আপনাকে মুখোমুখি করা হবে পুলসিরাতের পুলসিরাতের উপর দিয়ে সকলকেই অতিক্রম করতে হবে। নেককার বিদ্যুৎ, বাতাস ও দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে তা পার হয়ে যাবে। কেউ পার হবে সম্পূর্ণ নিরাপদভাবে। কেউ সামান্য আঁচড় খেয়ে। কেউ আহত হয়ে। আর কেউ হুমরী খেয়ে পড়ে যাবে জাহান্নামে। এমনকি সর্বশেষ ব্যক্তিকে টেনে টেনে নেয়া হবে।

যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে, 'হায়, আমাকে যদি আমার আমলনামা দেয়া না হত'! 'আর যদি আমি না জানতাম আমার হিসাব'! 'হায়, মৃত্যুই যদি আমার চূড়ান্ত ফয়সালা হত'! 'আমার সম্পদ আমার কোন কাজেই আসল না!' আমার ক্ষমতাও আমার থেকে চলে গেল! (বলা হবে) 'তাকে ধর অতঃপর তাকে বেড়ি পরিয়ে দাও।' 'তারপর তাকে তোমরা নিক্ষেপ কর জাহান্নামে'। [৬৯:১৯-৩১]

এখনও কি জাহান্নামের ঝুকি নিব? কক্ষনো নয়! আল্লাহ্ আমাদের সকল প্রকার সীমালঙ্ঘন থেকে হেফাজত করুক।

লেখাঃ আল্লাহ্র কোন এক বান্দা-

দোয়া কবুলের মুহূর্তগুলো | দোয়া কবুলের উত্তম সময়

■■ রাতেরশেষ তৃতীয়াংশঃ

এই সময় দোয়া কবুল হবার ব্যাপারে সহীহ হাদীসে অত্যন্ত জোরালো রেফারেন্স আছে। এটা প্রতিটি রাতের জন্যই প্রযোজ্য, শুধুমাত্র শবে বরাত, শবে মিরাজ বা কদর রাতে নয়।

আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, "প্রত্যেকদিন রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আমাদের রব (আল্লাহ) সবচেয়ে নীচের আকাশে নেমে আসেন এবং বলেন, 'কে আমাকে ডাকছো, আমি তোমার ডাকে সাড়া দেবো। কে আমার কাছে চাইছো,

আমি তাকে তা দেবো। কে আছো আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনাকারী, যে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো?" (সহীহ বুখারী)

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, "আল্লাহর কাছে তাঁর একজন উপাস্য সবচেয়ে নিকটতম যে সময়টাতে আসতে পারে তা হলো রাতের শেষ তৃতীয়াংশ। সুতরাং তোমরা যদি পারো তাহলে তোমরা তাদের একজন হও যারা সে সময় আল্লাহর স্মরণ করে"। (তিরমিজি, নাসায়ী, আল হাকিম-সহীহ)

■■ *শেষ রাতের যে কোন একটি সময়ঃ*

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, "রাতে এমন একটি সময় আছে যে সময়টাতে কোন মুসলিমের এমনটা হয়না যে সে এই পৃথিবী কিংবা পরকালের জীবনের জন্য আল্লাহর কাছে কিছু চাইলো আর তাকে তা দেয়া হলো না। আর এটা প্রতিটি রাতেই ঘটে"। (মুসলিম-৭৫৭)

■■ আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তি সময়ঃ

মক্কা কিংবা মদীনার নামাজের জামায়াত শুরু হবার মাঝখানে অনেক মুসলিমকে দেখা যায় নামাজ শুরুর আগে হাত তুলে দোয়া করতে। এ সময়টা দোয়া কবুল হবার গুরুত্বপূর্ণ সময়।

আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, "আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তি সময়ের দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয়না"। (আবু দাউদ-৫২১, তিরমিজি-২১২)

■■ জুম্মার দিন যে কোন একটি সময়েঃ

জুম্মার দিনে এমন অসাধারণ একটি নিয়ামাতের সময় আছে যে সময়টাতে দোয়া কবুল হবার বিশুদ্ধ বর্ণনা রাসুল সাঃ থেকে এসেছে।

আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসুলুল্লাহ সাঃ আমাদের একদিন শুক্রবার নিয়ে আলোচনা করলেন এবং বললেন, 'জুম্মার দিনে একটি সময় আছে যে সময়টা কোন মুসলিম সালাত আদায়রত অবস্থায় পায় এবং আল্লাহর কাছে

কিছু চায়, আল্লাহ অবশ্যই তার সে চাহিদা মেটাবেন', এবং তিনি (রাসুল সাঃ) তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করে সে সময়টা সংক্ষিপ্ততার ইঙ্গিত দেন"। (সহীহ বুখারী)।

কোন কোন স্কলার সে সময়টার ব্যপারে বলেছেন, তা হলো-ইমাম যখন মসজিদে প্রবেশ করেন সে সময় থেকে সালাত শেষ হবার সময় পর্যন্ত, কেউ বলেছেন দুই খুতবার মাঝখানে, কেউ আবার জোর দিয়ে বলেছেন তা হলো আসর থেকে মাঘরিব পর্যন্ত সময়টা। আল্লাহই ভাল জানেন।

■■ *জমজমের পানি পান করার সময়ঃ*

জাবির রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, "জমজম পানি হলো তার জন্য, যার জন্য এটি পান করা হয়"। (ইবন মাজাহ ৩০৬২, আহমাদ ৩/৩৫৭)।

অর্থাৎ, জমজমের পানি খাবার সময় আল্লাহর কাছে যা চাওয়া হয়, তা পাবার সম্ভাবনা আছে।

■■ *সিজদাহর সময়েঃ*

আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, "যে সময়টাতে বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটতম অবস্থায় থাকে তা হলো সিজদাহর সময়। সুতরাং তোমরা সে সময় আল্লাহর কাছে বেশী বেশী চাও"। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ)

■■ *রাতের বেলা ঘুম থেকে জেগে উঠলেঃ*

উবাদা ইবনুস সামিত রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, "যে কেউ রাতের বেলা ঘুম থেকে জাগে আর বলে-'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হা'মদু ওয়াহুয়া আ'লা কিল্লি শায়্যিন কা'দির, আলহামদুলিল্লাহি ওয়া সুবহানাল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' এবং এরপর বলে 'আল্লাহুম মাগফিরলি (আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন) এবং আল্লাহর কাছে চায়, তাহলে তার ডাকে সাড়া দেয়া হবে এবং সে যদি অজু করে সালাত আদায় করা, তাহলে তার সালাত কবুল করা হবে"। (সহীহ বুখারী)

■■ ফরজ সালাতের পরের সময়টাতেঃ

আবু উমামাহ রাঃ বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাঃ কে জুজ্ঞেস করা হলো, "ইয়া রাসুলুল্লাহ, কোন সময়ের ডাক শোনা হয়?" তিনি বললেন, "রাতের শেষ সময়ে এবং ফরজ সালাতের পরে"। (তিরমিজি)।

অনেক স্কলারগন বলেছেন, এ সময়টা হলো সালাম ফেরানোর আগের সময় (আত্তাহিয়াতুর পর)।

■■ কদরের রাতেঃ

নিঃসন্দেহে লাইলাতুল কদর হলো একটি বছরে কোন মানব সন্তানের পাওয়া শ্রেষ্ঠ রাত। আল্লাহ বলেছেন,

"আমরা এটিকে (আল-কুরআন) কদরের রাত্রিতে অবতীর্ণ করেছি।তুমি কি জানো কদরের রাত্রি কি?কদরের রাত্রি হাজার মাসের চেয়েও অধিক উত্তম"।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত একাধিক বিশুদ্ধ হাদীসে এ রাতের সকল ইবাদত ও আল্লাহর কাছে চাহিদা পূরণের কথা বলা হয়েছে।

■■ বৃষ্টি হবার সময়ঃ

সাহল ইবন সা'দ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, "দুই সময়ের দোয়া ফেরানো হয়না। আযানের সময়ের দোয়া আর বৃষ্টি পড়ার সময়কার দোয়া"। (আবু দাউদ ২৫৪০)

■■মজলুম ও নির্যাতিত ব্যক্তিঃ

মজলুমের দোয়া এবং বদ দোয়া দুটোই আল্লাহর কাছে কবুল হবার সম্ভাবনা শতভাগ। রাসুলুল্লাহ সাঃ মুয়াজকে বলেছেন, "মজলুমের দোয়া থেকে সবসময় সতর্ক থেকো, কেননা মজলুমের দোয়া ও আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা বা আশ্রয় থাকে না"। (সহীহ বুখারী)

■■ মুসাফিরের দোয়াঃ

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, "তিনটি দোয়া (আল্লাহর দ্বারা) ফিরিয়ে দেয়া হয়না। সন্তানের জন্য পিতামাতার দোয়া, রোজাদার ব্যক্তির দোয়া, মুসাফিরের দোয়া"। (বায়হাকি, তিরমিজি)

■■ রোজাদার ব্যক্তির দোয়াঃ

সমস্ত রমজান মাসই হলো আল্লাহর কাছে চাইবার শ্রেষ্ঠ সময়। রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, "রমজান মাসে করুণার দরজা খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়"। (সহীহ বুখারী ১৮৯৯)

■■ আরাফাতের দিনের দোয়াঃ

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, "দোয়ার ভেতর শ্রেষ্ঠ হলো আরাফাতের দিনের দোয়া"। (তিরমিজি, মুয়াত্তা মালিক)

■■ জিহাদের মাঠে শত্রুর মুখোমুখি হলেঃ

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, "দুটি দোয়া কক্ষনো ফিরিয়ে দেয়া হয়না অথবা খুবই কম ফিরিয়ে দেয়া হয়। আযানের সময়কার দোয়া আর সেই ভয়ংকর সময়কার দোয়া যখন দু'টি বাহিনী পরস্পর মুখোমুখি হয়"। (আবু দাউদ ২৫৪০, ইবন মাজাহ)

■■ জিলহজ্জ্ব মাসের প্রথম দশ দিনঃ

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, "জিলহজ্জ্ব মাসের প্রথম দশদিন ছাড়া আর এমন কোন দিন নেই, যে সময়ের সৎকাজ আল্লাহর কাছে তার চেয়ে বেশী প্রিয়"। (সহীহ বুখারী ৯৬৯)

■■রোজদার ব্যক্তির ইফতারের সময়কার দোয়াঃ

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, "তিন ব্যক্তির দোয়া কখনও আল্লাহর দ্বারা ফিরিয়ে দেয়া হয়না। যখন রোজাদার ব্যক্তি ইফতার করে (অন্য বর্ণনায় এসেছে, রোজাদার ব্যক্তি যতক্ষণ ইফতার না করে), ন্যায়পরায়ণ শাসক, নির্যাতিত ব্যক্তির দোয়া"। (আহমাদ, তিরমিজি)

সূরা ফাতিহা এবং কিছু উপলব্ধি | ৪র্থ আয়াতের অন্তর্নিহিত জ্ঞান

শুধু তোমারই ইবাদত করি...ফাতিহা, আয়াত : ৪

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলা ১০৪ টি আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন। সেই সবগুলো কিতাবের সারাংশ হলো কুরআন, আর সম্পূর্ণ কুরআনের সারসংক্ষেপ সূরাহ ফাতিহা। আর সম্পূর্ণ সূরাহ ফাতিহা এর সারাংশ হলো এই আয়াত,

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।" (সূরাহ ফাতিহা, আয়াত : ৪)

আল্লাহর রহমত ও সর্বময় পরম ক্ষমতার বিষয়ে জানার পর, এবং তারই কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে সেকথা উপলব্ধি করার পর, এই আয়াতটি আমাদের জানিয়ে দেয় এই পৃথিবীতে আমাদের কি করণীয়, আমাদেরকে কোন উদ্দেশ্যে এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে, সেটা হলো – কেবল আল্লাহর ইবাদত করা আর এই ইবাদাহর কাজেও তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করা।

ইবাদাহ শব্দটি আরবী 'আব্দ' শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ দাস, গোলাম। দাস বলতে আমরা পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদীদের নির্যাতনের দৃশ্য মনে করি। এটা জুলুমবাজিদের কারণে খারাপ মনে হয়। কিন্তু আল্লাহর দাস হওয়াটাই বরং সৌভাগ্যের বিষয়। দুনিয়ার প্রচলিত দাস আর আল্লাহর দাসের মাঝে বিস্তর ফারাক রয়েছে। আল্লাহর দাস হলে সে আল্লাহকে ছাড়তে চায় না, বরং এই প্রভু-দাসের ভালোবাসা এতটাই মধুময় যে দাস আরো প্রভূর নিকটে এসে চিরন্তন আত্মিক প্রশান্তি পায়, আত্মার খোরাক পায়।

প্রশ্ন আসে, ইবাদাত ও দাসত্বের মাঝে সম্পর্ক কি? উত্তর হলো, বান্দার দাসত্বের বহিঃপ্রকাশ হলো ইবাদাহ। বান্দার ইবাদাহ-ই হলো দাসত্বের প্রমাণ। একজন ব্যক্তির নিষ্ঠা ও অন্তরের ঐকান্তিকতা প্রমাণ করে তার দাসত্ব। ইবাদাহ না করলে তাঁর বান্দাহ হওয়া যায় না।

এখানে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার, সেটা হলো ইবাদাহ কারা করে? আমরা। আমরা তো বহুবচন এবং আরবীতে বহুবচনই আছে। কিন্তু বেশিরভাগ ফরজ নামাজ ব্যতীত আমরা তো একাই নামাজ পড়ি, তবে কেন সূরা ফাতিহায় বহুবচন? আলেমরা বলেছেন, ঐক্যের গুরুত্বের দিক! আল্লাহ ঐক্যের প্রতি এতটাই গুরুত্ব দিয়েছেন যে সর্বাপেক্ষা সেরা সূরা, পুরো কুরআনের মূল সূরা, পুরো ইসলাম যেই সূরায় বর্ণিত হয়েছে, সেই সূরায় আল্লাহ তায়ালা ঐক্যের গুরুত্বের কথা তুলে এনেছেন তাঁর ইবাদাহতে।

এমনকি একা নামাজ পড়লেও সবার জন্য দু'আ করি যে আমরা তোমারই ইবাদাহ করি সকলেই। সকলেই তোমার সাহায্য কামনা করি। অর্থগতভাগে বহুবচন তো রয়েছেই, আবার শব্দগতভাবেও তাকিদ বা গুরুত্ব রয়েছে।

তাহলে আমরা ঐক্য কীভাবে বজায় রাখতে পারি? সেটাই আল্লাহ বলছেন, ইবাদাহর মাধ্যমে। একারণেই যেসব পরিবারের লোকেরা একত্রে ইবাদাহ করে তারা একত্র থাকে, মিলেমিশে থাকে, শান্তিতে অবস্থান করে। যেসব সমাজের লোকেরা একত্রে ইবাদাহ করে, তারা একত্রে থাকে আর যেসব সমাজের লোকের একত্রে ইবাদাহ করে না তারা বিভিন্নভাবে বিভক্ত, শক্তিহীন হয়ে পড়ে।

আমরা আল্লাহর ইবাদাহর মাধ্যমেই কেবল হিসেব বা প্রতিদান দিবসে মুক্তি পেতে পারি। এই মুক্তির জন্য অন্যান্য লোকেদের সাথে নিয়ে আরো উত্তমভাবে ইবাদাহ করতে পারি এবং সফল হতে পারি।

আল্লাহ কি নিরাকার ! ভুল আকিদার অন্তরালে –

আল্লাহ তা'আলার আকার আছে, তিনি নিরাকার নন। নিরাকার অর্থ যা দেখে না, শুনে না। কিন্তু আল্লাহ সবকিছু দেখেন, শোনেন। তিনি এ বিশ্বজাহান ও সমস্ত সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা, নিয়ন্তা ও পরিচালক। তিনি মানুষকে রিযিক দান করেন, রোগাক্রান্ত করেন ও

আরোগ্য দান করেন। সুতরাং তাঁর আকার নেই, একথা স্বীকার করা তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করারই নামান্তর।

আল্লাহ শুনেন, দেখেন, উপকার-ক্ষতি, কল্যাণ-অকল্যাণ বিধান করেন। তিনি জীবন-মৃত্যুর মালিক, সকল সমস্যার একমাত্র সমাধানদাতা। সুতরাং মহান আল্লাহ নিরাকার নন; বরং তাঁর আকার আছে।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইহুদীদের একটি বক্তব্য এভাবে তুলে ধরেছেন,

'আর ইহুদীরা বলে, আল্লাহর হাত রুদ্ধ; তাদের হাতই বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের এ উক্তির দরুণ তাদের প্রতি অভিশাপ করা হয়েছে; বরং তাঁর (আল্লাহর) উভয় হাত প্রসারিত' (সূরা মায়েদাহ – ৬৪)।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ "তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না। ক্বিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আকাশ সমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে"। [সূরা যুমার, আয়াত ৬৭]

এ আয়াতের তাফসীরে সহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে,

ইহুদীদের একজন বড় আলেম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললঃ হে মুহাম্মাদ, আমরা (তাওরাতে) এটা লিখিত পাচ্ছি যে, আল্লাহ তায়ালা সপ্ত আকাশ রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর এবং যমীনগুলো রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর, বৃক্ষরাজিকে রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর এবং পানি ও মাটি রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর আর সমস্ত মাখলুককে রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর। অতঃপর তিনি বলবেন, আমিই সব কিছুর মালিক ও বাদশা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহুদী আলেমের কথার সত্যতায় হেসে ফেলেন, এমনকি তার মাড়ির দাঁত প্রকাশিত হয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন। [সহীহ বুখারী, হাদিস নং- ৪৮১১, তাফসীর অধ্যায়]

আল্লাহ আরো বলেন,

‘আপনারই হাতে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনি সব বিষয়ে ক্ষমতাবান’ (আলে ইমরান ২৬)।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর’ (ফাতহ ১০)।

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

‘আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবীকে তাঁর মুঠোতে ধারণ করবেন এবং সমস্ত আকাশকে স্বীয় ডান হাতে গুটিয়ে নিয়ে বলবেন, আমিই একমাত্র বাদশাহ’।[1]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

“আল্লাহ তায়ালা পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতে তাঁর হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে করে দিনের গুনাহগার তওবা করে। আর তিনি দিনে তাঁর হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে করে রাতের গুনাহগার তওবা করে”। [সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৭৫৯, তওবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৫]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

“নিশ্চয়ই সকল আদম সন্তানের অন্তর সমূহ একটি অন্তরের ন্যায় আল্লাহ তায়ালার আঙ্গুল সমূহের দুটি আঙ্গুলের মাঝে অবস্থিত। তিনি যেমন ইচ্ছা তা পরিচালনা করেন”। [সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৬৫৪, ভাগ্য অধ্যায়, অনু:৩]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

‘হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সিজদাবনত হ’তে তোমাকে কিসে বাধা দিল?’ (ছোয়াদ ৭৫)।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

‘যে তার হালাল রোযগার থেকে একটি খেজুর পরিমাণ দান করবে (আল্লাহ তা কবুল করবেন) এবং আল্লাহ হালাল বস্তু ছাড়া কিছুই গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ তা তাঁর

ডান হাতে গ্রহণ করবেন। অতঃপর তার দানকারীর জন্য তা প্রতিপালন করতে থাকেন যেরূপ তোমাদের কেউ তার অশ্ব-শাবককে লালন-পালন করতে থাকে। অবশেষে একদিন তা পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়'।[2]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

'আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে বলবেন, হে আদম! উত্তরে তিনি বলবেন, হাযির হে প্রতিপালক! আমি সৌভাগ্যবান এবং সমস্ত কল্যাণ আপনার হাতে। তিনি বলবেন, জাহান্নামীদেরকে বের করে দাও'।[3]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সবাই ঐক্যমত যে, আল্লাহ তা'আলার উভয় হাতই প্রকৃত। এখানে সঠিক অর্থ বাদ দিয়ে কুদরতী হাত, অনুগ্রহ, শক্তি এসব অর্থ গ্রহণ করা যাবে না কয়েকটি কারণে।

আল্লাহ তায়ালার পা মুবারক সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

"জাহান্নামে (জাহান্নামীদের) নিক্ষেপ করা হতে থাকবে আর সে (জাহান্নাম) বলবে, আরো আছে কি? শেষ পর্যন্ত বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক তাতে পা রাখবেন। তাতে জাহান্নামের একাংশের সাথে আরেকাংশ মিশে যাবে। অতঃপর জাহান্নাম বলবে, তোমার প্রতিপত্তি ও মর্যাদার শপথ, যথেষ্ট হয়েছে যথেষ্ট হয়েছে"। [সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৭৩৮৪, তাওহীদ অধ্যায়]

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

(কিয়ামতের দিন) আমাদের প্রভু পায়ের নলা উন্মুক্ত করে দিবেন। অতঃপর সকল মুমিন পুরুষ ও নারী তাকে সিজদা করবে। কিন্তু বাকী থাকবে ঐসব লোক, যারা দুনিয়ায় সিজদা করতো লোক দেখানো ও প্রচারের জন্য। তারা সিজদা করার জন্য যাবে কিন্তু তাদের পৃষ্ঠদেশ একখন্ড তক্তার মত শক্ত হয়ে যাবে। [সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৪৯১৯, তাফসীর অধ্যায়]

এতদ্ব্যতীত আল্লাহর পদনালীর বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন,

সেদিন পায়ের নলা উন্মোচিত করা হবে এবং তাদেরকে (কাফিরদেরকে) আহবান করা হবে সিজদা করার জন্য কিন্তু তারা তা করতে পারবে না' (সূরা আল কলম- ৪২)।

আল্লাহ তায়ালার চেহারা মুবারক সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

“ভূপৃষ্ঠের সব কিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার চেহারা ব্যতীত”। [সূরা আর রহমান, আয়াত ২৬-২৭]

আল্লাহ বলেন,

‘তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সে দিকেই আল্লাহর মুখমন্ডল রয়েছে' (সূরা বাক্বারাহ -১১৫)।

আল্লাহ তায়ালার চোখ মুবারক সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

“আর আমি আমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম যেন তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও”। [সূরা ত্ব-হা, আয়াত ৩৯]

আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেন,

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্ধ নন। সাবধান! নিশ্চয়ই দাজ্জালের ডান চোখ কানা। তার চোখটা যে একটি ফুলে যাওয়া আঙ্গুরের মতো'।[4]

সুতরাং কুরআন হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার প্রকৃতই চোখ আছে। আর এটাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য করা যাবে না।

আল্লাহ তা'আলার আনন্দ প্রকাশ ও হাসি সম্পর্কিত বর্ণনা হাদীছে এসেছে। আল্লাহর আনন্দ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেন,

‘আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার তওবার কারণে ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক আনন্দিত হন, যে মরুভূমিতে রয়েছে, তার বাহনের উপরে তার খাদ্য-পানীয় রয়েছে, এসবসহ তার বাহনটি পালিয়ে গেল। সে নিরাশ হয়ে একটি গাছের ছায়ায় এসে শুয়ে পড়ল। এভাবে সময় কাটতে লাগল। এমন সময় সে তার পাশেই তাকে দন্ডায়মান দেখে তার লাগাম

ধরে ফেলল। অতঃপর অত্যধিক আনন্দে বলে ফেলল, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার রব। সে আনন্দের আতিশয্যে ভুল করে ফেলে’।[5]

আল্লাহ তা‘আলার হাসি সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেন,

‘আল্লাহ তা‘আলা দু’ব্যক্তির কর্ম দেখে হাসেন। এদের একজন অপর জনকে হত্যা করে। অবশেষে তারা উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ করে। একজন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে নিহত হয়। অতঃপর হত্যাকারী আল্লাহর নিকট তওবা করে। এরপর সে শাহাদতবরণ করে’।[6]

“ মুমিনগণের আল্লাহকে দেখা ”

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের আক্বীদা হ’ল- আল্লাহর আকার আছে এবং প্রত্যেক জান্নাতবাসী ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্কে স্বীয় আকৃতিতে দেখতে পাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

‘সেদিন অনেক মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে’ (ক্বিয়ামাহ ২২, ২৩)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফিয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, ঐ দিন এমন হবে যাদের মুখমন্ডলে উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।[7] যেমন ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, ‘শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালককে তোমরা চাক্ষুসভাবে দেখতে পাবে’।[8] অন্য হাদীছে এসেছে, লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ‘ক্বিয়ামতের দিন কি আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তরে বললেন, পূর্ণিমা রাতে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন কষ্ট হয়? তারা বলল, না, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি আরো বললেন, যখন আকাশ মেঘশূন্য ও সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকে তখন সূর্য দেখতে তোমাদের কোন কষ্ট হয় কি? উত্তরে তাঁরা বললেন, জ্বী না। তখন তিনি বললেন, এভাবেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে।[9]

ছহীহ মুসলিমে ছুহায়েব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের জন্য আমি আরো কিছু বৃদ্ধি করে দিই তা তোমরা চাও কি? তারা উত্তরে বলবে, আপনি কি আমাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল করেননি, আমাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করেননি এবং আমাদেরকে জাহান্নাম হ'তে রক্ষা করেননি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অতঃপর পর্দা সরে যাবে। তখন ঐ জান্নাতীদের দৃষ্টি তাদের প্রতিপালকের প্রতি পতিত হবে এবং তাতে তারা যে আনন্দ পাবে তা অন্য কিছুতেই পাবে না'। এই দীদারে বারী তা'আলাই হবে তাদের নিকট সবচেয়ে প্রিয়। এটাকেই অতিরিক্ত বলা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন,

'সৎ কর্মশীলদের জন্য রয়েছে জান্নাত এবং তার চেয়েও বেশী' (ইউনুস ২৬)।[10]

যারা আল্লাহ্কে দেখার বিষয়টি অস্বীকার করে তাদের দলীল হ'ল নিম্নোক্ত আয়াত,

وَلَمَّا جَاءَ مُوْسَى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِيْ أَنْظُرْ إِلَيْكَ، قَالَ لَنْ تَرَانِيْ،

'মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হ'ল, তখন তাঁর প্রতিপালক তাঁর সাথে কথা বললেন, তিনি তখন বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব, তখন আল্লাহ বললেন, তুমি আমাকে আদৌ দেখতে পাবে না' (আ'রাফ ১৪৩)।

এই আয়াতকে দলীল হিসাবে নিয়ে মু'তাযিলা সম্প্রদায় বলে থাকে যে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই আল্লাহকে দেখা অসম্ভব। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত মু'তাযিলাদের জবাবে বলে থাকেন, এখানে আল্লাহ لَنْ تَرَانِيْ দ্বারা দুনিয়াতে না দেখার কথা বলেছেন, আখিরাতে নয়। কারণ কুরআন-হাদীছের দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ক্বিয়ামতের দিন মুমিন বান্দাগণ আল্লাহকে দেখতে পাবে। মূসা (আঃ) আল্লাহকে দুনিয়াতে দেখতে চেয়েছিলেন। অথচ দুনিয়ার এই চোখ দ্বারা আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়।

■■ আল্লাহ তা'আলার আকার সম্পর্কে ইমামগণের মতামত

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার ছিফাত-এর সাথে সৃষ্টজীবের ছিফাতকে যেন সাদৃশ্য করা না হয় এবং আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের মধ্যে দু'টি ছিফাত হচ্ছে- তাঁর রাগ ও সন্তুষ্টি। রাগ ও সন্তুষ্টি কেমন একথা যেন না বলা হয়। এটাই হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কথা। তাঁর রাগকে শাস্তি এবং সন্তুষ্টিকে যেন নেকী না বলা হয়। আমরা তাঁর ছিফাত সাব্যস্ত করব। যেমনভাবে তিনি নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন। তিনি একক ও অদ্বিতীয়, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি ও তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি এবং কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়। তিনি জীবিত, সবার উপর ক্ষমতাবান। তিনি শুনেন, দেখেন, সব বিষয় তাঁর জানা। আল্লাহর হাত তাদের সবার হাতের উপর। আল্লাহর হাত সৃষ্টির হাতের মত নয় এবং তাঁর মুখমন্ডল সৃষ্টির মুখমন্ডলের মত নয়।[11]

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) আরো বলেন,

'তাঁর (আল্লাহর) হাত, মুখমন্ডল এবং নফস রয়েছে। যেমনভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। কুরআনে আল্লাহ তাঁর মুখমন্ডল, হাত ও নফসের যে কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলো তাঁর গুণ। কিন্তু কারো সাথে সেগুলোর সাদৃশ্য নেই। আর একথা বলা যাবে না যে, তাঁর হাত অর্থ তাঁর কুদরত বা নে'মত। কেননা এতে আল্লাহর গুণকে বাতিল সাব্যস্ত করা হয়। আর এটা ক্বাদারিয়া ও মু'তাযিলাদের মত। বরং তাঁর হাত তাঁর গুণ কারো হাতের সাথে সাদৃশ্য ব্যতীত। আর তাঁর রাগ ও সন্তুষ্টি কারো রাগ ও সন্তুষ্টির সাথে সাদৃশ্য ব্ ব্্যতীত আল্লাহর দু'টি ছিফাত বা গুণ।[12]

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-কে আল্লাহ তা'আলার অবতরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন,

আল্লাহ তা'আলা যে রাত্রের তৃতীয় অংশে সপ্ত আকাশে নেমে আসেন, এ নেমে আসাটা কেমন, কিভাবে নামেন, এটা বলার ক্ষমতা কাউকে দেওয়া হয়নি। কেমন করে নামেন এটা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।[13]

আল্লাহ তা‘আলার ছিফাতের সাথে মানুষের অর্থাৎ সৃষ্টির গুণের সাদৃশ্য হবে না। যেমন আল্লাহ তা‘আলা জানেন। কিন্তু সৃষ্টির জানা তাঁর মত নয়। তাঁর ক্ষমতা-শক্তি সৃষ্টির ক্ষমতার মত নয়। তাঁর দেখা-শুনা, কথা বলা, মানুষের বা সৃষ্টির দেখা-শুনা বা কথা বলার মত নয়।[14]

সুতরাং কুরআন-হাদীছে যেভাবে আল্লাহর গুণাবলী বর্ণিত আছে ঠিক সেভাবেই বলতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলছেন, ‘তিনি আরশের উপর সমাসীন’। সেটাই আমাদেরকে বলতে হবে।

ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, ইমাম মালেককে জিজ্ঞেস করা হয়, আল্লাহ তা‘আলাকে কি ক্বিয়ামতের দিন দেখা যাবে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, হ্যাঁ! দেখা যাবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, কোন কোন মুখমন্ডল সেদিন উজ্জবল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে’ (ক্বিয়ামাহ ২২-২৩)।

সুতরাং আল্লাহ তা‘আলার আকার আছেন। তিনি নিরাকার নন। কারণ যার আকার আছে তাকেই দর্শন সম্ভব। কিন্তু নিরাকারকে নয়।

■■ ফুট নোটঃ

[1]. বুখারী হা/৭৪১২।

[2]. বুখারী, হা/১৪১০ ‘যাকাত’ অধ্যায়।

[3]. বুখারী, হা/৩৩৪৮ ‘তাফসীর’ অধ্যায়।

[4]. বুখারী, হা/৩৪৩৯ ‘নবীদের কাহিনী’ অধ্যায়।

[5]. মুসলিম, হা/২৭৪৭ ‘তওবা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১।

[6]. বুখারী, হা/২৮২৬ ‘জিহাদ ও সিয়ার’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৮।

[7]. তাফসীর ইবনে কাছীর, ১৪শ’ খন্ড, পৃঃ ২০০।

[8]. বুখারী হা/৭৪৩৫ ‘তাওহীদ’ অধ্যায়।

[9]. বুখারী হা/৭৪৩৭ 'তাওহীদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৪।

[10]. মুসলিম হা/১৮১ 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮০।

[11]. আল-ফিক্বহুল আবসাত্ব, পৃঃ ৫৬।

[12]. আল-ফিক্বহুল আকবার, পৃঃ ৩০২।

[13]. আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবুল হাদীছ, পৃঃ ৪২; শারহুল ফিক্বহুল আকবার, পৃঃ ৬০।

[14]. আল-ফিক্বহুল আকবার, পৃঃ ৩০২।

Main Source of this Content-

লেখাঃ আরিফ আজাদ

মৃত্যু অনিবার্য : রিজিক নির্ধারিত

যে জন্মেছে সে মৃত্যুবরণ করবেই। যার সূচনা হয়েছে তার সমাপ্তি ঘটবেই। এটা আল্লাহপাকের শাশ্বত বিধান। এ অমোঘ বিধানের কোন পরিবর্তন নেই। পৃথিবীর বুকে অবধারিত সত্য হলো মৃত্যু। প্রত্যেক প্রাণীকে মরতে এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেন,

"প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।"- সূরা আলে ইমরানঃ ১৮৫

অনিবার্য মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জীবন চলার পথে রিজিক তথা জীবিকা জীবনের অপরিহার্য উপাদান। জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। জীবিকা ব্যতিত জীবন অসম্পূর্ণ, অচল ও অসম্ভব। কম বেশি সবার প্রয়োজনীয় জীবিকা দরকার। খাদ্য-পানীয়, সহায় সম্বল, অর্থ-কড়ি, সন্তান-সন্ততি ও ধন সম্পদ যা আমরা ভোগ করি, সবই রিজিকের অর্ন্তভূক্ত। রিজিক আল্লাহপাক নিজ অনুগ্রহে সৃষ্টিজগতকে দান করেন। আল্লাহপাক জন্মের আগে তা আমাদের ভাগ্যে বন্টন করে রেখেছেন। আমরা সর্বদা জীবিকা নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকি। ধন-সম্পদ নিয়ে টেনশন করি। অনাগত ভবিষ্যতের চিন্তায় চিন্তিত থাকি। পরিবার-

পরিজন ও ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকি। টাকা-পয়শার বিষয় সামনে আসলেই ব্যতিক্রম, স্বার্থপর ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি। সবসময় ভাবতে থাকি আগামীতে কী করব? কী খাব? কীভাবে চলব? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

জীবিকা প্রসঙ্গে আল্লাহপাক মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলেন,

"পৃথিবীতে চলমান সকল প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর। তিনি তাদের অবস্থানস্থল ও সংরক্ষণস্থল জানেন। সবকিছুই এক স্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে" -সূরা হুদঃ ৬।

অন্যত্র আল্লাহপাক বলেন, "কোন প্রাণীই জানে না, আগামীতে সে কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না, তার মৃত্যু কখন কোথায় হবে" – সূরা লোকমানঃ ৩৪।

আধুনিক ও সভ্য পৃথিবী আজ ব্যস্ত ও অস্থির দু' জিনিসের পিছনে।

১। রিজিক তথা জীবিকার অন্বেষণ।

২। মওত তথা মৃত্যুর হাত থেকে বাচাঁর প্রাণপণ চেষ্টা।

অথচ অবধারিত সত্য হচ্ছে, এ দু'টি বিষয় অনেক আগে থেকে নির্ধারিত ও মীমাংসিত। জীবিকার জন্য মানুষ কত কিছুইনা করছে! চির সত্য হচ্ছে, জীবিকা ভাগ্যে যা লিপিবদ্ধ আছে এর বাইরে অর্জন করতে পারে না। শত সহস্র চেষ্টা করেও আল্লাহ কর্তৃক বাজেটের বাইরে যাওয়া কোনো মাখলুকের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রকৌশলীর পরিকল্পনা ও নকশার বাইরে যেভাবে নির্মাণ শ্রমিকদের যাওয়ার সুযোগ নেই, অনুরূপভাবে রব তথা আল্লাহ্‌র নকশা ও বন্টনের বাইরেও সৃষ্টিজগতের যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সরকারের বরাদ্দের বাইরে কোন এজেন্সি, কর্মকর্তা ও কর্মচারী যেতে পারে না, অনুরূপভাবে মহান রবের বাজেট তথা বরাদ্দের বাইরেও মাখলুক যেতে পারে না। এজন্যই সচরাচর দেখা যায়, একই ব্যবসায় কেউ সফল আবার কেউ ব্যর্থ। একই কর্মে কেউ কৃতকার্য আবার কেউ অকৃতকার্য। সমান পরিশ্রম করে কেউ এগিয়ে যাচ্ছে, আবার কেউ পিছিয়ে যাচ্ছে। একই গবেষণায় কেউ সফল আবার কেউ বিফল। একই বাহনে কেউ আহত, কেউ নিহত আবার কেউ জীবিত ও সুস্থ!

জন্ম, জীবিকা, বিবাহ ও মৃত্যু এগুলো মহান রব তথা সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি, রহস্য ও নিয়ন্ত্রিত মহিমা! অতএব পরিশ্রম, চেষ্টা ও সাধনার পরও যদি কোনো কিছু অর্জন না হয় তাহলে মনে করতে হবে, রিজিক, নসিব তথা ভাগ্যে নেই। এজন্য হতাশ বা চিন্তিত হওয়া উচিত নয়। সর্বাবস্থায় আল্লাহর ফায়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকায় হচ্ছে ঈমানের দাবী।

হাদিসে রাসূল (সাঃ) বলেন, "গরীব মু'মিনেরা ধনীদের পাচঁ শত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে"-তিরিমিজিঃ ২৩৫৩।

আল্লাহপাক বান্দার জন্য যা ভাল ও মঙ্গল তাই করেন। যদিওবা জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে আমাদের বুঝে আসে না। অন্য হাদিসে রাসূল (সাঃ) বলেন,

"আমি জান্নাতের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশই গরীব লোক। আর জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার অধিকাংশই মহিলা"-বুখারীঃ ৩২৪১।

অতএব কার বরাদ্দ কোথায় রেখেছেন তা আল্লাহই ভাল জানেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

"তোমার রব যাকে চান জীবিকা বাড়িয়ে দেন, আবার সংকুচিত করে দেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের সব খবর রাখেন এবং সবকিছু দেখেন।" -৩০ঃ ১৭

জীবিকার পেছনে সবাই দৌড়ায়। জীবনের জন্য রিজিক অথচ এই রিজিকর জন্য অনেকের জীবন পর্যন্ত চলে যায়। সবার রিজিক কিন্তু সমান নয়। কেউ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে লবণ আনতে পান্তা ফুরায়। আবার কেউ উত্তরাকিার সূত্রে পাওয়া সম্পদ বসে বসে খায়। সবাই সমান রিজিক উপার্জন করতে পারে না। আল্লাহপাকের হিকমতের দাবীও তাই। কারণ সবার রিজিক যদি সমান হয়, সবাই যদি সমান অর্থ-সম্পদের মালিক হয়, তাহলে দুনিয়ার আবাদ ও বিশ্ব পরিচালনা ব্যাহত হবে, পৃথিবী স্থবির হয়ে পড়বে। তাই এর বণ্টন আল্লাহপাক নিজ দায়িত্বে রেখেছেন। তিনি নিজ হিকমত ও প্রজ্ঞানুযায়ী সবার মাঝে তা বণ্টন করেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

“অতঃপর যখন নামাজ সমাপ্ত হবে, তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ, রিজিক তথা জীবিকার সন্ধান করবে।” সূরা জুমুআহঃ ১০

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

“তোমরা যদি সঠিকভাবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে তবে তিনি তোমাদেরকে রিযিক দান করতেন- যেমন পাখিকে রিযিক দান করে থাকেন- তারা খালি পেটে সকালে বের হয় এবং পেট ভর্তি হয়ে রাতে ফিরে আসে।” (আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ্)

উল্লেখ্য, সরকারের বাজেট পাশ হয় সংসদে আর রবের বাজেট পাশ হয় আসমানে। অতএব রিজিক বাড়ানোর জন্য আগ্রহী প্রার্থীকে অবশ্যই আসমানে দরখাস্ত করতে হবে। রিজিক বৃদ্ধির হাতিয়ার, মহান রবের দরবারে দোয়া ও ইস্তিগফার। সরকারী বাজেট বিভিন্ন এজেন্সি ও সংস্থার মাধ্যমে সরকার জনগণের মাঝে পৌছেঁ দেন। অনুরূপভাবে আল্লাহপাক সৃষ্টিজগতের বাজেট সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর কাছে পৌছাঁন। এ হচ্ছে বিধাতার বিধান। সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও এজেন্সি সরকারী বাজেটের মালিক নয় বরং বাহকমাত্র, মালিক হচ্ছে সরকার। অনুরূপভাবে সৃষ্টিজগত হচ্ছে মাধ্যম তথা বাহকমাত্র। রিজিক তথা জীবিকার প্রকৃত মালিক হচ্ছে রায্যাক, রব তথা মহান আল্লাহ। হাদিসে রাসূল (সাঃ) বলেন,

“সেই ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, আর তাকে পরিমিত জীবিকা দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহপাক তাকে যা দিয়েছেন তাতে সে সন্তুষ্ট।” সহি-মুসলিমঃ১০৫৪

জীবিকা তথা রিজিক কোনো সম্মান বা মর্যাদার মাপকাঠি নয়। আবার হতভাগা বা অশুভ লক্ষণের আলামতও নয়। কী অনুগত! কী অবাধ্য! কী মুমিন! কী কাফের! কী ভাল! কী মন্দ! সবাইকে জোয়ার ভাটার ন্যায় প্রাচুর্র্য ও অভাব, সুখ ও দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে। এর মাধ্যমে আল্লাহপাক অবাধ্য ও কাফেরকে অবকাশ দেন আর অনুগত ও মুমিনের পরীক্ষা নেন। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন,

“যদি আল্লাহর নিকট মাছির ডানার সমান দুনিয়ার মূল্য থাকত, তাহলে তিনি কোনো কাফেরকে এক ঢোক পানিও পান করাতেন না। ” তিরমিজিঃ ২৩২০

অন্য হাদিসে রাসূল (সাঃ) বলেন,

“প্রত্যেক উম্মতের জন্য ফিতনা রয়েছে, আমার উম্মতের ফিতনা হচ্ছে মাল”-তিরমিজিঃ ২৩৩৬।

আরেক হাদিসে রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন,

“ ছাগলের পালে দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছেড়ে দিলে ছাগলের যতটা ক্ষতি করে, দ্বীনের জন্য তার চেয়ে বেশি ক্ষতিকারক হচ্ছে সম্পদ ও সম্মানের প্রতি লোভ-লালসা। ” তিরমিজিঃ ২৩৭৬

হাদিসে রাসূল (সাঃ) বলেন,

“মুমিনের বিষয়টি আশ্চর্যজনক, তার প্রত্যেকটি বিষয় কল্যাণকর, এটা মুমিন ব্যতীত অন্য কারো ভাগ্যে নেই, যদি তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, আল্লাহর শোকর আদায় করে, এটা তার জন্য কল্যাণকর, আর যদি তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে ধৈর্য ধারণ করে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর।”- মুসলিমঃ ৫৩২২

প্রাচুর্য ও সচ্ছলতার সময় একজন মুমিন যাকাত-সাদকা প্রদান করে আল্লাহর শোকর আদায় করবে। অভাব ও অসচ্ছলতার সময় ঈমান ও ধৈর্যের পরিচয় দেবে। সুতরাং অভাব ও প্রাচুর্য উভয় মুমিনের জন্য কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক।

বুখারী শরীফে ‘আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সত্যবাদী স্বীকৃত রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

“প্রত্যেকেই আপন মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত শুক্রানু হিসেবে জমাট থাকে। তারপর চল্লিশ দিন রক্তপিন্ড। তারপর চল্লিশ দিন গোশত পিন্ডাকারে থাকে। তারপর আল্লাহপাক একজন ফেরেশতা পাঠান তার জন্য চারটি বিষয় লিখে দেয়ার দেওয়ার জন্য। তার

রিজিক কী হবে, তার মৃত্যু কবে হবে? সে কী দুর্ভাগা হবে, নাকি সৌভাগ্যবান হবে।”- সহিহ বুখারীঃ ৬৫৯৪

আল্লাহ বলেন, ‘তারা কি তোমার পালনকর্তার অনুগ্রহ বণ্টন করে? আমিই তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করি পার্থিব জীবনে এবং তাদের একজনের মর্যাদা অন্যজনের ওপর উন্নীত করেছি, যাতে তারা একে অন্যকে সেবকরূপে গ্রহণ করতে পারে।’ (সুরা : জুখরুফ, আয়াত : ৩২)

সাধারণ মানুষ মনে করে, রিজিক বা জীবিকা আসে চাকরি, ব্যবসা বা চাষাবাদের মাধ্যমে। কিন্তু কোরআনের ঘোষণা হলো,

“রিজিকের সিদ্ধান্ত হয় আসমানে। আল্লাহ বলেন, ‘আকাশে রয়েছে তোমাদের রিজিক ও প্রতিশ্রুত সব কিছু।’ (সুরা : জারিয়াত, আয়াত : ২২)

ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, রাসূল(সাঃ) বলেন, “জুলুমের বিরুদ্ধে কথা বলা কিংবা সত্য কথা বলার সময় কারো ভয় পাওয়া উচিত নয়, কারণ এর মাধ্যমে না আয়ু কমে যাবে, না তাকে তার রিজিক থেকে দূরে সরিয়ে দিবে।”- বায়হাকি

অন্যদিকে মৃত্যু থেকে বাচাঁর জন্য মানুষ এমন কোনো পথ, পদ্ধতি ও কৌশল নেই যা অবলম্বণ করে না। অথচ আজ পর্যন্ত কেউ কী মালাকুল মাওত তথা আজরাইল (আঃ) এর হাত থেকে বাচঁতে পেরেছে? মৃত্যু থেকে বাচাঁর জন্য মানুষ কত চেষ্টাই না করছে! প্রাণপন চেষ্টা করেও রবের নির্ধারিত মৃত্যু থেকে কেউ রেহাই পাইনি এবং পাবেও না। অতএব, চিরসত্য রিজিক ও মৃত্যু এ দু’টি বিষয় বান্দার ইচ্ছাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীণ নয়। তা একমাত্র মহান রব তথা প্রতিপালকের হাতে। এটি বিধাতার শাশ্বত বিধান। তারই নিয়ন্ত্রণাধীণ ও ইচ্ছাধীন। আল্লাহপাক জন্মের আগেই জীবিকা নির্ধারণ করে রেখেছেন। আল্লাহপাক জন্মের আগেই আমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করে রেখেছেন। আল্লাহপাক জন্মের আগেই মৃত্যুর সময় ও স্থান অবধারিত করে রেখেছেন। অতএব, যে বিষয়টি হাতের নাগালের বাইরে, নিজ ইচ্ছাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীণ নয়, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা, হতাশা ও অনুশোচনা কখনো বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।

মৃত্যু এমন এক বিষয় যার হাত থেকে পলায়ন করার সাধ্য কারো নেই। এ কথা বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহতায়ালা যার মৃত্যু যেখানে নির্ধারিত করে রেখেছেন, সেখানেই তাঁর মৃত্যু হবে। মৃত্যু যে নির্ধারিত সময় ও স্থানে সুনিশ্চিত তা হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের যুগে তাঁর নিজের এক মন্ত্রীর মৃত্যুর ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়।

হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম নিজের এক মন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। এমন সময় খুব সুন্দর চেহারা ও দামি পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি সুলাইমান আলাইহিস সালামের মজলিশে প্রবেশ করল এবং কিছুক্ষণ বসার পর চলে গেল। তাঁর যাওয়ার পর মন্ত্রী হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর নবী! এ মাত্র আপনার নিকট যে লোকটি এসেছিলে, সে কে? হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম বললেন, সে 'মালাকুল মাউত' অর্থাৎ মৃত্যু ফেরেশতা। মালাকুল মাউত এর নাম শুনে মন্ত্রীর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায় এবং শরীর কাঁপতে থাকে আর বলতে থাকে, হযরত অনুগ্রহ করে বাতাসকে হুকুম দেন, বাতাস যেন আমাকে হিন্দুস্তানে (সেখান থেকে অনেক দূর) পৌঁছে দেয়। কারণ আমার জন্য অসম্ভব যে, আমি ঐ জায়গায় বসি যেখানে মৃত্যুর ফেরেশতা বসেছে।

হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম মন্ত্রীর আবেদন মঞ্জুর করে বাতাসকে নির্দেশ দেন, মন্ত্রীকে হিন্দুস্থান পৌঁছে দেয়ার জন্য। সাথে সাথে বাতাস নির্দেশ মোতাবেক তাই করল। একটু পরে পুনরায় মৃত্যুর ফেরেশতা সুলাইমান আলাইহিস সালামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল হে আল্লাহর নবী আপনার মন্ত্রী কোথায়? হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম জানালেন, আপনার ভয়ের কারণে বাতাস তাঁকে হিন্দুস্থানে পৌছে দিয়েছে। মৃত্যুর ফেরেশতা বলল, কিছুক্ষণ পূর্বে আমি যখন আপনার মজলিসে এসেছিলাম, তখন ঐ মন্ত্রীকে দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম! কেননা আল্লাহ তায়ালা আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে, হিন্দুস্তান থেকে তার রূহ কবজ করার জন্য। আমি এসে দেখলাম সেই ব্যক্তি হাজার মাইল দূরে আপনার নিকট বসে আছে? সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কী অপার মহিমা! মৃত্যুর সময় এবং স্থান পরিবর্তন হয় না। মৃত্যুর ফেরেশতা আরো বলেন,

আমি নির্দিষ্ট সময়ে হিন্দুস্তান পৌঁছি তখন আপনার মন্ত্রী হিন্দুস্তানে উপস্থিত! তার রূহ কবজ করে পুনরায় আপনার নিকট ফিরে আসলাম।

এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট মৃত্যু অবধারিত সত্য। আমরা প্রতিনিয়ত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছি। মৃত্যুর পথে ধাবিত হচ্ছি। আমরা সবাই মৃত্যুযাত্রী। এক ফারসী কবি বলেনঃ "দু'টি জিনিস মানুষকে সর্বদা টানে/ এক. রিজিক দুই. কবর পানে।

সবাইকে মৃত্যুর উন্মুক্ত দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। আমাদের মম চিত্তকে পরিশুদ্ধ করা প্রয়োজন। পরকালে সুখ-শান্তিতে থাকার উপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক। মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করা দরকার। প্রত্যেকটা কাজের প্রারম্ভে করোটিতে মৃত্যু নামক বাস্তব চিত্র আঁকা জরুরী। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) বলেন,

দুনিয়ার স্বাদকে বিলুপ্তকারী মৃত্যুকে তোমরা বেশি বেশি স্মরণ করো।- তিরমিজিঃ ২৩০৭

নশ্বর পৃথিবীর শাশ্বত চিরন্তন সত্য হলো মৃত্যু। মৃত্যুর চেয়ে অপরিবর্তনীয় শব্দ জগতের অভিধানে খুব কম। রসায়নে বলা হয়, "বস্তু নিঃশেষ হয় না, রূপ পালটায়"। কীভাবে মানুষের রূপান্তর ঘটে তা একটু ভেবে দেখলেই পরিস্কার বুঝা যায়। আমাদের প্রথম ঠিকানা যথাক্রমে "আ'লমে আরওয়াহ" তথা রূহ জগত। সেখান থেকে মায়ের পেট। মায়ের পেট থেকে দুনিয়ার পিঠ। দুনিয়ার পিঠ থেকে দুনিয়ার পেট। দুনিয়ার পেট থেকে কিয়ামতের মাঠ। কিয়ামতের মাঠ থেকে সর্বশেষ ঠিকানা জান্নাত বা জাহান্নাম। এভাবে মানুষের স্থান পরিবর্তন হতে থাকে। অতএব, মানুষ মরে গেলেই শেষ হয় না বরং স্থানান্তর হয় মাত্র। নতুন করে বরজখ জীবন শুরু হয়।

মানুষ মরণশীল। তবে মরণই সবকিছু শেষ নয়। রূহ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

"রূহ হল তোমার প্রভুর আদেশমাত্র। এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্যই জ্ঞান দেয়া হয়েছে।" সূরা আল-ইসরাঃ ৮৫।

আল্লাহর আদেশে রূহ প্রদান করা হয়েছে আবার আল্লাহর আদেশেই রূহ প্রত্যাহার হবে। আল্লামা ইকবাল বলেন, “মৃত্যু অবিনশ্বর জীবনপথের ফজরবেলা”। শেষ বিচারের পর জান্নাত ও জাহান্নামই হচ্ছে শেষ পরিণতি, চুড়ান্ত জীবন ও স্থায়ী ঠিকানা! এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

এই পার্থিব জীবন ছলনাময়, প্রতারণার সামগ্রীমাত্র। পরকালের জীবনই আসল জীবন, প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত!-সূরা আল আনকাবুত : ৬৪।

বিদেশে গিয়ে নিজ দেশ, মাতৃভূমি ও জন্মভূমির কথা ভুলে যাওয়া কখনো বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। অনুরূপভাবে ক্ষণস্থায়ী সুখ-শান্তির পিছনে পড়ে চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির কথা ভুলে যাওয়া কখনো সচেতনতার পরিচয় বহন করে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেন,

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে গাফেল না করে, আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসিন না করে। আর যারা উদাসিন হয়, আল্লাহকে ভুলে যায় তারাই হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত। আর আমি তোমাদের যে জীবিকা (রিজিক) দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর মৃত্যু আসার আগে। অন্যথায় মৃত্যু আসলে সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দিলে, আমি সাদকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অর্ন্তভূক্ত হতাম। কিন্তু নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহপাক কাউকে অবকাশ দিবেন না।” – সূরা মুনাফিকুনঃ ৯-১১

সফলতা ও ব্যর্থতা এ দু’টি শব্দ এখন সর্বত্রই খুব বেশি প্রচলিত। সচেতন মানুষ এ দুটি শব্দ নিয়ে খুব বেশি গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে। চুড়ান্ত সফলতার একটি সূত্র ও মাপকাটি আল্লাহপাক মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বর্ণনা করেছেন। আসুন, আমরা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সূত্রের কষ্টিপাথরে যাচাই করি, আমাদের জীবন কী সফল! নাকি ব্যর্থ! পবিত্র সংবিধান, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, সব সমস্যার সমাধানঃ

“প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর কিয়ামতের দিন, তোমাদের কর্মফল তথা প্রতিদান দেয়া হবে। তখন যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সেই প্রকৃত সফলকাম।”-৩ : ১৮৫

পরিশেষে সবাইকে ইহজগত ছেড়ে পরপারে যেতে হবে এটিই চুড়ান্ত, খাটিঁ ও বাস্তবতা। আল-কুরআনে আল্লাহপাক বলেন,

“প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপস্থিত হও।”- সূরা আত্‌-তাকাছুর।

রাসূল (সাঃ) বলেন, “আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন।”-বুখারীঃ ২৮৩৪

স্বভাবগতভাবে মানুষের মধ্যে তাড়াহুড়া করার প্রবণতা আছে। সে দ্রুত সব কিছু পেতে চায়। সব কিছু ভোগ করতে চায়। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম হলো, নির্ধারিত সময়ে ধীরে ধীরে জীবনোপকরণ হাতে আসে। হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী, নির্ধারিত জীবিকা আসবেই। কেউ তার রিজিক ভোগ না করে মৃত্যুবরণ করবে না। মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন,

‘হে মানুষ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। ধনসম্পদ সংগ্রহে উত্তম পন্থা অবলম্বন করো। কেননা কেউ তার রিজিক পরিপূর্ণ না করে মৃত্যুবরণ করবে না, যদিও তা অর্জনে বিলম্ব হোক না কেন।’ (ইবনে মাজাহ)

জ্বীন জাতি এবং জ্বীনের অস্তিত্ব

জিন জাতি আল্‌ কোরআন বর্ণিত একটি জীব বা সৃষ্টি। প্রাক ইসলামী যুগেও জিন জাতি সংক্রান্ত বিশ্বাস আরব এবং কাছাঁকাছি এলাকায় বিদ্যমান ছিল। আরবি জিন শব্দটির আক্ষরিক শব্দার্থ যে কোন কিছু যা গুপ্ত, অদৃশ্য, অন্তরালে বসবাসকারী বা অনেক দূরবর্তী।

কুরআন অনুসারে জিন জাতি মানুষের ন্যায় আল্লাহ্‌ তা'য়ালার এক সৃষ্ট একটি জাতি যারা পৃথিবীতে মানব আগমনের পূর্ব থেকেই তারা ছিল এবং এখনো তাদের অস্তিত্ব

রয়েছে। তবে মানুষের চর্মচক্ষে তারা দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। তবে জিনরা মানুষকে দেখতে পায়। তারা বিশেষ কিছু শক্তির অধিকারী। তাদের মধ্যেও মুসলিম এবং কাফির ভেদ রয়েছে। তারা মসজিদে নামাজ পড়তে আসে। তাদেরও সমাজ রয়েছে। তারা আয়ূ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। উদাহরনস্বরূপ, তারা ৩০০ বছর বয়সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়। ঈমাম ইবনে তাইমিয়ার মতে জিন জাতি তাদের অবয়ব পরিবর্তন করতে পারে।

ইসলামের মতে জিন জাতি এক বিশেষ সৃষ্টি। কুরআনের ৭২তম সুরা আল জ্বিন এ শুধু জিনদের নিয়ে কথা বলা হয়েছে। এছাড়া সূরা আন নাস এর শেষ অংশে জিন জাতির উল্লেখ আছে।কুরআনে আরো বলা আছে হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে জিন এবং মানবজাতির নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। হযরত সুলায়মান (আ:) এর সেনাদলে জিনদের অংশগ্রহণ ছিল বলে কুরআনে উল্লেখ আছে। ইসলামে আরো বলা আছে "ইবলিশ" তথা শয়তান প্রকৃতপক্ষে জিন জাতির একজন ছিল। ইসলামের মতে, শয়তান হচ্ছে দুষ্ট জিনদের নেতা। ইবলিশ বা শয়তান ছিল প্রথম জিন যে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। কুরআনে উল্লেখ আছে যে, ইবলিশ এক সময় আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা ছিল । কিন্তু আল্লাহ যখন হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করলেন, তখন হিংসা ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে ইবলিশ আল্লাহর হুকুম অমান্য করে। এ কারণে ইবলিশ কে বেহেশত থেকে বিতাড়িত করা হয় এবং এরপর থেকে তার নামকরণ হয় শয়তান। ইসলাম পূর্ব আরব উপকথা গুলোতে জ্বিন সদৃশ সত্ত্বার উল্লেখ আছে। প্রাচীন সেমাইট জাতির জনগণ জিন নামক সত্ত্বায় বিশ্বাস করতো। তাদের মতানুসারে নানাপ্রকারের জিন পরিলক্ষিত হয়। যেমন, ঘুল (দুষ্ট প্রকৃতির জিন যারা মূলত কবরস্থানের সাথে সম্পর্কিত এবং এরা যেকোন আকৃতি ধারণ করতে পারে), সিলা (যারা আকৃতি পরিবর্তন করতে পারতো) এবং ইফরিত (এরা খারাপ আত্মা)। এছাড়া মারিদ নামক এক প্রকার জিন আছে যারা জিন দের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী।

আমাদের মাঝে অনেকেই আছেন যারা জ্বীনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জ্বীন আল্লাহর অপর একটি সৃষ্টি যারা এই পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে সহ-অবস্থান করে। আল্লাহ মানবজাতি সৃষ্টির পূর্বে জ্বীন সৃষ্টি করেন এবং তিনি মানুষ সৃষ্টির

উপাদান হতে ভিন্নতর উপদানের সমষ্টি দিয়ে জ্বীন সৃষ্টি করেছেন। জ্বীনের সম্বন্ধে কোরআনে একটি সম্পুর্ণ সূরা,সূরা আল্-জিন (৭২নং সূরা) অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লাহ বলেনঃ

"আমি তো মানুষ সৃষ্টি করিয়াছি ছাঁচে-ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হইতে। এবং ইহার পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি জিন অত্যুষ্ণ বায়ুর উত্তাপ হইতে।" [সূরা আল্-হিজর ১৫:২৬,২৭]

তাদের জ্বীন নামকরণ করা হয়েছে কারণ তারা মানব জাতির চোখের অন্তরালে রয়েছে। ইবলিশ (শয়তান) জ্বীন জগতের,যদিও আল্লাহ যখন আদমকে সিজদা করার হুকুম দিয়েছিলেন তখন সে ফেরেশতাদের মধ্যে অবস্থান করছিল। যখন সে সিজদাহ করতে অসম্মত হল এবং তাকে তার অবাধ্যতার কারণ জিজ্ঞেস করা হল। যে সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ

"সে বললঃ আমি তার চেয়ে উত্তম আপনি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা।" [সূরা সাদ ৩৮:৭৬]

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা দেন যে রাসূল (সঃ) বলেছেন,

"ফেরেশতাদের আলো হতে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং জ্বীনদের ধুম্রবিহীনঅগ্নি হতে।" [SAHIH MUSLIM]

আল্লাহ আরও বলেনঃ

"এবং স্মরণ কর,আমি যখন ফেরেশতাগণকে বলিয়াছিলাম আদমের প্রতি সিজদা কর,তখন সকলেই সিজদা করিল ইবলীস ব্যতীত,সে জ্বীনদিগের একজন।" [সূরা আল্-কাহ্ফ ১৮:৫০]

সুতরাং তাকে (ইবলিশ কে) প্রত্যাখ্যাত ফেরেশতা অথবা ফেরেশতাদের একজন মনে করা ভুল হবে। জিনদের অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণত তাদেরকে তিন শ্রেণীর ভাগ করা যেতে পারে ।

রাসুল (সঃ) বলেন,

"তিন রকম জিন আছেঃ এক রকম যারা সারাক্ষণ আকাশে উড়ে, অন্য আর এক রকম যারা সাপ এবং কুকুর হিসাবে বিদ্যমান এবং পৃথিবীর উপর বসবাসকারী আর এক রকম যারা একস্থানে বাস করে অথবা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়।" [আত্ তাবারী এবং আল্-হাকিম কর্তৃক সংগৃহিত]

আল্লাহ সূরা আল-জিন এ বিশ্বাসী জিনদের সম্বন্ধে বলেনঃ

"বল,আমার প্রতি প্রেরিত হইয়াছে যে, জ্বীনদিগের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়াছে এবং বলিয়াছে,আমারাতো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবন করিয়াছি। যাহা সঠিক পথ -নির্দেশ করে;ফলে আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। আমরা কখনও আমাদিগের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থির করিব না এবং নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদিগের প্রতিপালকের মর্যাদা, তিনি গ্রহণ করেন নাই কোন পত্মী এবং না কোন সন্তান। এবং যে আমাদিগের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহর সম্বন্ধে অতি অবাস্তব উক্তি করিত।" [সুরা আল্-জিন ৭২:১-৪]

আল্লাহ আরো বলেন,

"আমাদিগের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক সীমালংঘনকারী;যাহারা আত্মসমর্পণ করে তাহারা সুচিন্তিতভাবে সত্য পথ বাছিয়ে লয়। অপরপক্ষে,সীমালংঘনকারী তো জাহান্নামেরই ইন্ধন।" [সুরা আল্-জিন ৭২:১৪-১৫]

জ্বীনদের মধ্যে অবিশ্বাসীদের বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয়ঃ ইফরিত্, শয়তান, ক্বারিন, অপদেবতা, অশুভ আত্মা, আত্মা, ভূতপ্রেত ইত্যাদি। তারা বিভিন্নভাবে মানুষকে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করে। যারাই তাদের কথা শুনে এবং তাদের জন্য কাজ করে তাদেরকেই মানব শয়তান বলে উল্লেখ করা হয়।

আল্লাহ বলেছেনঃ

"এইরূপে মানব ও জ্বীনের মধ্যে শয়তানদিগকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করিয়াছি।" [সুরা-আল্-আন্'আম ৬:১১২]

রাসুল (সঃ) এই সম্পর্ককে এভাবে বর্ণনা দিয়েছেন,

"তোমাদের প্রত্যেককে জিনদের মধ্য হতে একজন করে সঙ্গী জীন দেয়া হয়েছে।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, "এমনকি আপনাকেও ইয়া আল্লাহর রাসুল (সঃ)? তিনি বলেনঃ এখন সে আমাকে শুধু ভাল কাজ করতে বলে।" [SAHIH MUSLIM]

আল্লাহ বলেন-

"সুলায়মানের সম্মুখে সমবেত করা হইল তাহার বাহিনীকে-জিন,মানুষ ও বিহংগকুলকে এবং উহাদিগকে বিন্যস্ত করা হইল বিভিন্ন ব্যূহে।" [সুরা আন-নামল ২৭:১৭]

সুলায়মান (আঃ) ব্যতিত অন্য কাউকে এই ক্ষমতা প্রদান করা হয় নাই। সুলায়মান (আঃ) ব্যতিত অন্য কাউকে জ্বীন নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেয়া হয়নি এবং কেউ পারেও না।

রাসুল (সঃ) বলেছেন,

"যথার্থই গত রাতে জ্বীনদের মধ্যে হতে একজন ইফরিত (একটি বলিষ্ঠ অথবা খারাপ জিন)" আমার সালাত ভেঙ্গে দেবার জন্য থু থু নিক্ষেপ করেছিল। যাহোক আল্লাহ তাকে পরাভূত করতে আমাকে সাহায্য করেন এবং যাতে তোমরা সকালে তাকে দেখতে পারো সে জন্য তাকে আমি মসজিদের একটি স্তম্ভের সঙ্গে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলাম। অতঃপর আমার ভ্রাতা সোলাইমানের দোয়া মনে পড়লঃ

"হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য যাহার অধিকারী আমি ছাড়া কেহ না হয়।" [সুরা সাদ ৩৮:৩৫]

মানুষ জিনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম নয় কারণ এই বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতা শুধু পয়গম্বর সোলায়মানকে দেয়া হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, আছর অথবা ঘটনাক্রম ছাড়া জ্বীনদের সাথে যোগাযোগ হওয়া বেশীর ভাগ সময়ই নিষিদ্ধ বা ধর্মদ্রোহী কাজের মাধ্যমেই হয়। [আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস্ এর Ibn taymeeyah`s Essay on the Jinn:: রিয়াদ তৌহিদ প্রকাশনী,১৯৮৯,পৃ.২১]

এভাবে তলব করে আনা দুষ্ট জিন তাদের সঙ্গীদের গুনাহ করতে এবং স্রষ্টাকে অবিশ্বাস করতে সাহায্য করতে পারে। তাদের লক্ষ্য হল স্রষ্টা ছাড়া অথবা স্রষ্টার পাশাপাশি অন্যকে উপাসনা করার মত গুরুতর গুনাহ করতে যত বেশী জনকে পারা যায় তত জনকে আকৃষ্ট করে। একবার গণকদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং চুক্তি হয়ে গেলে, জ্বীন ভবিষ্যতের সামান্য কিছ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জানাতে পারে।

রাসুল (সাঃ) বর্ণনা দিয়েছেন জ্বীনরা কিভাবে ভবিষ্যত সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করে। তিনি বর্ণনা দেন যে,

জিনরা প্রথম আসমানের উপর অংশ পর্যন্ত ভ্রমণ করত এবং ভবিষ্যতের উপর কিছু তথ্যাদি যা ফিরিশতারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত তা শুনতে সক্ষম হত। তারপর তারা পৃথিবীতে ফিরে এসে তাদের পরিচিত মানুষের কাছে ঐ তথ্যগুলি পরিবেশন করত। [SAHIH MUSLIM, ENGLISH TRANS, VOL.4, P.1210, NO, 5538]

মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুওত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত এই ধরণের বহু ঘটনা সংঘটিত হত। এবং গণকরা তাদের তথ্য প্রদানে নির্ভূল ছিল। তারা রাজকীয় আদালতে আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল এবং প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।এমনকি পৃথিবীর কিছু অঞ্চলে তাদের পূজাও করা হত।

রাসুল (সাঃ) কর্তৃক ধর্ম প্রচার শুরু করার পর হতে অবস্থার পরিবর্তন হয়। আল্লাহ ফিরিশতাদের দিয়ে আসমানের নীচের এলাকা সতর্কতার সঙ্গে পাহাড়া দেবার ব্যবস্থা করলেন। তারপর হতে বেশীরভাগ জ্বীনদের উল্কা এবং ধাবমান নক্ষত্ররাজি দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হত। আল্লাহ এই বিস্ময়কর ঘটনা কোরআনের ভাষায় বর্ণনা করেছেনঃ

“এবং আমরা চাহিয়াছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করিতে কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কা পিন্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ ;আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাটিতে সংবাদ শুনিবার জন্য বসিতাম কিন্ত এখন কেহ সংবাদ শুনিতে চাহিলে সে তাহার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জলন্ত উল্কা পিন্ডের সম্মুখীন হয়।” [সূরা আল-জ্বিন ৭২:৮-৯]

আল্লাহ আরও বলেনঃ

"প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হইতে আমি উহাকে রক্ষা করিয়া থাকি; আর কেহ চুরি করিয়া সংবাদ শুনিতে চাহিলে উহার পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা।" [সূরা আল হিজর ১৫:১৭-১৮]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, [SAHIH AL-BUKHARI]

"যখন রাসুল (সাঃ) এবং তাঁর একদল সাহাবা উকাধ বাজারের দিকে রওয়ানা হলেন, তখন শয়তানদের ঐশী খবরাখবর শোনায় বাধা প্রদান করা হল। উল্কাপিন্ড তাদের উপর ছেড়ে দেয়া হল। ফলে তারা তাদের লোকদের কাছে ফিরে এল। যখন তাদের লোকরা জিজ্ঞাসা করল কি হয়েছিল, তারা তাদের জানালো। কেউ কেউ পরামর্শ দিল যে নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে, কাজেই তারা কারণ খুজে বের করার জন্য পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের কয়েকজন রাসুল (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবাগণের সালাত রত অবস্থা দেখতে পেল এবং তারা তাদের কোরআন পড়া শুনলো। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল যে নিশ্চয় এটাই তাদের শোনায় বাধা প্রদান করেছিল। যখন তারা তাদের লোকদের মধ্যে ফিরে গেল তখন তারা বলল,

"আমরা তো এক বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করিয়াছি। যাহা সঠিক পথ নির্দেশ করে, ফলে আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। আমরা কখনও আমাদিগের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থির করিব না।" [সুরা আল জিন ৭২:১-২]

এইভাবে রাসূল (সাঃ) কর্তৃক ধর্ম প্রচারের পূর্বে জিনরা যেভাবে সহজে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খবরাখবর সংগ্রহ করত তা আর পারেনি। ঐ কারণে তারা এখন তাদের খবরাখবরের সঙ্গে অনেক মিথ্যা মিশ্রিত করে।

আয়শা (রাঃ) তখন উল্লেখ করলেন যে গণকরা কখনও কখনও যা বলে সত্য হয়।

রাসুল (সঃ) বলেন,

"ওতে সত্যতার কিছু অংশ যা জিনরা চুরি করে এবং তার বন্ধুর কাছে বলে কিন্তু সে এর সাথে একশটি মিথ্যা যোগ করে। "আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা দেন যে তিনি আল্লাহর

রাসূলের (সঃ) কাছে গণকদের সম্বন্ধে জিজ্ঞসা করলে তিনি উত্তর দেন যে ওরা কিছু না। [SAHIH AL- BUKHARI,]

একদিন উমর ইবনে আল খাত্তাব যখন বসে ছিলেন তখন একটি সুদর্শণ লোক তার পাশ দিয়ে চলে গেলে তিনি বললেন, আমার যদি ভূল না হয় লোকটি এখনও প্রাক ইসলামি ধর্ম অনুসরণ করছে অথবা বোধ হয় সে তাদের একজন গণক। তিনি লোকটি কে তার সামনে আনতে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি তার অনুমান সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলেন। লোকটি উত্তর দিল, আমি আজকের মত আর কোন দিন দেখিনি যেদিন মুসলিম এই ধরণের অভিযোগের সম্মূখীন হয়েছে। উমর (রাঃ) বললেন,অবশ্যই আমাকে তোমার অবহিত করা উচিত। লোকটি তখন বলল, অজ্ঞতার যুগে আমি তাদের গণক ছিলাম। ঐ কথা শুনে উমর জিজ্ঞাসা করলেন,তোমার মহিলা জ্বীন তোমাকে সব চেয়ে বিস্ময়কর কি বলেছে। লোকটি তখন বলল,একদিন আমি যখন বাজারে ছিলাম,সে (মহিলা জ্বীন) উদ্বিগ্ন হয়ে আমার কাছে এসেছিল এবং বলেছিল মর্যাদাহানি হবার পর তুমি কি জ্বীনদের হতাশাগ্রস্থ অবস্থায় দেখনি? তুমি কি দেখনি তাদেরকে (জ্বীনদেরকে) মাদী উট ও তাতে আরোহণকারীদের অনুসরণ করতে? উমর বাধাদান পূর্বক বললেন,এটা সত্য। [Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol.5, p.131-2. no.206]

জিনরা তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী মানুষকে আপতঃ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবহিত করতে সক্ষম । উদাহরণস্বরূপ,যখন কেউ একজন গণকের কাছে আসে সে আসার আগে কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তা গণকের জ্বীন আগত লোকটির ক্বারিনের (প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে নিয়োজিত জ্বীন) কাছ থেকে জেনে নেয়। সুতরাং গণক লোকটিকে বলতে সক্ষম হয় যে সে এটা করবে অথবা অমুক অমুক যায়গায় যাবে। এই প্রক্রিয়ায় একজন সতিকার গণক অপরিচিত লোকের অতীত পরির্পূণ ভাবে জানতে সক্ষম হয়। সে একজন অচেনা ব্যক্তির পিতার নাম, কোথায় জন্ম গ্রহণ করেছিল এবং তার ছেলে বেলার আচারণ ইত্যাদি সম্বন্ধে বলেতে সক্ষম হয়। অতীত সম্বন্ধে পরিপূর্ণ বর্ণনা দেবার ক্ষমতা জ্বীন এর সঙ্গে মুহুর্তের মধ্যে বহু দুরত্ব অতিক্রম করতে এবং

গোপন বিষয় হারানো জিনিস, অদেখা ঘটনা বলি সম্বন্ধে বহু তথ্যাদি সংগ্রহ করতেও সক্ষম।

কোরআনে বর্ণিত পয়গম্বর সুলায়মান এবং সিবার রাণী, বিলকিসের গল্পের মধ্যে এই ক্ষমতার সত্যতা পাওয়া যায়।

যখন রাণী বিলকিসের গল্পে এলেন, তিনি একটি জ্বীনকে রাণীর দেশ থেকে তার সিংহাসন নিয়ে আসতে বললেন। "এক শক্তিশালী জিন বলল,আপনি আপনার স্থান হইতে উঠিবার পূর্বে আমি উহা আনিয়া দিব এবং এই ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান বিশ্বস্ত। [সূরা আন নামল, ২৭:৩৯]

বৃষ্টি কেন হয় ! বিজ্ঞান এবং কোরআন কি আলাদা কিছু বলে?

এ বিষয়টি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত একটি রহস্যময় ব্যাপার ছিল। আবহাওয়া নির্ণয়ের জন্য কেবলি সেদিন যখন রাডার আবিষ্কৃত হলো, তার পর পরই জানা গেল বৃষ্টি উৎপন্ন হওয়ার পর্যায়গুলো । সে অনুসারে বৃষ্টি উৎপন্ন হয় তিনটি পর্যায়ে। এমনকি ১৬০০শ শতাব্দির সূচনা লগ্নে বিজ্ঞানী ফ্লেজ মিলিটেস তিনি Hydrological science সম্পর্কে সর্বপ্রথম যে তত্বটি উপস্থাপন করেছিলেন তা ছিল অসম্পূর্ন। বেশ কয়েকটি ধাপের বর্ননা তারঁ তত্বে অনুপস্থিত ছিল তার মধ্যে মেঘে ঠান্ডা বায়ুর উপস্থিতি ও বাস্পের স্তরীভূত হওয়ার ব্যাপারটি উল্লেখ ছিলনা যা কুরআন ১৪৩০ বৎসর আগে উল্লেখ করেছে।

প্রথমতঃ বাস্পীভূত জল রৌদ্র বা বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে উপরে বাতাসে উঠে আসে, এরপর মেঘমালা উৎপন্ন হয় আর অবশেষে বৃষ্টিকণা দেখা দেয়। কোরআনে প্রদত্ত বৃষ্টি উৎপাদনের বর্ণনাটি ঠিক এ পদ্ধতিরই উল্লেখ করেছে।

একটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা   ব্যাপারটি এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

তিনি আল্লাহ, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালাকে সঞ্চারিত করে। অতঃপর তিনি মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। এরপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টিধারা। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা পৌঁছান; তখন তারা আনন্দিত হয়। (কোরআন, ৩০: ৪৮)

030.048 It is Allah Who sends the Winds, and they raise the Clouds: then does He spread them in the sky as He wills, and break them into fragments, until thou see rain-drops issue from the midst thereof: then when He has made them reach such of his servants as He wills behold, they do rejoice!- Al-Qur’an

এবার চলুন আয়াতে বর্ণিত এই পর্যায়গুলো আরো প্রযুক্তিগতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখিঃ প্রথম পর্যায়ঃ “তিনি আল্লাহ, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন ”

সমুদ্রের ফেনায় উৎপন্ন বায়ুর অসংখ্য বুদ্বুদ্ বিরামহীনভাবে ফেটে গিয়ে পানির কণাসমূহকে আকাশের দিকে বিক্ষিপ্ত করে। এরপর লবণে পরিপূর্ণ এই কণাগুলো বাস্পীভূত হয়ে উপরে অর্থাৎ বায়ুমন্ডলে উঠে যায়। এই কণাগুলো (এরোসল নামে) পানির ফাঁদ হিসেবে কাজ করে আর নিজেদের চারদিকে পানি বাস্প জড়ো করে উৎপন্ন করে মেঘকণা। তৈরী মেঘে পানি কণাগুলো বাতাসে ঝুলে থাকে আর পরে সেগুলো ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টি সৃষ্টি করে। এসবগুলো পর্যায়ই কোরআনে বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ ''অতঃপর তিনি মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন'' বাতাসে ভাসমান লবণ স্ফটিক কিংবা ধূলিকণার চারদিকের পানি কণিকা ঘনীভূত হয়ে উৎপন্ন হয় মেঘমালা। কেননা মেঘমালায় বিদ্যমান পানি কণাগুলো অত্যন্ত ক্ষুদ্র (.০১-.০২মিলি মিটার ব্যাস) হওয়ায় মেঘসমূহ বাতাসে ঝুলে থাকে আর আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই মেঘে পরিপূর্ণ হয়ে ঢেকে যায় আকাশ।

তৃতীয় পর্যায়ঃ " তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে নির্গত হয়ে আসে বৃষ্টিধারা ।" লবণ স্ফটিক কিংবা ধূলিকণার চারিদিকে ঘিরে বিদ্যমান পানিকণাগুলো ঘন ও ভারী হয়ে তৈরি করে বৃষ্টির কণা। এরপর বাতাসের চেয়ে ভারী বৃষ্টিকণাগুলো মেঘ থেকে সরে আসে এবং বৃষ্টিধারা হিসেবে মাটিতে নেমে আসতে শুর করে। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে, বৃষ্টি উৎপাদনের প্রতিটি ধাপই কোরআনের আয়াতসমূহে বর্ণিত রয়েছে। একদম সঠিক অনুক্রমে বা একটার পর আরেকটি পর্ব অত্যন্ত সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভূপৃষ্ঠে বিদ্যমান অন্যান্য বিষয় বা বস্তুর ন্যায় এ বিষয়টির সবচেয়ে সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন

মহান আল্লাহ তাআলা আর এভাবেই মানুষ বৃষ্টির পর্যায়গুলো উদঘাটন করার শত শত বছর পূর্বেই আল্লাহ তাআলা সে সম্বন্ধে মানুষকে অবগত করেন। অন্য একটি আয়াতে বৃষ্টির উৎপাদন সম্পর্কে নিম্নের তথ্যটি দেয়া হয়েছেঃ

024.043 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَبْصَارِ

তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন। তারপর মেঘগুলোকে একত্র করেন এবং পরে তা পুঞ্জীভূত করেন স্তরে স্তরে ; অতঃপর তুমি দেখতে পাও যে, সে মেঘের মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টি। আর তিনি আসমানসি ত পাহাড়সদৃশ মেঘমালা থেকে বর্ষণ করেন শিলা সরিয়ে দেন। সে মেঘের বিদ্যুতের চমক এমন, যেন মনে হয় দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়। (সূরা নূরঃ ৪৩)

See thou not that Allah makes the clouds move gently, then joins them together, then makes them into a heap? – then wilt thou see rain issue forth from their midst. And He sends down from the sky mountain masses (of clouds) wherein is hail: He strikes there with whom He pleases and He turns it away from whom He pleases, the vivid flash of His lightning well-nigh blinds the sight. Al-Qur'an, 024.043 (An-Noor [The Light])

বিজ্ঞানীগণ মেঘমালার প্রকার পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে বৃষ্টির মেঘ উৎপত্তির এক বিস্ময়কর ফলাফলের মুখোমুখী হন। সুনির্দিষ্ট সিস্টেম ও পর্যায়সমূহের মধ্য দিয়ে তৈরী হয় ও আকার ধারণ করে বৃষ্টির মেঘমালা। স্তরে স্তরে মেঘমালা এক ধরণের মেঘ যা নিম্নের পর্যায়গুলোতে ধাপে ধাপে বিন্যাস হয়।

১নং পর্যায়ঃ মেঘমালাসমূহ সঞ্চালিত হয়ে থাকে বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে মেঘমালা বাহিত হয়ে থাকে।২নং পর্যায়ঃ সংযোগীকরণ, পুঞ্জীভূতকরণএর পর বায়ুবাহিত ক্ষদ্র ক্ষুদ্র মেঘমালা একত্রিত হয়ে তৈরি করে বৃহত্তর মেঘ।৩নং পর্যায়ঃ বাস্পীকৃত হওয়া ছোট ছোট মেঘমালা একত্রে সংযুক্ত হলে বিশাল মেঘমালার মাঝে Updraft বেড়ে যায়। এই Updraft মেঘমালার প্রান্তভাগের চেয়ে অভ্যন্তরভাগে বেশী জোরালো। এ প্রক্রিয়াতে মেঘগুলো খাড়াখাড়িভাবে বা লম্বালম্বিভাবে জমা হয়ে বাড়তে থাকে।

এভাবেই মেঘমালাসমূহ স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়। মেঘের এই খাড়া বৃদ্ধি মেঘকে বায়ুমন্ডলের শীতলতর সানের দিকে টেনে নিয়ে যায়, সেখানেই উৎপন্ন হয় পানিবিন্দু আর শিলা – এগুলোই বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় আকাশে। যখন এই শিলা ও পানি বিন্দুগুলি বেশী ভারী হয়, যখন মেঘের এই ওজন আর বহন করতে পারে না তখন মেঘ থেকে এরা মাটিতে পতিত হতে থাকে বৃষ্টি, শিলা ইত্যাদিরূপে। মেঘের Updraft এর ফলে স্তরে স্তরে মেঘমালা লম্বালম্বিভাবে বৃদ্ধি পায়। লম্বালম্বি বৃদ্ধির ফলে মেঘদেহটিকে বায়ুমন্ডলের অধিকতর ঠান্ডা অঞ্চলে টেনে নিয়ে যায় যেখানে বৃষ্টি কণা,

শিলাবৃষ্টি তৈরি হতে থাকে, বৃদ্ধি পেতে থাকে। যখন বৃষ্টিকণা আর শিলাবৃষ্টি অতিরিক্ত ভারী হয়ে যায় তখন মেঘের এই Updraft আর মেঘমালাসমূহকে ধারণ করতে না পারায় মেঘগুলো হতে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি নীচে পতিত হতে থাকে। ১৪০০ বছর আগে পবিত্র কোরআনে সূরা নূরের ৪৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছিলেন,

" .....তারপর মেঘগুলোকে একত্র করেন এবং পরে তা পুঞ্জীভূত করেন স্তরে স্তরে : অতঃপর তুমি দেখতে পাও যে সে মেঘের মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টি।"

প্লেন, উপগ্রহ. কম্পিউটার এমনতর উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে আবহাওয়াবিদগণ কেবলি অতি সম্প্রতি মেঘ উৎপাদন, গঠন আর কার্যাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরেছেন – এ বিষয়টি আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত। এটি স্পষ্ট যে, আল্লাহ এমন একটি তথ্য দিয়েছেন যা ১৪০০ বছর পূর্বে মানুষের জানা ছিল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘমালাসমূহ (পুঞ্জীভূত মেঘমালা) বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে বাহিত হয়ে সংযুক্ত হয় যা নীচের আয়াতটিতে বর্ণিত রয়েছেঃ

"..... আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন। তারপর মেঘগুলোকে একত্র করেন এবং রে তা পুঞ্জীভূত করেন স্তরে স্তরে.........।"

শীত হোক ইবাদতের বসন্তকাল

ঋতুরঙ্গময়ী বঙ্গজননীর অঙ্গ এখন যে ঋতুররূপমাধুর্যে সজ্জিত তার নাম – শীতকাল। হাড় কাঁপানো হিমবায়ু আর ভারীকুয়াশা শীতের প্রধান রূপ হলেও শীত মানেই যে নির্জীব, শুষ্কও কঠিন প্রকৃতির এমনটা নয়। বরং শীতেরও রয়েছে এমন কিছু বিচিত্র

রূপ, যামানব হৃদয়ে জাগায় আনন্দের শিহরণ। শিত ! মাকড়সার জালের মতো শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন সন্ধ্যা, রাতভরসেই কুয়াশার টুপটাপ ছন্দিত বিন্দুরা বৃক্ষপল্লবে ঢেলে দেয় রুপালি আবরণ। সকালেতেজহীন সূর্যের মিষ্টি রোদ কুয়াশাভেজা সবুজ পাতায় যে দৃশ্য আঁকে, সেমনোমুগ্ধকর দৃশ্য ভালো লাগে না কার? একটুখানিনিবিড় দৃষ্টি দিলেই মনে হয়, এ যেন এক হিরেখচিত সবুজ গালিচা। আবারপড়ন্ত বিকেলের মৃদু হিমেল শীতকে

করে তোলে আরো গীতময়। পৌষ আর মাঘ – এইদুই মাস মিলে শীতের ব্যাপ্তিকাল হলেও শীতের আগমনী সুর বেজে ওঠে অগ্রহায়ণের শেষদিকেই।শীত এবং শীতের অভিভূত কুয়াশার রূপ প্রকৃতিকে সজ্জিত করে নতুন আঙ্গিকে।কুয়াশায় ঢেকে থাকা গ্রাম, ফসলের ক্ষেত, ছোট্টনদী অথবা কাছে ও দূরের পাহাড় কিংবা বনভূমির দৃশ্যকল্প দাগ কাটে হৃদয়ের গহিনে।শীতের আরেকটি নান্দনিকতা হচ্ছে অতিথি পাখি। অতিথি পাখির কলকাকলিতে শীতের প্রকৃতিহয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। প্রতিবছর শীত এলে হিমালয় পেরিয়ে আমাদের দেশে উড়ে আসে সোনাজঙ্গ, কুনচুষি, বাতারণ, শাবাজ, জলপিপি, বালিহাঁস, হরিয়াল, রাজশকুন, তিলেময়না, রামঘুঘু, খঞ্জনা, বালিহাঁস, চকাচকি, বুনোহাঁস, সারস, হেরন, ডুবুরিপাখি, কাদাখোঁচা, রাজসরালি, টিকিহাঁস, পাতিকুট, কালামাথা, গাঙচিলইত্যাদি নামের নানা রংবেরঙের অতিথি পাখি।এ পরিযায়ী পাখিরা আমাদের মেহমান। এরা অনেক দূর থেকে ছুটে আসেআমাদের প্রকৃতিকে কলকাকলিতে ভরিয়ে দিতে। হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে ওরা আমাদের কাছেআসে নিরাপদ আশ্রয়ের প্রত্যাশায়। কিন্তু তাদের সে প্রত্যাশার চোখে বন্দুকের নল তাককরতে আমাদের হাত কেঁপে ওঠে না। অনিন্দ্য সুন্দর এসব পাখির কারুকার্যখচিত ডানা থেকেরক্ত ঝরানোতেই যেন আমাদের যত আনন্দ। এই অবুঝ প্রাণীগুলোর মায়াবী চাহনিতেও আমাদেরঅন্তরে সামান্য মায়ার উদ্রেক হয় না। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে অকারণে পাখি হত্যা করাজ ঘন্য অপরাধ।শীত এর এই কালে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অপার কৃপায় জমিনে জন্মে প্রচুরপরিমাণে শাকসবজি। এতে চাষিদের মুখে যেমন ফুটে ওঠে হাসির রেখা, তেমনিসাধারণ মানুষও স্বল্পমূল্যে টাটকা শাকসবজি খেয়ে হয়ে ওঠে চনমনে। শীতকালীন শাকসবজিরমধ্যে রয়েছে ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, ব্রোকলি, গাজর, শালগম, টমেটো, শিম, চিনাবাঁধাকপি, লালবাঁধাকপি, ফ্রেঞ্চবিনসহআরো নানা সবজি! এর সঙ্গে রয়েছে লালশাক, পালংশাক, ঢেঁকিশাক, মুলাশাকইত্যাদি। আর এ সব কিছুই আল্লাহ তাআলার অশেষ দান।

রাসুল ﷺ বলেছেন – “যেকেউ যথাযথ কারণ ছাড়া কোনো পাখি হত্যা করবে, কিয়ামতেরদিন আল্লাহ তার হিসাব নেবেন।” (১)

শীতকালে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অপার কৃপায় জমিনে জন্মে প্রচুরপরিমাণে শাকসবজি। এতে চাষিদের মুখে যেমন ফুটে ওঠে হাসির রেখা, তেমনিসাধারণ মানুষও স্বল্পমূল্যে টাটকা শাকসবজি খেয়ে হয়ে ওঠে চনমনে। শীতকালীন শাকসবজিরমধ্যে রয়েছে ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, ব্রোকলি, গাজর, শালগম, টমেটো, শিম, চিনাবাঁধাকপি, লালবাঁধাকপি, ফ্রেঞ্চবিনসহআরো নানা সবজি! এর সঙ্গে রয়েছে লালশাক, পালংশাক, ঢেঁকিশাক, মুলাশাকইত্যাদি। আর এ সব কিছুই আল্লাহ তাআলার অশেষ দান।

এপ্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন – "মানুষতার খাদ্যের প্রতি লক্ষ করুক। আমি তো অঝর ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করেছি। অতঃপর মাটিকেবিদীর্ণ করেছি। আর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্যাদি, আঙুর, শাকসবজি, জলপাই, খেজুর, বহুবৃক্ষবিশিষ্ট বাগান, ফলফলাদি ও ঘাস। এসব তোমাদের ও তোমাদেরপালিত পশুকুলের জীবনধারণের জন্য।" (২)

শীত-কাল ব্যস্ততম মানুষের জীবনে নিয়ে আসে একটুখানি অবসর আরআনন্দ-উৎসবের বারতা। শীত এলে গ্রামাঞ্চলের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে শুরু হয় পিঠাপুলিরধুম। শীতের সকালে মিষ্টি রোদে বসে গরম গরম ভাপা, রসেডোবানো চিতই, পাটিসাপটা অথবা পুলিপিঠা খাওয়ার মজাইযে আলাদা। শীতকালের একটি বিস্ময়কর নেয়ামত হলো খেজুরের রস। কী এক আশ্চর্য মহিমায়আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা এই শক্ত গাছ থেকে তরল সুমিষ্ট পানি বের করে আনেন। যা ভাবলেসত্যিই বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। আসলে এই বিশ্বচরাচরের প্রতিটি সৃজনেই মুমিনদের জন্যরয়েছে রাব্বুল আলামিনের অনন্য নিদর্শন। যা পবিত্র কোরআনেও ইরশাদ হয়েছে বারবার।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন – "আর তোমাদের সৃষ্টিতে এবং চারদিকে ছড়িয়ে রাখা জীবজন্তুর সৃজনের মধ্যেও নিদর্শনাবলিরয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য।" (৩)

শীত-কাল একটি আদর্শ ঋতু। তাই শহর-নগর ও গ্রামাঞ্চলে শীত এলেআয়োজন করা হয় নানা উৎসবের। তবে সব উৎসবেই মুসলমানদের জন্য ঢালাওভাবে অংশগ্রহণ

করাসমীচীন নয়। এই যেমন উৎসবের নামে নারী-পুরুষের অবাধ অংশগ্রহণে যাত্রাপালা, গ্রামীণমেলা, বাউলগানের মতো গুনাহর কাজ। কেননা এসব নাজায়েজ কাজ সিরাতুল মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুতিঘটিয়ে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে। একটা সময় ছিল, যখনমুসলমানরা না বুঝে এসব গুনাহর কাজে শামিল হতো। আলহামদুলিল্লাহ! মানুষজন এখন সেসব গুনাহর পরিবর্তে নেক আমলেরদিকে অগ্রসর হচ্ছে। এখন গ্রামে গ্রামে আয়োজন করা হচ্ছে ওয়াজ মাহফিলের। এতে করেমুসলমানরা তাদের ঈমান-আকিদা ও আমলের সংশোধন করার পাশাপাশি পরকালের পাথেয় সংগ্রহেরসহজ পন্থাও অবলম্বন করতে পারছে। তবে লক্ষ রাখতে হবে, এসবওয়াজ মাহফিল যেন আড়ম্বরপূর্ণ ও বিনোদনের উদ্দেশ্যে না হয়। এই মাহফিলগুলো যেন হয়আল্লাহর সন্তুষ্টি ও হেদায়েতের মাইলফলক। (৪)

হাদিসে এসেছে, শীতকাল হচ্ছে মুমিনের জন্য ইবাদতেরবসন্তকাল। হজরত আমের ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনিনবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। নবীজি বলেছেন – "শীতলগনিমত হচ্ছে শীতকালে রোজা রাখা।" (৫)

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় খাত্তাবি (রহ.) বলেন – "শীতলগনিমত মানে সহজলভ্য গনিমত। যেহেতু শীতের রোজায় রোজাদার গরমের তৃষ্ণা অনুভব করে না।"

এ প্রসঙ্গে ইমাম গাজালি (রহ.) বলেন – "আল্লাহরপ্রিয় বান্দাদের জন্য শীতকালের চেয়ে প্রিয় কোনো সময় আছে কি না আমার জানা নেই। কারণশীতের দিনগুলো ছোট থাকে আর রাতগুলো বড় হয়। তাই দিনে রোজা রাখা আর রাতে নামাজেদাঁড়িয়ে থাকা সহজ হয়।' সুতরাং বলা যায়, শীতকালপ্রভুপ্রেমিকদের জন্য এক অনন্য নিয়ামত।" এ ছাড়া এই শীতকালে আমরা আরো অনেক রকমের নেক আমল করতে পারি। যেমন– অসহায়দরিদ্রদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ানো। এই যে আমাদের চারপাশে অসংখ্য মানুষ আছে, যারাঠিকমতো দুই বেলা খেতে পায় না, এই হাড় কাঁপানো শীতেও যাদের একটি গরমকাপড় কেনার সামর্থ্য নেই, আমরা কিন্তু ইচ্ছা করলেই এই অসহায়মানুষদের কষ্ট লাঘব করতে পারি। আমাদের অনেকেরই তো তিন-চারটি করে শীতের পোশাকরয়েছে। আমরা যদি সেখান থেকে একটি পোশাক তাদের দান করি,

তাহলেতারা যতটা না খুশি হবে, দয়াময় আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তার চেয়েবহু গুণ খুশি হবেন। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে মানবসেবাই পরম ধর্ম। আর এ কথাইইসলামের প্রাণপুরুষ হজরত মুহাম্মদ ﷺ এইবিশ্বলোকে ছড়িয়ে দিয়ে বলেছেন – "যে মানুষেরপ্রতি দয়া করে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না।"(৬)

তাই আসুন, শীতের এই সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাই।শীতের এই দীর্ঘ রজনীকে ঘুমের রাজ্যেই বিলীন না করে দিই। গভীর রজনীতে প্রকৃতি যখন বিভোর থাকবে ঘুমের অরণ্যে, যখনডেকে উঠবে না কোনো নিশাচর, নড়বে না বৃক্ষপল্লব, তখনজেগে ওঠি প্রভুর সান্নিধ্যে। এই অস্থায়ী সুখকে তুচ্ছজ্ঞান করে পরকালীন চিরস্থায়ীসুখের প্রত্যাশায় আল্লাহর অদৃশ্য পায়ের সামনে দাঁড়াই অবনত মস্তকে।

❒ ফুটনোটঃ

[১] নাসাঈ, হাদিসনং ৪৪৪৫।

[২] সুরাহ আবাসা, আয়াত: ২৪-৩২।

[৩] সুরাহ জাসিয়া, আয়াত: ৪।

[৪] দ্রষ্টব্য – সুরায়েতাওবাহ, আয়াত: ১২২। ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২২৪। বায়হাকি, হাদিসনং ১৬৬৬।

[৫] তিরমিজি, হাদিসনং ৭৯৫।

[৬] সহিহ মুসলিম, হাদিসনং ২৩১৯।

লেখাঃ আমিনুল ইসলাম হুসাইনী (আল্লাহ্ তাকে উত্তম প্রতিদান দানকরুন!)

আল্লাহ এতো বিপদ কেন দেন ?

আমি অবশ্যই তোমাদেরকে কিছু না কিছু দিয়ে পরীক্ষায় ফেলবোই — আল-বাক্বারাহ ১৫৫

কু'রআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলো আমাদেরকে জীবনের বাস্তবতা মনে করিয়ে দেয়। কিছু আয়াত রয়েছে যা আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়: আমরা কীভাবে নিজেরাই নিজেদের জীবনটাকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দিই। আর কিছু আয়াত রয়েছে যা আমাদেরকে জীবনের সব দুঃখ, কষ্ট, ভয় হাসিমুখে পার করার শক্তি যোগায়। এরকম একটি আয়াত হলো—

আমি অবশ্যই তোমাদেরকে কিছু না কিছু দিয়ে পরীক্ষায় ফেলবোই: মাঝে মধ্যে তোমাদেরকে বিপদের আতঙ্ক, ক্ষুধার কষ্ট দিয়ে, সম্পদ, জীবন, পণ্য-ফল-ফসল হারানোর মধ্য দিয়ে। আর যারা কষ্টের মধ্যেও ধৈর্য-নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করে, তাদেরকে সুখবর দাও। [আল-বাক্বারাহ ১৫৫]

আমি অবশ্যই তোমাদেরকে কিছু না কিছু দিয়ে পরীক্ষায় ফেলবোই

আল্লাহ تعالى শুরু করছেন: وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ — আল্লাহ تعالى আমাদেরকে এই দুনিয়াতে কিছু না কিছু দিয়ে পরীক্ষা নেবেনই, নেবেন। এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি আরবিতে দুই বার জোর দিয়ে এ কথা বলেছেন। কারো বেলায় সেই পরীক্ষা হয়তো চাকরি হারিয়ে ফেলে অভাবে, কষ্টে জীবন পার করা। কারো বেলায় হয়তো বাবা-মা, স্বামী, স্ত্রী, সন্তানদের জটিল অসুখের চিকিৎসায় দিনরাত সংগ্রাম করা। কারো বেলায় হয়তো নিজেরই নানা ধরনের জটিল অসুখ। কারো বেলায় আবার জমি-জমা, সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়স্বজনদের সাথে শত্রুতা, শ্বশুর-শাশুড়ির অত্যাচার, দুশ্চরিত্র স্বামী, পরপুরুষে আসক্ত স্ত্রী, ড্রাগে আসক্ত ছেলে, পরিবারের মুখে কালিমা লেপে দেওয়া মেয়ে —কোনো না কোনো সমস্যায় আমরা পড়বোই। এই সমস্যাগুলো হচ্ছে আমাদের জন্য পরীক্ষা।

পৃথিবীতে আমরা এসেছি পরীক্ষা দিতে —এটা হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে বড় বাস্তবতা। হিন্দি সিরিয়াল, মিউজিক, ভিডিও গেম, রংবেরঙের পানীয়, হাজারো বিনোদন সবসময় আমাদেরকে চেষ্টা করে এই বাস্তবতাকে ভুলিয়ে দিতে। আমরা নিজেদেরকে প্রতিদিন নানা ধরনের বিনোদনে বুঁদ করে রেখে জীবনের কষ্ট ভুলে থাকার চেষ্টা করি। আমরা বিনোদনে যতই গা ভাসাই, ততই বিনোদনের প্রতি আসক্ত হয়ে যাই। যতক্ষণ বিনোদনে ডুবে থাকি, ততক্ষণ জীবনটা আনন্দময় মনে হয়। তারপর বিনোদন শেষ হয়ে গেলেই অবসাদ, বিরক্তি, একঘেয়েমি ঘিরে ধরে। ধীরে ধীরে একসময় আমরা জীবনের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠি। "কেন আমার নেই, কিন্তু ওর আছে?" "কেন আমারই বেলায় এরকম হয়, অন্যের কেন এরকম হয় না?" —এই সব অসুস্থ প্রশ্ন করে আমরা আমাদের মানসিক অশান্তিকে জ্বালানী যোগাই। এত যে অশান্তি, তার মূল কারণ হলো: আমরা যে এই জীবনে শুধু পরীক্ষা দিতে এসেছি —এই কঠিন বাস্তবতাটা ভুলে যাওয়া।

মাঝে মধ্যে তোমাদেরকে বিপদের আতঙ্ক, ক্ষুধার কষ্ট দিয়ে, জান, মাল, ফসল হারানোর মধ্য দিয়ে

আল্লাহ تعالى আমাদের কীভাবে পরীক্ষা নেবেন, তার কিছু উদাহরণ তিনি আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন। আমরা যদি ভালো করে বুঝে নিই পরীক্ষাগুলো কেমন হবে, তাহলে সেই পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আগে থেকেই আমরা তৈরি থাকবো। তারপর যখন পরীক্ষা শুরু হবে, তখন পরীক্ষা পার করা সহজ হয়ে যাবে। যারা জীবনে অনেকবার কঠিন বিপদে পড়েছেন, তারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে, যদি চিন্তা করে বের করা যায় কেন বিপদটা হয়েছে, কতদিন তা চলতে পারে এবং বিপদটা কীভাবে একসময় শেষ হয়ে যেতে পারে — তখন সেই বিপদটা ধৈর্য ধরে পার করাটা অনেক সহজ হয়ে যায়। একারণে পূর্বপ্রস্তুতি থাকলে জীবনটা সহজ হয়ে যায়।

ভয়

এই আয়াতে আল্লাহ تعالى ভয়ের জন্য خَوْف (খাউফ) ব্যবহার করেছেন। কু'রআনে বিভিন্ন ধরনের ভয়ের জন্য বারোটি আলাদা আলাদা শব্দ রয়েছে: اتقى, خشع, خشي, خاف,

اشفق, رعب, رهب, وجل, وجف, اوجس, راع, حذر —যার মধ্যে এই আয়াতে বিশেষভাবে খাউফ ব্যবহার করা হয়েছে, যা একটি বিশেষ ধরনের ভয়: আমাদের জীবনে কোনো একটা বিপদ এগিয়ে আসছে বা এসে গেছে, এবং আমরা তা নিয়ে ভয়ে, আতঙ্কে আছি —এটা হচ্ছে খাউফ।

এই ভয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক, পারিবারিক যে কোনো বিপদের ভয় হতে পারে। দেশের সরকার মুসলিমদের ধরে ধরে মেরে ফেলছে। কেউ মুখ খুলতে পারছে না। সত্য কথা বললে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেই মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে ভরা হচ্ছে, গুম করে ফেলা হচ্ছে। মুসলিমরা সবাই ভয়ে আছে। —এই ভয় হচ্ছে খাউফ। এটা একটা পরীক্ষা।

দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ উজাড় হয়ে যাচ্ছে। মহামারি, দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ছে। চারিদিকে মানুষের অভাব, অনটন, যে কোনো সময় গৃহযুদ্ধ লেগে যেতে পারে। খাবারের দাম বাড়তে বাড়তে কেনার সামর্থ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। এরকম চলতে থাকলে সামনেই অচিরেই পরিবার নিয়ে এক বেলা না খেয়ে দিন পার করতে হবে। —এই ভয় হচ্ছে খাউফ। এটা একটা পরীক্ষা।

ছেলে রাতের বেলা ঘরের দরজা বন্ধ করে কী জানি করে। মাঝে মধ্যে কোনো মেয়ের গলা শোনা যায়। দিনের বেলা বখাটে দেখতে কিছু বন্ধুর সাথে ঘোরাঘুরি করে। ছেলেটা নিশ্চয়ই একটা বাজে কিছুতে জড়িয়ে যাচ্ছে। কোনদিন না অসামাজিক কিছু করে ফেলে। লজ্জায় আর ঘরের বাইরে বের হওয়া যাবে না। মানুষ থু থু দেবে। —এই ভয় হচ্ছে খাউফ। এটা একটা পরীক্ষা।

ক্ষুধার কষ্ট

আরেকটি পরীক্ষা হচ্ছে ক্ষুধার কষ্ট। ক্ষুধার কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য মানুষ এমন কিছু নেই যা করে না। একজন দিনমজুরের মাথায় সারাদিন একটা চিন্তাই ঘুরে, কালকে সে খাবার কেনার মতো যথেষ্ট টাকা অর্জন করতে পারবে কি? একজন চাকুরীজীবী সবসময় দুশ্চিন্তায় থাকে: আমি মারা গেলে আমারা ছেলেমেয়েরা খেয়ে-পরে বাঁচতে

পারবে তো? একজন ব্যবসায়ীর মাথায় সবসময় হিসেব ঘুরতে থাকে: ব্যবসায় কতটা পর্যন্ত লোকসান হলে না-খেয়ে পথে বসতে হবে না। সকালে ঘুমের থেকে উঠে মাথায় চিন্তা আসে নাস্তায় কী খাবো, যা খেয়ে দুপুর পর্যন্ত ক্ষুধার কষ্ট লাগবে না। দুপুরে খাওয়ার সময় মাথায় চিন্তা আসে কত খেলে আর বিকেলে ক্ষুধার কষ্ট করতে হবে না, একবারে রাত পর্যন্ত থাকা যাবে। রাতে খাওয়ার সময় হিসেব চলে ফজরের সময় উঠলে আবার ক্ষুধা লেগে যাবে না তো?

খাবার কেনার মতো যথেষ্ট টাকা থাকবে কিনা –এই ভয়টা এতই কঠিন ভয় যে, ১৩-১৭ বছর বয়সীদের উপর গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে যে, ক্ষুধার কষ্টের ভয় তাদের মধ্যে মানসিক সমস্যা জন্ম দেওয়ার একটি অন্যতম কারণ। যে সমস্ত পরিবারের উঠতিবয়সী যুবক-যুবতীরা ক্ষুধার কষ্ট করে, তিন বেলা খাবার জোগাড় করতে গিয়ে বাবা-মার কঠিন সংগ্রাম দেখে, মাঝে মধ্যেই এক-দুই বেলা না খেয়ে ক্ষুধার কষ্টে দিন বা রাত পার করে, তাদের মনের মধ্যে ক্ষুধার কষ্টের ভয় ঢুকে যায়। এই ভয় থেকে এক সময় তাদের মধ্যে অস্থিরতা এবং নানা ধরনের মানসিক ব্যাধি দেখা দেয়।[২৯৭]

যারা জীবনে এক সময় অনেক অভাবে পার করেছেন, প্রতিটি দিন সংগ্রাম করতেন কীভাবে মাস চলবে, কীভাবে বাচ্চাদের খাওয়াবেন, তারা যখন একসময় গিয়ে স্বচ্ছল হন, তারপরেও তাদের অনেকের ভেতরে আবার অভাবের জীবনে ফিরে যাওয়ার আতঙ্ক চলে যায় না। ব্যাংক ব্যালেন্সে একটা শূন্য কমে গেলে বুক ধড়ফড় শুরু হয়ে যায়। কোনো একমাসে আয় একটু কম হলে আতঙ্ক শুরু হয়ে যায়। যদিও তাদের খাওয়া, পড়ার কোনোই সমস্যা নেই, আল্লাহ تعالى তাদেরকে কয়েক মাস বা বছর স্বচ্ছন্দে চলার মতো যথেষ্ট সম্পদ দিয়ে রেখেছেন, তারপরেও তাদের ভেতরে আগের সেই অভাবী জীবনের দুঃস্বপ্ন কাটে না। তারা চেষ্টা করলেও আল্লাহর تعالى প্রতি পুরোপুরি কৃতজ্ঞ হয়ে, মন থেকে অশান্তি দূর করে, শান্তির সাথে জীবন পার করতে পারেন না। ক্ষুধার কষ্ট, অভাবের জীবনের ভয় তাদেরকে সারাজীবন তাড়িয়ে বেড়ায়।

অনিশ্চয়তা

ভয় এবং ক্ষুধা — এই দুটির মধ্যে একটি সাধারণ ব্যাপার রয়েছে, তা হলো অনিশ্চয়তা। মানুষ নিশ্চয়তা অর্জনের জন্য পাগল, অনিশ্চয়তাকে তার কাছে অসহ্য। সবসময় চেষ্টা করে কীভাবে বেতনের নিশ্চয়তা, সমাজে স্ট্যাটাসের নিশ্চয়তা, ভাড়া বাড়ি ছেড়ে নিজের বাড়ির নিশ্চয়তা, নিরাপদে রাস্তায় চলার জন্য গাড়ির নিশ্চয়তা, লোন শোধ করার জন্য নিয়মিত আয়ের নিশ্চয়তা —এই সব অনিশ্চয়তাকে সবসময় নিশ্চিত করে রাখার জন্য বাবা-মা, সন্তান, আত্মীয়, বন্ধু, যে কোনো সম্পর্ককে উপেক্ষা করে হলেও মানুষ দিনরাত খাটতে রাজি আছে। কিন্তু তার জীবনে নিশ্চয়তা চাই-ই চাই।

মানুষের মস্তিষ্ক এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে, তা অনিশ্চয়তা সহ্য করতে পারে না। যখনি মস্তিষ্ক কোনো অনিশ্চয়তা হতে যাচ্ছে এই উপলব্ধি করে বসে, সাথে সাথে সেটি সতর্ক অবস্থায় চলে যায়। তখন অন্য সব চিন্তা বাদ দিয়ে সেই অনিশ্চয়তা কীভাবে দূর করা যায়, তা নিয়ে মস্তিষ্ক ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মানুষের মস্তিষ্ক হচ্ছে একটা বিরাট জটিল যন্ত্র, যার একটা মূল কাজ হচ্ছে সামনে কী হতে যাচ্ছে, তা আগে থেকেই ঠিক করে রাখা।[২৯১]

আমরা শুধু শুনি না, আমরা শুনি এবং একইসাথে চিন্তা করি সামনে কী শুনতে যাচ্ছি। আমরা শুধু দেখি না, আমরা দেখি এবং একইসাথে চিন্তা করি সামনে কী দেখতে যাচ্ছি। আমরা শুধুই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে ভবিষ্যৎ বোঝার চেষ্টা করি না। আমাদের দেহ প্রায় ৪০টি পারিপার্শ্বিক উৎস থেকে সবসময় সিগনাল প্রসেস করে। অবচেতনভাবে প্রায় ২০ লক্ষ ব্যাপার নিয়ে আমরা সবসময় ভাবছি ভবিষ্যৎ আগে থেকেই নিশ্চিত করার জন্য। কল্পনাতিত পরিমাণের তথ্য আমাদের মস্তিষ্ক প্রতি মুহূর্তে প্রক্রিয়া করছে, কারণ আমাদের মস্তিষ্ক সবসময় চেষ্টা করে ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার। এটি অনিশ্চয়তা একেবারেই পছন্দ করে না।[২৯১]

তথ্য আসক্তি

আধুনিক যুগে এক নতুন সমস্যা শুরু হয়েছে — তথ্য-আসক্তি। মানুষ প্রতিনিয়ত শত শত তথ্য গোগ্রাসে গিলছে, যদিও তার সেগুলোর কোনোই দরকার নেই। এর মূল কারণ: মানুষ এভাবে অনিশ্চয়তা দূর করে।[২৯২] ফেইসবুকে কেউ আমাকে নিয়ে কিছু বলল কিনা, কেউ আমার পোস্টে কমেন্ট করলো কিনা, কেউ আমার ছবিতে লাইক দিল কিনা —এই অনিশ্চয়তা দূর করার জন্য সে দিনের মধ্যে বহুবার ফেইসবুকে গিয়ে দেখে কিছু হলো না।

একইভাবে শেয়ার বাজারের দালাল, তথ্য প্রণেতারা ব্যাপক ব্যবসা করে নেয় আমাদের শেয়ার সম্পর্কে অনিশ্চয়তার সুযোগ নিয়ে। একটার পর একটা সংবাদ চ্যানেল, পত্রিকা চালু হচ্ছে কারণ আমরা অলিতে গলিতে, দেশে, বিদেশে, ডানপন্থী, বামপন্থী, শাসকদল, বিরোধী দল, নিরপেক্ষ দল সব দিকের সব রকম তথ্য জানতে চাই। অনেকে একটা পত্রিকা না রেখে দুটো-তিনটে পত্রিকা রাখেন, তিন-চারটা সংবাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে খবর পড়েন, পাছে কোনো একদিকের মত, কোনো একটা খবর তার অগোচরে থেকে যায়। একদিন রাতের খবর না দেখলে বুক ধড়ফড় শুরু হয়ে যায়, কী জানি হারিয়ে ফেললাম? এই তথ্য-আসক্তির মূল কারণ হলো অনিশ্চয়তা।

অনিশ্চয়তার নিশ্চয়তা

মানুষের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে হাজারো ব্যবসা শুরু হয়েছে মানুষকে নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য। লাইফ ইনস্যুরেন্স, বাড়ির লোন, গাড়ির লোন, মোবাইল ফোনের প্যাকেজ, ব্রডব্যান্ড কানেকশন, ওয়ারান্টি, গ্যারান্টি —এরকম হাজারো ভাবে মানুষকে নিশ্চয়তার লোভ দেখানো হচ্ছে। মার্কেটিং কোম্পানিগুলো শিখে গেছে কীভাবে এই অনিশ্চয়তাকে কাজে লাগিয়ে তাদের পণ্যের বিক্রি বাড়ানো যায়। তাদের বিজ্ঞাপনে প্রথমে মানুষকে এক অজানা, অনিশ্চয়তার ভয় দেখানো হয়। তারপর বেশি দামে, চড়া সুদে নিশ্চয়তা বিক্রি করা হয়। বোকা মানুষ নিশ্চয়তার এই মিথ্যা ফাঁদে পা দিয়ে জীবন

দুর্বিষহ করে ফেলে। নিশ্চয়তা কিনতে গিয়ে স্বাস্থ্য, সংসার, সন্তান, সুখ সব বিসর্জন দিয়ে দেয়।

আল্লাহ تعالى মানুষকে এই আয়াতে সাবধান করে দিচ্ছে যে, তিনি মানুষকে অনিশ্চয়তা দিয়ে পরীক্ষা নেবেনই। সুতরাং অনিশ্চয়তাকে জয় করার জন্য হারাম পথে পা দিয়ে কোনো লাভ নেই। এক দিকে অনিশ্চয়তা দূর করলে আরেক দিকে আসবে। মাঝখান থেকে সব অনিশ্চয়তাকে জয় করার মিথ্যা স্বপ্ন যেন মানুষকে শেষ করে না দেয়।

সম্পদ, জীবন, পণ্য-ফল-ফসল হারানো

এরপর আল্লাহ تعالى পরীক্ষা নেবেন সম্পদ, জীবন, পণ্য-ফল-ফসল হারানোর মধ্য দিয়ে। আমাদের পরিবার, আত্মীয়, বন্ধু ইত্যাদি নানা সম্পর্কের ভেতরে মৃত্যু আসবেই। এটাই স্বাভাবিক। মাঝে মাঝে কারো মৃত্যু হয়তো অল্প বয়সে হয়ে যায়। কারো হয়তো দুর্ঘটনা থেকে মৃত্যু হয়। আমরা তখন বলি ‘কপাল খারাপ’, ‘অকালে মৃত্যু’, ‘অপমৃত্যু’, ‘আহারে, বেচারা অল্প বয়সে মারা গেল’ ইত্যাদি —এগুলো সব ভীষণ রকমের ভুল কথা। মুসলিমদের কাছে কোনো ‘কপাল খারাপ’ নেই, ‘অকালে মৃত্যু’, ‘অপমৃত্যু’, ‘কম বয়সে’ মৃত্যু বলে কিছু নেই। এগুলো বিধর্মী এবং নাস্তিকদের ডিকশনারির শব্দ।

কারো কপাল কখনো খারাপ হয় না, আল্লাহ تعالى তার জন্য ঠিক যে সব সমস্যা হওয়ার কথা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন, তার জীবনে ঠিক তাই ঘটে। কারো অকালে মৃত্যু হয় না, তার ঠিক যে সময় মৃত্যু হওয়ার কথা, ঠিক তখনি মৃত্যু হয়। কারো অপমৃত্যু হয় না, বরং মু’মিন অবস্থায় দুর্ঘটনায় মারা গেলে সে শহীদ হয়ে মরে। তখন এর চেয়ে বড় প্রাপ্য তার জন্য আর কিছু হতে পারে না। কারো অল্প বয়সে মৃত্যু হয় না, পৃথিবীতে তার আয়ু সেটুকুই নির্ধারণ করা ছিল। সে ঠিক সময়মতো মারা গেছে, আগেও না, পরেও না। —এই সত্যগুলো আমরা যদি উপলব্ধি করি, তাহলে আমরা নিজেদেরকে অপেক্ষাকৃত কম কষ্ট দেবো, অন্যের মাঝেও অপেক্ষাকৃত কম কষ্ট ছড়াবো।

এরপর আসবে সম্পদ, ফল, ফসল হারানোর মধ্য দিয়ে। স্টক মার্কেট ধ্বসে যাবে। কেউ লোনে জর্জরিত হয়ে যাবে। কেউ দেউলিয়া হয়ে যাবে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা,

বন্যায় ফসল ধ্বংস হয়ে যাবে। নদীর পাড় ভেঙ্গে বাড়ি, জমি নদীতে বিলীন হয়ে যাবে। —এই হচ্ছে জীবন। এগুলো সবই আল্লাহর تعالى পক্ষ থেকে পরীক্ষা। আমরা যদি উপলব্ধি করতে পারি যে, আমাদের জীবনের কঠিন সময়গুলো আসলে এক একটা পরীক্ষা এবং আমাদের কাজ হচ্ছে এই পরীক্ষায় ঈমান বজায় রেখে পাশ করা, তাহলে জীবনের কঠিন সময়গুলো পার করা যেমন সহজ হবে, তেমনি আমরা পরীক্ষায় পাশ করে বিরাট প্রতিদান পাবো।

আর যদি তা না করি, তাহলে জীবনটা অসহ্য হয়ে যাবে। ডিপ্রেশনের ওষুধ খেয়ে দিন পার করতে হবে। ঘুমের ওষুধ খেয়ে রাতে ঘুমাতে হবে। হাজার হাজার ওষুধ খেয়ে নষ্ট করা কিডনি নিয়ে ডায়ালাইসিস করতে করতে ধুঁকে ধুঁকে মারা যেতে হবে। আর আখিরাতে থাকবে অপমান এবং শাস্তি।

আর যারা কষ্টের মধ্যেও ধৈর্য-নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করে, তাদেরকে সুখবর দাও

প্রশ্ন আসে: কীসের সুখবর? মুমিনদের জন্য সুখবর একটাই: জান্নাতের নিশ্চয়তা। আল্লাহ تعالى আমাদেরকে এই আয়াতে বলে দিলেন: কী করলে আমাদের আর জান্নাত পাওয়া নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না। আসুন আমরা আমাদের জীবনে ঘটে চলা পরীক্ষাগুলো বোঝার চেষ্টা করি। এই পরীক্ষাগুলো কীভাবে দিলে আমরা পরীক্ষায় পাশ করবো, তা চিন্তা করে বের করি। তারপর যথাসাধ্য চেষ্টা করি নিজেদের মধ্যে যা কিছু পরিবর্তন করতে হবে, তা করার। ঈমান বজায় রেখে প্রতিটি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে শেষ করি।

আল্লাহ تعالى তখন আমাদেরকে কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বড় সুখবর দিয়ে দেবেন। সেদিন সেই সুখবর পেয়ে আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবো। পৃথিবীর জীবনটা তখন কয়েক মুহূর্তের দুঃস্বপ্ন মনে হবে। জান্নাতের সুখবর পেয়ে মুহূর্তের মধ্যেই আমরা ভুলে যাবো পৃথিবীতে কত কষ্ট, কত সংগ্রাম করেছিলাম, কত দুঃখ পেয়েছিলাম। সামনে যে এক নতুন অনন্ত জীবন শুরু হবে, শুধুই আনন্দ, সুখ, হাসি, তৃপ্তির জীবন, সেই জীবন নিয়ে আমরা তখন পুরোপুরি ব্যস্ত হয়ে যাবো। কখন জান্নাতে গিয়ে

আল্লাহর تعالى সাথে দেখা হবে, তাঁর কথা প্রথম বারের মতো নিজের কানে শুনতে পাবো, তাঁর সাথে মন উজাড় করে কথা বলতে পারবো –সেই তীব্র আনন্দে আমরা বাকি সবকিছু ভুলে যাবো।

এর পরের আয়াতে আল্লাহ تعالى আমাদেরকে জানাবেন এই সুখবর যারা পাবে, তারা কেমন মানুষ। তারা কোনো সাধারণ মানুষ নন। তারা প্রচণ্ড রকমের ধৈর্যশীল। কু'রআনের শিক্ষাকে তারা তাদের কথা, কাজ, চিন্তায় আত্মস্থ করে ফেলেছেন। জীবনের বাস্তবতা কী, বিপদ কেন আসে, কীভাবে আসে, তারা তা খুব ভালভাবে উপলব্ধি করেন। কোনো ধরনের বিপদ তাদেরকে তাদের ইস্পাত দৃঢ় ঈমান থেকে টলাতে পারে না।

সূত্র:

- [১] নওমান আলি খানের সূরা আল-বাকারাহ এর উপর লেকচার এবং বাইয়িনাহ এর কু'রআনের তাফসীর।
- [২] ম্যাসেজ অফ দা কু'রআন — মুহাম্মাদ আসাদ।
- [৩] তাফহিমুল কু'রআন — মাওলানা মাওদুদি।
- [৪] মা'রিফুল কু'রআন — মুফতি শাফি উসমানী।
- [৫] মুহাম্মাদ মোহার আলি — A Word for Word Meaning of The Quran
- [৬] সৈয়দ কুতব — In the Shade of the Quran
- [৭] তাদাব্বুরে কু'রআন - আমিন আহসান ইসলাহি।
- [৮] তাফসিরে তাওযীহুল কু'রআন — মুফতি তাকি উসমানী।
- [৯] বায়ান আল কু'রআন — ড: ইসরার আহমেদ।
- [১০] তাফসীর উল কু'রআন — মাওলানা আব্দুল মাজিদ দারিয়াবাদি

- [১১] কু’রআন তাফসীর — আব্দুর রাহিম আস-সারানবি
- [১২] আত-তাবারি-এর তাফসীরের অনুবাদ।
- [১৩] তাফসির ইবন আব্বাস।
- [১৪] তাফসির আল কুরতুবি।
- [১৫] তাফসির আল জালালাইন।

তাকদিরে বিশ্বাস

আফসোস!! চারদিকে যারাই নিজেকে মুসলিম বলছে তাদের অধিকাংশের কাছে অবহেলিত বিষয় হচ্ছে ক্বদর বা তাকদিরে বিশ্বাস। অথচ এটি মৌলিক বিশ্বাসের অন্তর্ভক্ত।

প্রত্যেকটি বিষয়েই কিছু ভুল ধারণা থাকলেও অধিকাংশেরই ক্বদর বিষয়ে কোন ধারণাই নেই!! তারা বুঝেনা যে সালাতের অর্থ যেমন প্রার্থনা করলেই যথেষ্ট হয়না তেমনি ক্বদর এর অর্থ কোনভাবেই ভাগ্য নয়। হিন্দুদের নসিবে বা কপালে লেখার মত ক্বদর বা তাকদিরের লিখার ধারণা নয়! যদিও অধিকাংশই তাই মনে করে...

“বুঝতে পারিনা তাই মেনে নিলাম”, “সবাই বিশ্বাস করে তাই আমিও করি”, “বাপ-দাদা বিশ্বাস করে বা করতে বলছে তাই আমিও করি”, “বুঝিনা-জানা সম্ভব না তাই বিশ্বাস করি” এ ফ্রেজগুলোকে ঈমান বলেনা বলে সংশয়!

অন্ধ বিশ্বাসের নাম ঈমান নয়; ঈমান মানে দৃঢ় বিশ্বাসের নাম। তাই বিশ্বাস বা ঈমানের ক্ষেত্রে জ্ঞান মূলত ওহীর জ্ঞানের প্রয়োজন। জ্ঞানছাড়া ঈমান হয়না; আর ঈমান ছাড়া আমল হয়না!!

যখন ব্যক্তি তার জ্ঞানে মানুষের নানা মত ও পথ, ধারণা ও অন্ধ বিশ্বাস এসে যুক্ত করে তখন সে মানুষের ঈমান দূর্বল হয়; সংশয়-সন্দেহে পতিত হয়। তাই উপরোল্লিখিত ৬টি বিষয়েই স্পষ্ট ধারণা ও দৃঢ় বিশ্বাস আনলেই কেউ মুসলিম হতে পারে....

নিচের লেখাটি সংশয়গ্রস্থ ও কাফিরদের একটি সন্দেহমূলক প্রশ্ন ও সে বিষয় ধারণা লাভের জন্য লেখা হয়েছে যা আপনার তাকদিরে বিশ্বাসের বিষয় কিছু ভুল ধারণা দূর করবে বলে আশা রাখি

অনেকে প্রশ্ন করেন:

মানুষ ভাল-মন্দ যত কাজ করে তা আল্লাহর ইচ্ছায় ও তাকদীরের লিপিবদ্ধ থাকার কারণে করে। তাই মানুষের কি দোষ?

কেন আল্লাহ তাকে মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দেবেন?

আবার অনেকের প্রশ্নের ভাষা এ রকম যে,

আমি জান্নাতে যাবো না জাহান্নামে যাবো তাতো অনেক আগেই লেখা হয়েছে। তাই কষ্ট করে নেক আমল করে লাভ কী? তাকদীরে জান্নাত লেখা থাকলে কোন আমল না করেও জান্নাতে যাওয়া যাবে। আর কপালে জাহান্নাম লেখা থাকলে হাজার ভাল কাজ করেও জান্নাতে যাওয়া যাবে না।

আবার অনেকে বলেন, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া যখন কিছুই হয় না। তাই আমি যদি কোন খারাপ কাজ করে থাকি তবে তা আল্লাহর ইচ্ছায় করেছি। আল্লাহ ইচ্ছে করলে আমাকে ফিরিয়ে রাখতে পারতেন।

প্রশ্নের ভাষার ধরণ যাই হোকনা কেন, কথা হল সব কিছু যখন আল্লাহর ইচ্ছায় হয় তখন মানুষের কী দোষ?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে যেয়ে অনেক বিজ্ঞজন হিমশিম খেয়েছেন। এক পর্যায়ে বলতে বাধ্য হয়েছেন, তাকদীর সম্পর্কে বেশী আলোচনা বা প্রশ্ন করা ঠিক নয়। এ ব্যাপারে যুক্তি-তর্ক করতে যেয়ে অনেকে হয়েছে গোমরাহ । উদ্ভব হয়েছে জাবরিয়া, কদরিয়া ইত্যাদি বাতিল ফেরকার।

তাই আমি এ বিষয়টি সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবো আমার এ প্রবন্ধে।

প্রথম কথা হল, এ ধরনের প্রশ্ন কোন মুসলিম করতে পারে কিনা?

আল-কুরআনুল কারীমে যা দেখা যায় তাতে প্রমাণিত হয় যে, এ ধরনের প্রশ্ন কাফির মুশরিকরা করত।

যেমন ইরশাদ হচ্ছে :

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آَبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ

অচিরেই মুশরিকরা বলবে, আল্লাহ যদি চাইতেন, আমরা শিরক করতাম না এবং আমাদের পিতৃপুরুষরাও না এবং আমরা কোন কিছু হারাম করতাম না। এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে, যে পর্যন্ত না তারা আমার আযাব আস্বাদন করেছে। বল, তোমাদের কাছে কি কোন জ্ঞান আছে, যা তোমরা আমাদের জন্য প্রকাশ করবে? তোমরা তো শুধু ধারণার অনুসরণ করছ এবং তোমরা তো কেবল অনুমান করছ। (সূরা আল আনআম : ১৪৮)

দেখুন ! মুশরিকরা তাদের শিরকের ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছার কথা বলে রেহাই পাবার প্রয়াস পেয়েছে। এবং তাদের এ কথা দ্বারা তারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অতএব যারা আল্লাহর ইচ্ছার দোহাই দিয়ে সত্যকে প্রত্যাখ্যান ও সৎকর্ম থেকে দূরে থাকতে চায় তারা মূলত: মুশরিকদের মতই কাজ করল ও তাদের অনুস্বরণ করল।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেন:

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ
وَلَا آَبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

{আর যারা শির্ক করেছে, তারা বলল, যদি আল্লাহ চাইতেন তবে আমরা তাকে ছাড়া কোন কিছুর ইবাদাত করতাম না এবং আমাদের পিতৃপুরুষরাও না। আর তার বিপরীতে আমরা কোন কিছু হারাম করতাম না। এমনিই করেছে, যারা তাদের পূর্বে ছিল। সুতরাং

স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া ছাড়া রাসূলদের কি কোন কর্তব্য আছে?} [সূরা আন নাহল: ৩৫]

তিনি আরো বলেন:

َنوُصُرْخَي َّلِإ ْمُه ْنِإ ٍمْلِع ْنِم َكِلَذِب ْمُهَل اَم ْمُهاَنْدَبَع اَم ُنَمْحَّرلا َءاَش ْوَل اوُلاَقَو

{আর তারা (মুশরিকরা) বলে, পরম করুণাময় আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা এদের ইবাদাত করতাম না, এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা শুধু মনগড়া কথা বলছে। } [সূরা যখরুফ: ২০]

উল্লিখিত তিনটি আয়াতে কারীমা পাঠ করে কয়েকটি বিষয় স্পষ্টভাবে জানা গেল:-

(#এক) মুশরিকরা আল্লাহর ইচ্ছার দোহাই দিয়ে শিরক করত। তাদের শিরকের প্রমাণ হিসাবে তারা আল্লাহর ইচ্ছাকে পেশ করত।

(#দুই) তারা বিশ্বাস করত সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায় হয়। এ বিশ্বাস পোষণ করার পরও তারা কাফির ও মুশরিক রয়ে গেছে।

(#তিন) তারা আল্লাহর গুণাবলিতে বিশ্বাস করত (যেমন সূরা যুখরুফের আলোচ্য আয়াতে রহমান গুণ) তারপরেও তারা মুশরিক থেকেছে।

(#চার) তারা তাদের শিরকের সমর্থনে আল্লাহর ইচ্ছাকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করে বলেছে যে, তারা এসব আল্লাহর ইচ্ছায়ই করছে। আল্লাহ তাদের মিথ্যাবাদী বলেছেন। কারণ, তারা বলেছে তাদের শিরকি কাজগুলো আল্লাহর ইচ্ছায় করা হচ্ছে।

(#পাঁচ) তাদের এ সকল বক্তব্য নতুন কিছু নয়। তাদের পূর্ব-পুরুষরাও এ রকম বক্তব্য দিয়েছে।

এরপরও যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি কাফির- মুশরিকদের মত অনুরূপ প্রশ্ন করে তাকে আমরা কয়েকটি #উত্তর দিতে পারি।

#এক. যে ব্যক্তি এ ধরনের প্রশ্ন করবে তাকে বলা হবে আপনি জান্নাতে যেতে চান না জাহান্নামে? উত্তরে সে হয়তো বলবে আমি জান্নাতে যেতে চাই। তারপর তাকে জিজ্ঞেস

করুন, আচ্ছা আপনার তাকদীরে কী লেখা আছে জান্নাত না জহান্নাম, আপনি কি তা জানেন? সে বলবে, না আমি জানি না। আচ্ছা, তাহলে বিষয়টি আপনার কাছে অজ্ঞাত। আর অজ্ঞাত বিষয়ের উপর নির্ভর করে কোন ভাল কাজ ছেড়ে দেয়া কি কোন বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে? পরীক্ষায় পাশ করবে না ফেল করবে, এটা অজানা থাকার পরও মানুষ অনেক কষ্ট করে পরীক্ষা দেয় পাশ করার আশায়। অপারেশন সাকসেস হবে কি হবে না, তা অজ্ঞাত থাকা সত্বেও মানুষ অপারেশন করায় রোগ-মুক্তির আশায়। ফলাফল অজ্ঞাত থাকার অজুহাতে কোন কাজ ছেড়ে দিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা সুস্থ মস্তিস্কের কাজ হতে পারে না। আপনার তাকদীরে জান্নাত লেখা আছে না জাহান্নাম তা আপনার জানা নেই। কিন্তু আপনার লক্ষ্য যখন জান্নাত তখন লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য অবশ্যই কাজ করতে হবে। যেমন দুনিয়াবি-পার্থিব সকল কাজ-কর্ম ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জন করার বেলায় আমরা করে থাকি। আর জান্নাত ও জাহান্নামের স্রষ্টা যখন বলে দিয়েছেন এটা জান্নাতের পথ আর ওটা জাহান্নামের পথ তখন তা বিশ্বাস করে আমল করতে অসুবিধা কোথায়?

#দুই. যার তাকদীরে জান্নাত লেখা আছে সাথে সাথে এটাও লেখা আছে যে, সে জান্নাত লাভের জন্য নেক আমল করবে তাই জান্নাতে যাবে। আর যার তাকদীরে জাহান্নাম লেখা আছে সাথে সাথে এটাও লেখা আছে যে, সে জাহান্নামের কাজ করবে ফলে সে জাহান্নামে যাবে।

#তিন. সব কিছু আল্লাহর ইচ্ছায় হয়। মানুষ সকল কাজই আল্লাহর ইচ্ছায় করে ঠিকই কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক করে না। আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক কাজ করার জন্য সে জান্নাতে যাবে আর সন্তুষ্টি মোতাবেক কাজ না করার জন্য সে জাহান্নামে যাবে। প্রশ্ন হতে পারে ইচ্ছা (ইরাদা বা মাশিয়্যত) ও সন্তুষ্টি (রেজা) এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে কি? হ্যাঁ অবশ্যই আছে। ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির মধ্যে পার্থক্য আছে অবশ্যই। ছোট একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা সহজে বুঝানো যেতে পারে। যেমন এক ব্যক্তির ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়ল। চিকিৎসক বললেন তার পেটে অপারেশন করতে হবে। অপারেশন ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এখন বেচারা অপারেশন করাতে রাজী নয়। এ কাজে সে

সন্তুষ্ট নয়, তবুও সে অপারেশন করিয়ে থাকে। এমন কি এ কাজের জন্য ডাক্তারকে টাকা পয়সা দেয়। অতএব, দেখা গেল এ অপারেশনে তার ইচ্ছা পাওয়া গেল, কিন্তু তার সন্তুষ্টি পাওয়া যায়নি। অপারেশন করাতে সে ইচ্ছুক কিন্তু রাজী নয়। দেখা গেল ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি দুটো আলাদা বিষয়। অনেক সময় ইচ্ছা পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে সন্তুষ্টি পাওয়া যায় না। কিন্তু যেখানে সন্তুষ্টি পাওয়া যায় সেখানে ইচ্ছা অবশ্যই থাকে। তাই সকল কাজ মানুষ আল্লাহর ইচ্ছায় করে ঠিকই কিন্তু তার সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি অনুযায়ী করে না। বিভ্রান্তি তখনই দেখা দেয় যখন ইচ্ছা দ্বারা সন্তুষ্টি বুঝানো হয়। তাই জান্নাতে যেতে হলে তাঁর ইচ্ছায় কাজ করলে হবে না। তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী কাজ করতে হবে। যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন বলে প্রমাণ আছে সে সকল কাজ করতে হবে। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি কিভাবে বুঝার উপায় কোন কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন, আর কোন কাজে তিনি অসন্তুষ্ট হন তা বুঝা যাবে কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা। কোন কাজ সংঘটিত হয়ে গেলেই সাধারণভাবে বুঝে নেয়া হবে যে এটা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় হয়েছে। তা অবশ্যই বলতে হবে। কিন্তু তা আল্লাহর সন্তুষ্টিতে হয়েছে কিনা তা বুঝা যাবে না কুরআন বা হাদীসের মাধ্যম ব্যতীত। কুরআন বা হাদীসে উক্ত বিষয়টির সমর্থন থাকলে বুঝা যাবে সেটা আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সম্পন্ন হয়েছে। আর যদি কাজটি কুরআন বা হাদীসের পরিপন্থী হয় তাহলে ধরে নেয়া হবে কাজটি আল্লাহর সমন্তুষ্টির খেলাফ হয়েছে। তাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী কাজ করলে জান্নাতের অধিকারী হওয়া যাবে। আর তার সন্তুষ্টি অনুযায়ী কাজ না করলে জাহান্নামে যেতে হবে। ভাল করে মনে রাখতে হবে সব কাজ আল্লাহর ইচ্ছায় হয় ঠিকই কিন্তু সব কাজ তার সন্তুষ্টি মোতাবেক হয় না। আরো মনে রাখতে হবে ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি এক বিষয় নয়। দুটো আলাদা বিষয়।

#চার. আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তার ইচ্ছায় সবকিছু হয়। তাই তিনি ইচ্ছা করেই মানুষকে ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন। যাতে মানুষ নিজ ইচ্ছায় ও স্বাধীনতায় ভাল ও মন্দ পথ অবলম্বন ও বর্জন করতে পারে।

যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ

{বল, সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে ; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক।} [সূরা আল কাহাফ: ২৯]

তাই_বলা_যায় আল্লাহর দেয়া ইচ্ছাশক্তিতেই মানুষ ভাল-মন্দ কাজ করে। তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষের ইচ্ছাশক্তি রহিত করে ভাল বা মন্দ কাজ করতে বাধ্য করতে পারেন।

মানুষ কোন খারাপ কাজ করলে এ কথা বলা যাবে না যে, এ ক্ষেত্রে মানুষের কোন ইচ্ছা ছিল না। এ কথাও বলা যাবে না যে আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজটি হয়েছে। কাজটা আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে এটা যেমন সত্য, তেমনি মানুষের ইচ্ছাও কাজটা করার ব্যাপারে ভূমিকা রেখেছে, এটাও সত্য। কিভাবে এটা সম্ভব? একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিস্কার হয়ে যাবে।

উদাহরণটা হল, বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ ও বিদ্যুৎ গ্রাহকের ভূমিকা। বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে, তেমনি বিদ্যুৎ গ্রাহকও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু দায় বহন করতে হবে বিদ্যুৎ গ্রাহকের। মাস শেষে যখন হাজার টাকার বিদ্যুৎ বিল আসল, তখন কর্তৃপক্ষকে এ কথা বলে দোষ দেয়া চরম বোকামি হবে যে, তারা কেন বিদ্যুৎ সরবরাহ করল, তারা ইচ্ছা করলে বিদ্যুৎ সরবরাহ কমিয়ে দিয়ে আমার বিদ্যুৎ খরচ কমাতে পারত। তারা ইচ্ছা করলে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে আপনার খরচ কমাতে পারত এটা যেমন ঠিক, তেমনি আপনিও সাশ্রয়ী হয়ে বিদ্যুৎ খরচ কমাতে পারতেন, এটাও ঠিক। আর খরচের এ দায়ভার বহন করবে গ্রাহক, সরবরাহকারী কর্তৃপক্ষ নয়। কেননা এ ক্ষেত্রে গ্রাহকের ইচ্ছা ও কর্ম দায়ী।

তাই মানুষের ভাল-মন্দ আমলের ব্যাপারেও এটা বলা যায় যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষ কাজ করত না। আবার মন্দ কাজ করার জন্য মানুষই দায়ী- তার ইচ্ছা শক্তি

প্রয়োগের জন্য। পাচ. আল্লাহ নিজের ইচ্ছায় মানুষকে ভাল ও মন্দ কাজ করার ইচ্ছা শক্তি দান করে থাকেন। তিনি তার ইচ্ছায় কাউকে ভাল বা মন্দ কাজ করার জন্য বাধ্য করেন না। যদি তিনি এরূপ করতেন তাহলে দুনিয়ার সকল মানুষ ঈমানদার হয়ে যেত।

যেমন তিনি বলেন:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

{আর যদি তোমার রব চাইতেন, তবে যমীনের সকলেই ঈমান আনত। তবে কি তুমি মানুষকে বাধ্য করবে, যাতে তারা মুমিন হয়?} [সূরা ইউনূস ,আয়াত ৯৯]

সারকথা

নিজেদের খারাপ কাজগুলো আল্লাহর ইচ্ছায় ও তাকদীরের লেখার কারণে হয়েছে এধরনের কথা বলে খারাপ কর্মের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। তাকদীরের দোহাই দিয়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তি বা জান্নাত লাভ করা যাবে না।

এ ক্ষেত্রে ছোট একটা ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি না। আর তা হল:

উমর রা. এর খেলাফত যুগে এক লোক চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হল,

ও আদালতে তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমাণিত হল। শাস্তি হিসেবে তার হাত কাটার নির্দেশ দেয়া হল।

লোকটি উমর রা. এর কাছে গিয়ে বলল,

মুসলিম জাহানের হে মহান খলীফা! আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছু হয় না। আমিও তো আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে নই। আমি তো তার ইচ্ছায়ই চুরি করেছি। আমার হাত কাটা যাবে কেন?

উমার রা. বললেন :

সব কিছু আল্লাহর ইচ্ছায় বা তাকদীরের কারণে হয়। তুমি যেমন আল্লাহর ইচ্ছায় চুরি করেছ, তেমনি তোমার হাত আল্লাহর ইচ্ছায়ই কাটা হবে।

মহান বিচার দিবসে যদি কোন মানুষ আল্লাহ তাআলাকে বলে যে, হে আল্লাহ! আমি বিশ্বাস করতাম আপনার ইচ্ছা ছাড়া কিছু হয় না, আপনিও তাই বলেছেন। আমি যে অন্যায় করেছি, জুলুম করেছি তা তো আপনার ইচ্ছায়ই করেছি। কাজেই আজ আপনি এ কাজের অপরাধে আমাকে জাহান্নামে পাঠাবেন কেন?

তখন আল্লাহ আহকামুল হাকেমীন যদি বলেন: ঠিক আছে। তোমার কথাই ঠিক। আমার ইচ্ছায় যখন পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে, আমার না-ফরমানী করেছ তখন আমার ইচ্ছায়ই তোমাকে জাহান্নামে যেতে হবে। তুমি তো জানো আমার ইচ্ছার সামনে তোমার কিছুই করার নেই। আমার ইচ্ছায় যখন পাপাচার করতে তোমার আপত্তি ছিল না তাহলে জাহান্নামে যেতে আপত্তি কেন? তখন সে মানুষটির কিছু বলার থাকবে কি?

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক অর্থ্যে ভাগ্য বিষয়ে ধারণা অর্জনের তাউফিক দান করুন।

লেখক: আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

সম্পাদক মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক ও আলী হাসান তৈয়ব

প্রচারে: ইসলাম প্রচার বুরো; সাউদি আরব;

ঈমান

ঈমান (إِيمَان 'ঈমান', শাব্দিক অর্থ প্রচলিতমতে বিশ্বাস, মতান্তরে স্বীকৃতি) শব্দের আভিধানিক অর্থ স্বীকার করা, স্বীকৃতি দেওয়া, অনুগত হওয়া মতান্তরে দৃঢ় বিশ্বাস করা। এটি কুফর বা অস্বীকার করা বা অবাধ্যতার বিপরীত। ইসলাম ধর্মে ঈমানের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক।

ঈমানের অর্থ সম্পর্কে আলেমদের বক্তব্য

আহলে সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ অনুসারে ঈমান হল:

অন্তরে স্বীকার করা, জিহ্বা দিয়ে বলা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা করা; এটি আনুগত্যের সাথে বৃদ্ধি পায়, এবং পাপের সাথে হ্রাস পায়।

এবং তাদের উক্তি থেকে:[২]

- ইবনে আবদ আল-বার বলেন:

ফকীহ ও হাদীসের লোকেরা একমত যে, ঈমান হল কথা ও কাজ এবং নিয়ত ছাড়া কোন আমল নেই। মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আল-শাফিঈ, সাহাবীগণ, এবং তাবিয়ূন তাদের পরে, আমরা বুঝতে পেরেছি: ঈমান হচ্ছে বলা এবং করা এবং নিয়ত ছাড়া তিনটির একটি অপরটির জন্য যথেষ্ট নয়।

- ইসমাইল বিন মুহাম্মাদ বিন আল-ফাদল আল-তাইমি আল-আসবানী] বলেছেন:

আর আইনের ভাষায় ঈমান হল হৃদয় দিয়ে অনুসমর্থন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ।

- সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ বলেন:

ঈমান হল কথা এবং কাজ, এটি বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পায়।[৩]

- আবু আল-হাসান আল-আশ'আরী:

তারা সর্বসম্মতভাবে একমত যে, আনুগত্যের সাথে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং পাপের সাথে হ্রাস পায় এবং এর হ্রাস মানে এই নয় যে যেসকল বিষয়ে আমাদেরকে ঈমান আনার আদেশ করা হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে আমাদের সন্দেহ বা অজ্ঞতা রয়েছে, কারণ এটি করলে কুফরি বা সরাসরি ধর্ম থেকে খারিজ হয়ে যায়। বরং এটি অন্তরের অবস্থার অবনতি এবং বাহ্যিক বহিঃপ্রকাশের বৃদ্ধি, ঠিক যেমন আমাদের আনুগত্য ও নবীর আনুগত্যের ওজন ভিন্ন হয়ে থাকে, যদিও আমরা সবাই আমাদের দায়িত্ব পালন করছি তবুও।

ঈমানের ব্যাখ্যা

সৃষ্টির সেরা মানবজাতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার শর্ত হল ঈমান গ্রহন করা। যে কেউ মুসলিম হতে হলে তাকে অবশ্যই ঈমান আনতে হবে, আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং বিশ্বাস স্থাপন করা তাকদীরের ভাল মন্দের প্রতি। আর নতুন মুসলিম কে কলেমা শাহাদাতের মৌখিক স্বীকৃতি দিয়ে, কাফির থেকে ইসলামে প্রবেশ করান হয়। আল্লাহর প্রতি ও তার বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মৌখিক স্বীকৃতি দেওয়ার সাথ সাথে সে ইসলামে প্রবেশ করল। ঈমান এনে ইসলামে প্রবেশ করা মাত্রই ইসলামের যাবতীয় হুকুম আহকাম মানা ফরজ হয়ে গেল। ঈমান এনে ইসলামে প্রবেশ করতে হয়, আর ইসলামের হুকুম তামিল করে ঈমানের পূর্ণতা প্রদান করতে হয়। তাই বান্দা ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন না করে ঈমানের চুড়ান্ত স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।

ঈমান আনার পরই কিন্তু ইসলামে প্রবেশ, যার অর্থ দাড়ায় ইসলাম ও ঈমানে পার্থক্য আছে। যদি ইসলাম ও ঈমানকে একইস্থানে একত্রে উল্লেখ করা হয়। তাহলে ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য হবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত বাহ্যিক আমল। যেমন: সালাত, সাওম, হজ্জ্ব, জাকাত ইত্যাদি। অপর পক্ষে, তখন ঈমানের অর্থ হবে, অন্তর দ্বারা সম্পাদন যোগ্য ও বিশ্বাসগত আমল। আর এই বিশ্বাসগত আমল বলতে উপরের হাদিসে বর্ণিত ঈমানের ছয়টি মূলভিত্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা বুঝায়।

কারন সহিহ মুসলিমের প্রথম হাদিসে বলা হয়েছে:

আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) বললেন, তাদের সাথে তোমাদের দেখা হলে বলে দিও যে, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই এবং আমার সঙ্গে তাদেরও কোন সম্পর্ক নেই । আল্লাহর কসম! যদি এদের কেউ উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনার মালিক হয় এবং তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, তাকদীরের প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত আল্লাহ তা কবুল করবেন না । তারপর তিনি বললেন, আমাকে আমার পিতা উমর ইবন

খাত্তাব (রাঃ) হাদীস শুনিয়েছেন যে, একদা আমরা রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে ছিলাম । এমন সময় একজন লোক আমাদের কাছে এসে হাযির হলেন । তাঁর পরিধানের কাপড় ছিল সাদা ধবধবে, মাথার কেশ ছিল কাল কুচকুচে । তাঁর মধ্যে সফরের কোন চিহ্ন ছিল না । আমরা কেউ তাঁকে চিনি না । তিনি নিজের দুই হাঁটু নবী করীম (সাঃ)-এর দুই হাঁটুর সাথে লাগিয়ে বসে পড়লেন আর তার দুই হাত নবী (সাঃ)-এর দুই উরুর উপর রাখলেন । তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন ।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ ইসলাম হলো, তুমি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ইই মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসুল, নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রামাযানের রোযা পালন করবে এবং বায়তুল্লাহ পৌছার সামর্থ্য থাকলে হজ্জ পালন করবে । আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন । তার কথা শুনে আমরা বিস্মিত হলাম যে,তিনিই প্রশ্ন করেছেন আর তিনিই-তা সত্যায়িত করছেন । আগন্তুক বললেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন ।

রাসুল (সাঃ) বললেনঃ ঈমান হলো আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতাদের প্রতি, তার কিতাবসমূহের প্রতি, তার রাসুলগণের প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান আনবে, আর তাকদিরের ভালমন্দের প্রতি ঈমান রাখবে । আগন্তুক বললেন,আপনি ঠিকই বলেছেন ।তারপর বললেন, আমাকে ইহসান সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসুল (সাঃ) বললেনঃ ইহসান হলো, এমনভাবে ইবাদত-বন্দেগী করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, যদি তুমি তাকে নাও দেখ, তাহলে ভাববে তিনি তোমাকে দেখছেন ।আগন্তুক বললেন, আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন ।

রাসুল (সাঃ) বললেনঃ এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর চাইতে যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তিনি অধিক অবহিত নন । আগন্তুক বললেন, আমাকে এর আলামত সম্পর্কে অবহিত করুন । রাসুল (সাঃ) বললেনঃ তা হলো এই যে, দাসী তার প্রভুর জননী হবে; আর নগ্নপদ, বিবস্ত্রদেহ দরিদ্র মেষপালকদের বিরাট বিরাট অট্টালিকার প্রতিযোগিতায় গর্বিত দেখতে পাবে । উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) বললেন যে,পরে আগন্তুক প্রস্থান করলেন । আমি

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম । তারপর রাসুল (সাঃ) আমাকে বললেন, হে উমর! তুমি জান, এই প্রশ্নকারী কে? আমি আরয করলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই সম্যক জ্ঞাত আছেন । রাসুল (সাঃ) বললেনঃ তিনি জিবরাঈল । তোমাদের তিনি দীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন ।বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম। হাদীসের ভাষ্য ইমাম মুসলিমের।

কুরআন ও সুনআহ মোতাবেগ কি কি বিষয়ের উপর ঈমান আনতে হবে।

উপরে বর্ণিত হাদিসটিকে হাদিসে জিবরাঈল বলা হয়। হাদিসটিতে হাদিসে জিবরাঈল (আ:) বলা হয়। হাদিসটিতে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে যখন জিবরাঈল (আ:) ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন তখন রাসুল (সাঃ) বললেনঃ ঈমান হলো আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতাদের প্রতি, তার কিতাবসমূহের প্রতি, তার রাসুলগণের প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান আনবে, আর তাকদিরের ভালমন্দের প্রতি ঈমান রাখবে।

আল্লাহ্ সুবাহানাহুয়াতালা পবিত্র কুরআনের সুরা নিসায় বলেন:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَـٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَـٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبۡلُ‌ۚ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱللَّهِ وَمَلَـٰٓٮِٕكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأَخِرِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَـٰلاَۢ بَعِيدًا (١٣٦)

হে ঈমানদারগণ ! ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি, আল্লাহ তাঁর রসূলের ওপর যে কিতাব নাযিল করেছেন তার প্রতি এবং পূর্বে তিনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তার প্রতি । যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাবর্গ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলগণ ও পরকালের প্রতি কুফরী করলো সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদূর চলে গেলো, (সুরা নিসা :১৩৬)।

আল্লাহ্ সুবাহানাহুয়াতালা আরও বলেন:

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ‌ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَـٰٓٮِٕكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٍ۬ مِّن رُّسُلِهِۦ‌ۚ

রাসূল তাঁর প্রভুর নিকট থেকে তাঁর প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে ঈমান এনেছে এবং মুমিনগণও ! এরা প্রত্যেকে আল্লাহতে, তাঁর ফিরিশতাগণে, তাঁর কিতাবে, তাঁর রাসূলগণে বিশ্বাস স্থাপন করে, (সুরা বাকারা ২:২৮৫)

আল্লাহ্ সুবাহানাহুয়াতালা আরও বলেন:

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ.

অর্থঃ বরং প্রকৃতপক্ষে সৎকাজ হলো- ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কেয়ামত দিবসের উপর, ফিরিশ্তাদের উপর, এবং সমস্ত নবী-রাসূলগণের উপর, (সূরা আল-বাক্কারা ২:১৭৭)।

আল্লাহ্ সুবাহানাহুয়াতালা আরও বলেন:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ.

অর্থঃ আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি, (সূরা আল-ক্বামার :৪৯)।

ঈমান ও আকীদার সম্পর্ক

আলেমগণ আকীদা ও ঈমানের পার্থক্য করে বলেন যে, আকীদা বলতে ধর্মবিশ্বাসের সকল মত, পথ, প্রচলন, বৈচিত্র্য ও বর্ণালীকে বোঝায় আর ঈমান শুধুমাত্র দেওয়া বিশুদ্ধ ইসলামী ধর্মবিশ্বাসকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া আরবি ভাষায় আভিধানিকভাবে আকীদা শব্দটির অর্থ বিশ্বাস, এবং ঈমান শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো স্বীকৃতি দেওয়া (তাওয়াক্কুল শব্দটিরও একটি অর্থ হলো স্বীকৃতি দেওয়া), স্বীকার করা বা মেনে নেওয়া। অর্থাৎ কোন বিষয়ে বিশ্বাসের প্রকৃতি বা ধরনের নাম হলো আকীদা, আর কোন আকীদা বা বিশ্বাসকে স্বীকৃতি দেওয়া বা মেনে নেওয়ার নাম হলো তার উপর ঈমান আনা। এছাড়া ঈমান অর্থ হলো স্বীকৃতি দেওয়া, যার তিনটি ধাপ, প্রথম ধাপটি হলো অন্তরে বিশ্বাসের মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান, দ্বিতীয় ধাপটি হলো মুখ দ্বারা অর্থাৎ প্রকাশ্যে বলে ঘোষণার মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান, আর তৃতীয় ধাপটি হলো কাজের মাধ্যমে বা কাজে পরিণত করার মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান। এর মধ্যে অন্তরে বিশ্বাসের মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান করার ধাপটি আকিদার বা বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত,

যা ঈমানের মূল বা মৌলিক ভিত্তি বা শিকড়স্বরূপ। এর প্রমাণ বা দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদিসটিঃ

আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, ''তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন গর্হিত কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়। যদি (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, তাহলে নিজ জিভ দ্বারা (উপদেশ দিয়ে পরিবর্তন করে)। যদি (তাতেও) সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করে)। আর এ হল সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।''

— সহীহুল বুখারী ৯৫৬, মুসলিম ৪৯, তিরমিযী ২১৭২, নাসায়ী ৫০০৮, ৫০০৯, আবূ দাউদ ১১৪০, ৪৩৪০, ইবনু মাজাহ ১২৭৫, ৪০১৩, আহমাদ ১০৬৮৯, ১০৭৬৬, ১১০৬৮, ১১১০০, ১১১২২, ১১১৪৫, ১১৪৬৬, দারেমী ২৭৪০১

ঈমানের বা স্বীকৃতির রুকুন বা স্তম্ভ

আল-কোরআনের সূরা-বাকারা এর দুই হতে চার আয়াতে ঈমান সম্পর্কে এই বিষয় গুলি উল্লেখ করা হয়েছে।

ঈমানের বা ইসলামি আকীদা বিশ্বাসের উপর স্বীকৃতির ছয়টি বা মতান্তরে সাতটি স্তম্ভ এসেছে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে (আরকান আল-ঈমান)[৫][৬][৭][৮][৯] আল-কোরআনের সূরা-বাকারা এর দুই হতে চার আয়াতে ও জিবরাঈলের হাদীসে ঈমান সম্পর্কে এই বিষয় গুলি উল্লেখ করা হয়েছে। যা সব মুসলমানদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে। ঈমানের স্তম্ভগুলো হল:

1. একক ইলাহ বা উপাস্য হিসেবে আল্লাহকে বিশ্বাস করা ও স্বীকৃতি দেওয়া ও
2. আল্লাহর ফেরেস্তাগণকে বিশ্বাস করা ও স্বীকৃতি দেওয়া
3. আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত কিতাবসমূহে বিশ্বাস করা ও স্বীকৃতি দেওয়া (কুরআনসহ)

4. আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত সকল নবী এবং রাসুলকে বিশ্বাস করা ও স্বীকৃতি দেওয়া
5. আখিরাত বা পরকালে বিশ্বাস করা ও স্বীকৃতি দেওয়া
6. তাকদীরে বা ভালো মন্দের ওপর আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে বলে বিশ্বাস করা ও স্বীকৃতি দেওয়া
7. পুনরুত্থানের বা মৃত্যুর পর পুনঃজীবিত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস করা ও স্বীকৃতি দেওয়া

জিবরাঈলের হাদীস নামে গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদিসে রয়েছে, উমার বলেন,

একদিন আমরা আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট বসেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি আমাদের সামনে উপস্থিত হয় ..... এরপর বলল: "আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন"। তিনি বললেন: "তা হচ্ছে এই- আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও আখেরাতের উপর ঈমান আনা এবং তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনা।"..... [সহীহ্ মুসলিম]

ঈমানের সাতাত্তরটি শাখা

"ঈমানের সাতাত্তরটি শাখা" হল একটি সংকলন যা শাফিঈ ইমাম আল-বায়হাকি তাঁর রচনা ''শু'আব আল-ইমান-*এ সংকলিত করেছেন। এটিতে, তিনি ঈমানের জন্য প্রয়োজনীয় কাজসমূহ ব্যাখ্যা করেছেন যা সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত এবং ইসলামী নবী মুহাম্মাদের বাণীগুলির মাধ্যমে সত্য ঈমানকে প্রতিফলিত করে।*[১১][১২]

এটি ইসলামের নবী মুহাম্মদের দ্বারা বর্ণিত নিম্নলিখিত হাদীসের উপর ভিত্তি করে:

আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন যে নবী (সাঃ) বলেছেন: "ঈমানের ৭০টিরও বেশি শাখা রয়েছে। এই শাখাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই) বলা এবং সবচেয়ে ছোট শাখা হল পথের দিক থেকে বাধা দূর করা। এবং "হায়া" (লজ্জা) হল ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।"

বায়হাকী বর্ণিত এই ৭৭টি শাখা হলোঃ

হৃদয়ের সাথে যুক্ত ত্রিশটি কাজ

1. আল্লাহর প্রতি ঈমান তথা স্বীকৃতি (স্বীকৃতির সাক্ষ্য: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই)

1. স্বীকৃতি দেওয়া যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। তারপরে, আল্লাহ এই জিনিসগুলি সৃষ্টি করেছেন এবং পরবর্তীকালে তা অস্তিত্বে এসেছে।
2. ফেরেশতাদের (মালাইকাহ) অস্তিত্বে স্বীকৃতি দেওয়া।
3. বিভিন্ন নবীদের কাছে প্রেরিত সমস্ত আসমানী কিতাব (কুতুব) সত্য বলে স্বীকার করা। তবে কুরআন ব্যতীত অন্য সব বই এখন আর বৈধ নয়।
4. স্বীকার করা যে সমস্ত নবী সত্য। তবে, মুসলিমদেরকে শুধুমাত্র ইসলামী নবী মুহাম্মাদকে অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে
5. এটা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ আগে থেকেই সবকিছু জানেন এবং তিনি যা অনুমোদন দেন বা যা চান তা ঘটবে।
6. কেয়ামতের দিন (কিয়ামত অবশ্যই ঘটবে বলে বিশ্বাস করা।
7. জান্নাতের (জান্নাত) অস্তিত্বে স্বীকার করা।
8. জাহান্নামের অস্তিত্বে স্বীকার করা (জাহান্নাম)।
9. আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা থাকা।
10. ইসলামী নবী মুহাম্মদের এর প্রতি ভালবাসা।
11. শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য কাউকে ভালবাসা বা ঘৃণা করা।
12. সমস্ত ভাল কাজ আন্তরিকতার সাথে সম্পাদন করা (দ্বীনের উদ্দেশ্য; একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য)।
13. কোন পাপ সংঘটিত হলে অনুশোচনা করা এবং অনুশোচনা প্রকাশ করা।

14.আল্লাহকে ভয় করা।

15.আল্লাহর রহমতের আশা করা।

16.বিনয়ী হওয়া।

17.একটি অনুগ্রহ বা অনুগ্রহের উপর কৃতজ্ঞতা (শুকর) প্রকাশ করা।

18.প্রতিশ্রুতি পূরণ করা।

19.ধৈর্য্য ধারণ করা (সাবর)।

20.নিজেকে অন্যদের চেয়ে নিচু মনে করা।

21.সৃষ্টির প্রতি দয়া করা।

22.আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে আপনি যা কিছু অনুভব করেন (আল্লাহ থেকে নির্ধারিত আদেশ) তাতে সন্তুষ্ট হওয়া।

23.আল্লাহর উপর ভরসা করা।

24.আপনার আছে এমন কোনো গুণ নিয়ে গর্ব বা বড়াই করবেন না।

25.কারো প্রতি বিদ্বেষ বা ঘৃণা না করা।

26.কারো প্রতি ঈর্ষান্বিত না হওয়া।

27.রাগ না করা।

28.কারো ক্ষতি কামনা না করা।

29.পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা না থাকা।

জিহ্বার সাথে সংযুক্ত সাতটি কাজ

1. জিহ্বা দিয়ে কালেমা পাঠ করা।
2. কুরআন তেলাওয়াত করা।

3. জ্ঞান অর্জন করা।

4. জ্ঞান দান করা

5. দুআ করা।

6. আল্লাহর জিকির করা।

7. নিম্নলিখিতগুলি থেকে বিরত থাকা: মিথ্যা, গীবত (কারও অনুপস্থিতিতে পরনিন্দা), অশ্লীল কথা, অভিশাপ, গান গাওয়া (অশ্লীল) যা শরিয়তের পরিপন্থী।

চল্লিশটি কাজ সমগ্র দেহের সাথে সংযুক্ত

1. ওজু করা, গোসল করা এবং পোশাক পরিষ্কার রাখা।

2. সালাত আদায়ে অবিচল থাকা।

3. যাকাত ও সাদাকাতুল ফিতর প্রদান করা।

4. রোজা রাখা।

5. হজ পালন করা।

6. ইতিকাফ করা।

7. দ্বীনের (দ্বীনের) জন্য ক্ষতিকর সেই স্থান থেকে সরে যাওয়া বা হিজরত করা।

8. আল্লাহর কাছে যে মানত করা হয়েছে তা পূরণ করা।

9. গুনাহ নয় এমন শপথ পূরণ করা।

10. অপূর্ণ শপথের জন্য কাফফারা পরিশোধ করা।

11. শরীর ঢেকে রাখা ফরজ।

12. কোরবানি করা (আল্লাহর জন্য কোরবানি)।

13. মৃত ব্যক্তিকে কাফন ও দাফন করা।

14.নিজের ঋণ পূরণ করা

15.আর্থিক লেনদেন করার সময় নিষিদ্ধ জিনিসগুলি থেকে বিরত থাকা।

16.সাক্ষী দেওয়ার সময় সত্য গোপন না করা।

17.নফস যখন বিয়ে করতে চায় তখন বিয়ে করা।

18.যারা আপনার অধীন তাদের অধিকার পূরণ করা.

19.পিতামাতাকে সান্ত্বনা প্রদান করা।

20.শিশুদের সঠিক পদ্ধতিতে লালন-পালন করা।

21.বন্ধু বা আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করা।

22.মনিবকে মান্য করা

23.ন্যায়পরায়ণ হওয়া

24.মুসলিমদের সাধারণতার পরিপন্থী কোন পথের সূচনা না করা।

25.শাসকের আনুগত্য করা, যদি তিনি যা আদেশ করেন, তা শরীয়তের পরিপন্থী না হয়।

26.দুটি যুদ্ধরত দল বা ব্যক্তির মধ্যে শান্তি স্থাপন করা।

27.মহৎ কাজে সহায়তা করা।

28.সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা (আমর বিল মারুফ ওয়া আন নাহি আনিল মুনকার)।

29.যদি সরকার হয়, তাহলে তার উচিত শরীয়াহ অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করা।

30.দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা (যদি সম্ভব হয় হাতে, যদি না হয় জিহ্বা দ্বারা (কলম দ্বারা), যদি না হয় হৃদয় দ্বারা)।

31.আমানত পূরণ করা।

32.যারা অভাবী তাদের ঋণ দেওয়া

33.প্রতিবেশীর চাহিদা দেখা।

34.আয় উপার্জনের হালাল ও বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করা।

35.শরিয়ত অনুযায়ী খরচ করা।

36.যে আপনাকে সালাম দিয়েছে তাকে উত্তর দেওয়া।

37.হাঁচি দেওয়ার পর কেউ আলহামদুলিল্লাহ বললে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা।

38.অন্যায়ভাবে কারো ক্ষতি না করা।

39.খেলাধুলা ও বিনোদন থেকে বিরত থাকা যা শরিয়তের পরিপন্থী।

40.রাস্তা থেকে নুড়ি, পাথর, কাঁটা, লাঠি ইত্যাদি অপসারণ করা।

মুমিন

মুমিন একটি আরবি শব্দ, যা মূলত আরবি ঈমান শব্দটি থেকে এসেছে।[1] এর শাব্দিক অর্থ "বিশ্বাসী" এবং এর দ্বারা একজন কঠোরভাবে অনুগত মুসলিমকে বুঝায়, যে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ইসলামকে নিজের অভ্যন্তরের এবং বাহিরের সকল কর্মকান্ডে ধারণ করে এবং আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিজেকে পূর্ণরুপে সমর্পণ করে। নারীদের ক্ষেত্রে **মুমিনা** শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

কুরআনে মুমিনের পরিচয় বলা হয়েছেঃ-

ذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يومنون بما انزل اليك
وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون.اولأك علي هدي من ربهم واولأك هم المفلحون-

মুসলিম/মুসলিমার সাথে মুমিন/মুমিনার পার্থক্য ও মুমিন ব্যক্তির সংজ্ঞা

ইমান অর্থ বিশ্বাস। মুমিন মানে বিশ্বাসী। তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসীকে মুমিন বলা হয়। ইসলাম মানে আনুগত্য, মুসলিম অর্থ অনুগত ব্যক্তি, যিনি ইমানের সঙ্গে নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাত এবং আল্লাহ ও রাসুল-এর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ মেনে চলেন। মুমিন ও মুসলিম জন্মগত ও বংশীয় পরিচয় নয়, বিশ্বাস ও কর্মে তা অর্জন করতে হয়।

মুমিনের পরিচয় ও সফল মুমিনের গুণাবলিসমূহ

কোরআন ও হাদিসে প্রকৃত মুমিনের পরিচয় ও সফল মুমিনের গুণাবলি নিয়ে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে তা সংক্ষেপে বর্ণনা দেয়া হলো:

ইমান, ইয়াকিন, ইখলাস, তাকওয়া, তাজকিয়া ও ইহসান অর্জনের মাধ্যমে ইসলাম বা আত্মসমর্পণ সফল মুমিনের গুণাবলি। আল–কোরআনের শুরুতেই বিবৃত হয়েছে, ‘আলিফ লাম মিম! এই সেই মহাগ্রন্থ, যাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই, এটি মুত্তাকিনদের জন্য পথনির্দেশ। যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদের যে রিজিক-দৌলত দিয়েছি তা হতে তারা ব্যয় করে। আর যারা বিশ্বাস করে তারা আপনার প্রতি, অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি আর যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে এবং তারা পরকালের প্রতি একিন তথা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। এরা এদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের ওপরে রয়েছে এবং এরাই সফলকাম।’ (সুরা–২ বাকারা, আয়াত: ১-৫, পারা: ১, পৃষ্ঠা ১)।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন মজিদে তাঁর প্রিয় বান্দাদের পরিচয় উল্লেখ করে বলেন, ‘দয়াময় আল্লাহর প্রকৃত বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের যখন অজ্ঞ লোকে মূর্খতাসুলভ সম্বোধন করে তখনো তারা সালাম ও শান্তির বাণী বলে। তারা রাত্রি যাপন করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশে সেজদায় অবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে ইবাদত–বন্দেগির মাধ্যমে এবং তারা বলে, “হে আমাদের

প্রতিপালক! আমাদের হতে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত করুন; উহার শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ! নিশ্চয়ই তা অস্থায়ী ও স্থায়ী আবাস হিসেবে নিকৃষ্ট!" আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপচয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না; বরং তারা মধ্যপন্থায় থাকে। তারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ বা মাবুদকে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না।

বস্তুত,যারা এসব করে তারা শাস্তি ভোগ করবে, কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে তারা হীনাবস্থায় স্থিত হবে। তবে তারা নয়, যারা তওবা করে ইমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ এদের পাপ পুণ্যের দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যারা তওবা করে ও সৎকর্ম করে, তারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়। আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদার সহিত তা উপেক্ষা করে চলে। আর যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন স্মরণ করিয়ে দিলে তার প্রতি অন্ধ ও বধিরের মতো আচরণ করে না এবং যারা প্রার্থনা করে,"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি দান করুন যারা আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর হবে এবং আমাদের মুত্তাকিদের ইমাম বানিয়ে দিন।" এদের প্রতিদান হিসেবে দেওয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ স্থান, যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল। তাদের সেখানে অভ্যর্থনা জানানো হবে অভিবাদন ও সালাম সম্ভাষণসহকারে; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আশ্রয়স্থল ও আবাসন হিসেবে তা কতই উৎকৃষ্ট!' (সুরা-২৫ ফুরকান, আয়াত: ৬৩-৭৬)।

প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য

মাওলানা ওয়ালী উল্লাহ

প্রকাশ : ১৯ নভেম্বর ২০২১, ১২:০০ এএম আপডেট : ১৮ নভেম্বর ২০২১, ১১:২২ পিএম

কোরআনে কারিমে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন, ‘তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করো। আল্লাহর (প্রদত্ত) প্রকৃতির অনুসরণ করো, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটা সহজ-সরল দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। বিশুদ্ধ চিত্তে তার অভিমুখী হয়ে তারই তাকওয়া অবলম্বন করো, তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা করো এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।’ সুরা আর রুম : ৩০-৩১ বর্ণিত আয়াতে আল্লাহর সৃষ্টি তথা প্রকৃতি বলে ইসলাম ও তাওহিদকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মানুষকে দ্বীনে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে দ্বীন মানুষের প্রকৃতিগত, সেটাই হচ্ছে সরল ও সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন। আর মহান আল্লাহ সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্রষ্টাকে চেনার ও তাকে মেনে চলার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। এর ফলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে যদি সে যোগ্যতাকে কাজে লাগায়। কিন্তু মানুষ তার সংকীর্ণ বিবেক ও কু-প্রবৃত্তির কারণে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করে, বিভ্রান্ত হয়ে নানা পথ ও পন্থা অবলম্বন করে। যা কখনো কাম্য নয়। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ মানুষকে বুদ্ধি-বিবেক দিয়েছেন; সেটাকে কাজে লাগাতে হবে। যে ধর্মের বিষয়ে আল্লাহ-রাসুলের বিধানের বিপরীতে নিজের মর্জিকে প্রাধান্য দেবে, সে সঠিক রাস্তা থেকে সরে যাবে। আল্লাহতায়ালা এমন কিছু গুণাবলি নির্ধারণ করেছেন, যেগুলোর মাধ্যমে প্রকৃত মুমিন-মুসলমানকে সহজেই অন্যদের থেকে পৃথক করা যায়। এসব গুণাবলি অন্যতম হলো

আকিদা ও বিশ্বাসে দৃঢ়তা : মুসলিম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী ও রাসুল হিসেবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসসহ অন্য শর্তগুলো মেনে চলে। ইমানের ভিত্তির ওপর জীবন পরিচালিত করে, যা তাকে আচার-ব্যবহার, চলাফেরা, উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ও লেনদেন সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেয়। ইসলামের বিধানমতে প্রতিষ্ঠিত হয় তার জীবন-জীবিকা ও সময়। নির্ধারিত হয় তার দৃষ্টিভঙ্গি, কাজকর্ম। যাতে কোনো প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিভ্রান্তি নেই। ইসলাম এ বিষয়টির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে; কেননা জীবনে মানুষের চলার সূচনা কী হবে

সেটা একমাত্র ইসলামই নির্ধারণ করতে পারে। আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘সুতরাং তুমি জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া (প্রকৃত) কোনো মাবুদ নেই, ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার এবং মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য।’ সুরা মুহাম্মদ : ১৯

ইবাদতে সংকল্প : আল্লাহতায়ালার ইবাদত-বন্দেগি করাই হলো মুসলমানের জীবনের লক্ষ্য। তাই তাদের কাজকর্মগুলো পরিচালিত হয় নীতিবদ্ধতা, শৃঙ্খলা ও ভারসাম্যের ওপর। মুমিন ইবাদত-বন্দেগির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ, যাতে জীবনের সবদিক অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।’ সুরা আয যারিয়াত : ৫৬

এর ওপর ভিত্তি করে একজিন মুসলিম একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত করে। ইরশাদ হয়েছে, ‘তাদের এছাড়া কোনো নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে।’ সুরা বাইয়্যেনা : ৫

তবে মুমিন-মুসলমানদের ইবাদত-বন্দেগিতে হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ-অনুকরণ থাকতে হবে। যেমন হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যাতে আমার কোনো নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।’ সহিহ্ মুসলিম : ৩২৪৩

উত্তম চরিত্রের অধিকারী : একজন মুমিন ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো উত্তম আখলাক ও সুন্দর ব্যবহার। এ ক্ষেত্রে একমাত্র অনুসরণ করবে প্রথম আদর্শ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। যার প্রশংসা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ। তিনি বলেন, ‘নিশ্চয় আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী।’ সুরা আল কলম : ৪

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-কে নবী কারিম (সা.)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ‘কোরআনই ছিল তার (নবীর) চরিত্র।’ মুসনাদে আহমদ : ২৩৪৬০

মনে রাখতে হবে, ইসলাম ইবাদতের সঙ্গে আখলাককে মিলিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ একজন প্রকৃত ইবাদতকারীকে ইবাদতের মাধ্যমে তার চরিত্র সংশোধন করে নিতে হবে, সেই সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের অধিকারী হতে হবে।

জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী : প্রকৃত মুসলিম ইলম ও প্রজ্ঞার অধিকারী হবেন এবং এর ওপর জীবন অতিবাহিত করবেন। তিনি অন্যদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করবেন যেমন ব্যবহার অন্যদের থেকে আশা করেন। অন্যদের ভালোবাসবেন, তাদের কল্যাণ কামনা করবেন, তাদের জন্য কল্যাণের দোয়ার পাশাপাশি এমন কাজের প্রতি আহ্বান করবেন যা তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ বয়ে আনে।

মুসলিম কখনো স্বার্থপর হবে না, সে শুধু নিজের কল্যাণ কামনা করবে না। অন্যের নেয়ামত কুক্ষিগত করবে না, কখনো অন্যের অমঙ্গল কামনা করবে না। হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার দাওয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে একজন প্রকৃত মুসলিম মানুষকে হেদায়েত ও দিকনির্দেশনা দেবে। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। তোমাদের মানুষের কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজে বাধা প্রদান করবে। আর আল্লাহর ওপর ইমান রাখবে।' সুরা আলে ইমরান : ১১০

আল্লাহতায়ালা ভালো কাজের উৎসাহ প্রদানে বলেন, 'ওই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে এবং নিজেও নেকআমল করে, আর বলে আমি মুসলিমদের একজন।' সুরা ফুসসিলাত : ৩৩

উপরোক্ত গুণাবলির অর্জিত হলে, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা পাবে। অধিকার হরণের ঘটনা কমে যাবে। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে মানসিক শান্তি নেমে আসবে। আমরা জানি, অন্তরের প্রশান্তি ও অস্থিরতার ফলে পার্থিব জীবনে মানুষ সুখ-দুঃখের সম্মুখীন হয়। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'যারা মুমিন এবং যাদের অন্তর আল্লাহর জিকিরে প্রশান্তি লাভ করে। শোনো, আল্লাহর জিকিরেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে থাকে।' সুরা রাদ : ২৮

এর ফলে আল্লাহর পথে চলার মাধ্যমে নিরাপত্তা ও স্থিরতা অর্জিত হয়। এরই মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। আর বিপরীত পথে উল্টো ক্ষতি হয়।

উপসংহার

পবিত্র জীবনযাপনই সফলতার চাবিকাঠি। কোরআন মজিদের বাণী, 'সফল হলো তারা যারা আত্মশুদ্ধি অর্জন করল, আর ব্যর্থ মনোরথ হলো তারা যারা নিজেকে কলুষ আচ্ছন্ন করল।' (সুরা-৯১ শামস, আয়াত: ৯-১০)। 'সাবধান! একমাত্র বিশুদ্ধ ধর্মকর্মই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য।'(সুরা-৩৯ জুমার,আয়াত:৩)।

তাকওয়া বা পরহেজগারি বেশি আমল করাকে বলে না; বরং বদ আমল বা মন্দ কাজ পরিহার করে চলাই হলো তাকওয়া। প্রিয় নবীজি (সা.) বলেন, 'তুমি এভাবে আল্লাহর ইবাদত করো যেন তুমি তাঁকে দেখছ, যদি তুমি তাঁকে দেখতে না–ও পাও; তবে অবশ্যই তিনি তোমাকে দেখছেন।'(বুখারি,হাদিস: ৪৮)।

অন্তরের বিশ্বাসের প্রতিফলনই হলো সব ক্রিয়াকলাপ। একমাত্র চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমেই সফলতা তথা ইহজগতে শান্তি ও পরজগতে মুক্তি লাভ সম্ভব। এই জন্য ধর্মাচার, অনুশাসন, বিধিবিধান ও ইবাদত অনুশীলন একান্ত কর্তব্য।

মুমিন হতে হলে যে ৬টি বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস জরুরি

নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর কাছে মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থার সঙ্গে একমত, তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ের ওপর বিনা সন্দেহে বিশ্বাস থাকতে হবে। তবেই সে হবে ঈমানদার। আর তখনই তার জন্য ইসলাম হবে মনোনীত জীবন ব্যবস্থা।

যে বিষয়গুলোর প্রতি আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। সে বিষয়গুলো হলো-

>> আল্লাহর জাত ও সব সিফাতের ওপর বিনা শর্তে বিশ্বাস স্থাপন করা।

>> আল্লাহর ফেরেশতাদের ওপর বিশ্বাস পূর্ণ স্থাপন করা।

>> আসমানি কিতাবসমূহের ওপর বিশ্বাস পূর্ণ স্থাপন করা।
>> দুনিয়াতে আসা সব রাসুলদের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা।
>> পরকালের (মৃত্যু পরবর্তী জীবনের) ওপর বিনা সন্দেহে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখা।
>> আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সুনির্ধারিত ভাগ্যের ভালো ও মন্দের ওপর বিশ্বাস রাখা।

উল্লেখিত বিষয়গুলোর মধ্যে প্রথম পাঁচটির ব্যাপারে পবিত্র কুরআনুল কারিমে রয়েছে সুস্পষ্ট ঘোষণা। আর উপরের বিষয়গুলোসহ শেষটির ব্যাপারে রয়েছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুস্পষ্ট ঘোষণা।আল্লাহ তাআলা ঈমানদার বান্দার জন্য কুরআনুল কারিমে সুস্পষ্ট ভাষায় এ নির্দেশগুলোর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলেছেন। যারা এগুলোর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে তারাই মুমিন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

'রাসুল বিশ্বাস স্থাপন করেছেন ওইসব বিষয়ের প্রতি যা তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে (ওহি হিসেবে) অবতীর্ণ হয়েছে আর মুমিনরাও (তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে)। সবাই বিশ্বাস করেছেন আল্লাহর ওপর, তার ফেরেশতাদের ওপর, তার (আসমানি) কিতাবসমূহের ওপর এবং তার (বার্তাবহক হিসেবে পাঠানো) রাসুলদের ওপর। তারা বলে, আমরা তার রাসুলদের একজনকে আরেকজন থেকে আলাদা করি না।' (সুরা বাকারা : আয়াত ২৮৫)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা এ বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান আনার কথা বলার পাশাপাশি যারা তা অস্বীকার করবে তাদের ব্যাপারে ঘোষণা করেন-

'হে ঈমানদাররা! তোমরা আল্লাহ, তার রাসুল এবং তার রাসুলের ওপর অবতীর্ণ কিতাবসমূহের ওপর বিশ্বাস স্থাপন কর। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তার ফেরেশতা, তার কিতাব, তার রাসুল ও শেষ দিনকে (পরকাল) অস্বীকার করে, সে চরম পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত।' (সুরা নিসা : আয়াত ১৩৬)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়গুলোর ব্যাপারেও দিয়েছেন সুস্পষ্ট ঘোষণা। তিনি বলেছেন-

'ঈমান হলো তুমি আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতাদের প্রতি, তার (আসমানি) কিতাবসমূহের প্রতি, তার রাসুলদের প্রতি এবং শেষ দিনের (পরকালের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। আর আরও বিশ্বাস স্থাপন করবে ভাগ্যের ভালো ও মন্দের প্রতি।' (বুখারি ও মুসলিম)

হাদিসের অন্য বর্ণনা এসেছে, প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবলেছেন- 'ঈমান হলো তুমি আল্লাহ, তার সব ফেরেশতা, তার কিতাব, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত এবং তার রাসুলদের প্রতি (পূর্ণ) বিশ্বাস রাখা। আর পরকালে পুনরুত্থানের দিন (কেয়ামতের দিন) ও তকদিরের সবকিছুর (ভালো-মন্দ) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।' (মুসলিম)

সুতরাং যারা নিজেদের ইসলামের অনুসারী হিসেবে দাবি করে কিংবা মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয়, তাদের জন্য এ ৬টি বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন জরুরি। যতক্ষণ না তারা বিনা সন্দেহে ও শর্তে এ ৬টি বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমানদার বা মুমিন হতে পারবে না।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে ঈমানদার হতে এ বিষয়গুলোর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করার তাওফিক দান করুন। দুনিয়ার সার্বিক স্বচ্ছলতা ও পরকালের চিরস্থায়ী সফলতা দান করুন। আমিন।

প্রকৃত মুমিনের পরিচয় ও গুণাবলিHI MY NAME IS NAFISA AND I LUV U ইমান অর্থ বিশ্বাস। মুমিন মানে বিশ্বাসী। তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসীকে মুমিন বলা হয়। ইসলাম মানে আনুগত্য, মুসলিম অর্থ অনুগত ব্যক্তি, যিনি ইমানের সঙ্গে নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাত এবং আল্লাহ ও রাসুল (সা.)-এর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ মেনে চলেন। মুমিন ও মুসলিম জন্মগত ও বংশীয় পরিচয় নয়, বিশ্বাস ও কর্মে তা অর্জন করতে হয়। কোরআন ও হাদিসে প্রকৃত মুমিনের পরিচয় ও সফল মুমিনের গুণাবলি বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

ইমান, ইয়াকিন, ইখলাস, তাকওয়া, তাজকিয়া ও ইহসান অর্জনের মাধ্যমে ইসলাম বা আত্মসমর্পণ সফল মুমিনের গুণাবলি। আল-কোরআনের শুরুতেই বিবৃত হয়েছে, 'আলিফ লাম মিম! এই সেই মহাগ্রন্থ, যাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই, এটি মুত্তাকিনদের জন্য পথনির্দেশ। যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদের যে রিজিক-দৌলত দিয়েছি তা হতে তারা ব্যয় করে। আর যারা বিশ্বাস করে তারা আপনার প্রতি, অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি আর যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে এবং তারা পরকালের প্রতি একিন তথা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। এরা এদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের ওপরে রয়েছে এবং এরাই সফলকাম।' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ১-৫, পারা: ১, পৃষ্ঠা ১)।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন মজিদে তাঁর প্রিয় বান্দাদের পরিচয় উল্লেখ করে বলেন, 'দয়াময় আল্লাহর প্রকৃত বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের যখন অজ্ঞ লোকে মূর্খতাসুলভ সম্বোধন করে তখনো তারা সালাম ও শান্তির বাণী বলে। তারা রাত্রি যাপন করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশে সেজদায় অবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে ইবাদত-বন্দেগির মাধ্যমে এবং তারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের হতে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত করুন; উহার শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ! নিশ্চয়ই তা অস্থায়ী ও স্থায়ী আবাস হিসেবে নিকৃষ্ট!" আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপচয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না; বরং তারা মধ্যপন্থায় থাকে। তারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ বা মাবুদকে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এসব করে তারা শাস্তি ভোগ করবে, কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে তারা হীনাবস্থায় স্থিত হবে। তবে তারা নয়, যারা তওবা করে ইমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ এদের পাপ পুণ্যের দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যারা তওবা করে ও সৎকর্ম করে, তারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়। আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদার সহিত তা উপেক্ষা করে চলে। আর যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন স্মরণ

করিয়ে দিলে তার প্রতি অন্ধ ও বধিরের মতো আচরণ করে না এবং যারা প্রার্থনা করে, “হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি দান করুন যারা আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর হবে এবং আমাদের মুত্তাকিদের ইমাম বানিয়ে দিন।” এদের প্রতিদান হিসেবে দেওয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ স্থান, যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল। তাদের সেখানে অভ্যর্থনা জানানো হবে অভিবাদন ও সালাম সম্ভাষণসহকারে; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আশ্রয়স্থল ও আবাসন হিসেবে তা কতই উৎকৃষ্ট!’ (সুরা-২৫ ফুরকান, আয়াত: ৬৩-৭৬)।

পবিত্র জীবনযাপনই সফলতার চাবিকাঠি। কোরআন মজিদের বাণী, ‘সফল হলো তারা যারা আত্মশুদ্ধি অর্জন করল, আর ব্যর্থ মনোরথ হলো তারা যারা নিজেকে কলুষ আচ্ছন্ন করল।’ (সুরা-৯১ শামস, আয়াত: ৯-১০)। ‘সাবধান! একমাত্র বিশুদ্ধ ধর্মকর্মই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য।’ (সুরা-৩৯ জুমার, আয়াত: ৩)।

তাকওয়া বা পরহেজগারি বেশি আমল করাকে বলে না; বরং বদ আমল বা মন্দ কাজ পরিহার করে চলাই হলো তাকওয়া। প্রিয় নবীজি (সা.) বলেন, ‘তুমি এভাবে আল্লাহর ইবাদত করো যেন তুমি তাঁকে দেখছ, যদি তুমি তাঁকে দেখতে না–ও পাও; তবে অবশ্যই তিনি তোমাকে দেখছেন।’ (বুখারি, হাদিস: ৪৮)।

অন্তরের বিশ্বাসের প্রতিফলনই হলো সব ক্রিয়াকলাপ। একমাত্র চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমেই সফলতা তথা ইহজগতে শান্তি ও পরজগতে মুক্তি লাভ সম্ভব। এরই জন্য সব ধর্মাচার, অনুশাসন, বিধিবিধান ও ইবাদত অনুশীলন।

মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী: বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতির যুগ্ম মহাসচিব

মুমিনের জীবনে আকীদার প্রভাব:আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি

আল্লাহর পরিচয় তাঁর সবচেয়ে সুন্দর নামগুলো-আসমাউল হুসনার মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে। আল্লাহ নিজেই তাঁর এসব নাম মানুষকে জানিয়েছেন। কুরআনে আল্লাহর

এসব নাম বর্ণিত হয়েছে। এসব নামের মাধ্যমে মুমিনেরা অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার সত্তা, তার গুণাবলি ও সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের চেষ্টা করবে। আল্লাহর সবচেয়ে সুন্দর নামের অনন্য ও সর্বব্যাপক বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁর ওপর নতুন কোনো নাম ও গুণ আরোপ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ নিষিদ্ধের কারণ হলো আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মুমিনদের সরাসরি কোনোই জ্ঞান নেই। ততটুকু ছাড়া, যতটুকু তিনি পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে তাঁদেরকে জানিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার ৯৯টি গুণবাচক নাম রয়েছে। এসব নাম তাঁর গুণের পরিচয় বহন করে। নামগুলোতে আল্লাহর গুণের ঘোষণা দেয়া হয়েছে; যা মানুষের নিজের মধ্যে বিকশিত করা এবং এক অর্থে নিজের মধ্যে প্রতিবিম্বিত করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। এসব গুণের কোনোটিকে অস্বীকার করা তো কোনো ব্যক্তির মৌলিক ঈমান-আকিদাকে ধ্বংস করেই তো দেবেনই, উপরন্তু তা ইসলামের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে পরিত্যাগ করার শামিলও। আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামগুলো কুরআনের কোনো নির্দিষ্ট অংশে বর্ণিত হয়নি, পবিত্র গ্রন্থের সর্বত্র এসব নাম ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। পবিত্র কুরআন এসব নাম সম্পর্কে মুমিনদের নিম্নোক্ত নির্দেশ দিয়েছে :

'আল্লাহর বিভিন্ন সুন্দর নাম রয়েছে, তাই তাঁকে ওই নামে ডাকবে, যারা তাঁর নামসমূহের প্রতি অবজ্ঞা দেখায় তাঁদেরকে পরিহার করে চলো।' 'বলো : তোমরা আল্লাহকে ডাক আল্লাহ বা আল রহমান বলে, আল্লাহরই জন্য রয়েছে সর্বোচ্চ সুন্দর নামসমূহ' (১৭ : ১১০)।

আল্লাহর গুণগুলো উল্লেখ করে কুরআন আল্লাহর কোনোরূপ কল্পনা অথবা তার সদৃশ কিছু মনে করা, যা তাকে খর্ব বা নির্দিষ্ট আকারের মধ্যে সীমিত করতে পারে এমন যেকোনো চেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করেছে'

'কোন চোখ তাকে দেখতে পায়, অথচ সবকিছুই তাঁর দৃষ্টির আওতায়। তিনি সবকিছুর খবর রাখেন' (৬ :১০৩)

এ আয়াতের সবশেষ দুটি শব্দে আল্লাহর দুটি গুণবাচক নাম উল্লিখিত হয়েছে : এ আয়াত থেকে দেখা গেছে, কাউকেই, এমনকি রাসূল সা:-কেও আল্লাহ তায়ালাকে চর্মচোখে দেখার অনুমতি দেয়া হয়নি। কুরআন থেকে জানতে পারি যে, আল্লাহ'র নবী মূসা আ: আল্লাহকে দেখার চেষ্টা করেছিলেন। যখন তিনি সত্যি সত্যিই মহান আল্লাহকে দেখার জন্য অনুরোধ করেন, তখন মূসা আ:-কে বলা হয় :

'তুমি আমাকে দেখতে পাবে না, তবে পর্বতের দিকে দৃষ্টি ফেরাও, তুমি যদি পর্বতকে তার স্থানে স্থিতিশীল দেখতে পাও, তা হলে আমাকে দেখতে পাবে...।'

এ কাহিনীতে আরো বলা হয় যে, আল্লাহ যখন পর্বতের ওপর এসে দেখা দেন তখন (ওই দিকে তাকিয়ে) মূসা আ: জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। যখন তাঁর জ্ঞান আসে; তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং তওবা করেন এবং আল্লাহর প্রতি তাঁর ঈমানের সাক্ষ্য ঘোষণা করেন (৭ : ১৪৩)।

এভাবে কুরআনের সাক্ষ্যপ্রমাণ আল্লাহর অলৌকিক সত্তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে; তিনি সম্পূর্ণভাবে মানবচিন্তার অতীত এবং মানুষের পক্ষে তার কোনো সংজ্ঞা দান আসবে। এটি করার যেকোনো চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। তাই শরিয়াহ আল্লাহর অসীম সত্তার ব্যাপারে যেকোনো ত্রুটিপূর্ণ ধারণা রোধের লক্ষ্যে তার সত্তা সম্পর্কে কোনো ধরনের আলোচনা করাকে নিরুৎসাহিত করেছে।

আল্লাহর সুন্দর নামগুলোর অর্থ যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, ঠিক সেভাবেই তা গ্রহণ করতে হবে। এগুলো আক্ষরিক অর্থে আল্লাহর গুণাবলি প্রকাশ করেছে। অবশ্য কুরআনের কিছু আয়াতে মানবসত্তার কিছু দৃষ্টান্ত দেখা যায় (আল্লাহর চোখ, ১১ : ৩৭, তাঁর মুখ ৪ : ২৭, ইত্যাদি)। যা ধর্ম শাস্ত্র আলোচনার ক্ষেত্রে বিতর্কের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আশারিয়া, মুতাযিলা ও মাতুরদিয়া গ্রুপ, এ বিতর্কের যে মূল বিষয় উত্থাপন করেছে তা হলো- এ গুণের বাস্তবতা এবং আল্লাহর সত্তার সাথে তার সম্পর্ক।

এ বিষয়ে আলেমরা যে বিতর্কিত গোষ্ঠীকে তীব্র নিন্দা করেছেন, সেটি হলো : ‘আহমিয়া। এ গোষ্ঠীটি হলো মুতাযিলা সম্প্রদায়ের একটি উপদল। এ দলটির শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব জাহম ইবনে সাফওয়ানের নাম অনুসারে এদেরকে জাহমিয়া নামকরণ করা হয়েছে। মূলত তিনি ছিলেন খোরাসানের অধিবাসী, বাস করতেন কুফা নগরীতে। তিনি উমাইয়া গভর্নর আল হারিস ইবনে গুরাইয়ার প্রধান খতিব ছিলেন। পরবর্তীকালে তাদের উভয়কে বিদ্রোহ করার অপরাধে ১২৮ হিজরিতে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে বিতর্কিত মত প্রকাশক করে জাহম খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি আল্লাহর গুণাবলি আক্ষরিক অর্থের সাহায্যে বোঝা যাবে না, এগুলো প্রতীকী অর্থ (মু’য়াওয়াল) প্রকাশ করেছে। জাহম মনে করেন যে, যদি এর আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহলে মানব জীবসত্তা বোঝাবে আর এভাবে আল্লাহর সৃষ্টিতে তার সদৃশ তৈরি হবে; তাই তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে প্রতীকী অর্থ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ চিন্তাধারার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে জাহম আরো অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আল্লাহর অবশিষ্ট সৃষ্টির মতো কুরআনও সৃষ্টি করা হয়েছে। সাধারণ অর্থে যেহেতু আল্লাহ কথা বলেন না; তাই স্বাভাবিক অর্থে কুরআন ও তাঁর বাণী নয়। আমরা প্রতীকী ব্যাখ্যা (তাবিল) দিয়ে বড়জোর একে বাণীর প্রতীক বলতে পারি।

শতাব্দীর পর শতাব্দীর ধরে ‘আলেমরা’ এ মতকে কঠোর ভাষায় নিন্দা ও খণ্ডন করে দিয়েছেন, তারা এ মত ব্যক্ত করেন যে, কুরআনে আল্লাহর যে গুণের বর্ণনা রয়েছে, তা আক্ষরিক অর্থে উপলব্ধি করতে হবে এবং এসবের যেকোনো দূরবর্তী বা প্রতীকী ব্যাখ্যা প্রদান অবশ্যই পরিহার করতে হবে। এ আলোকে আল গাযালি বলেন, অনুসরণযোগ্য সঠিক উপায়ে হচ্ছে আক্ষরিক অর্থের কোনোরূপ পরিবর্তন করা থেকে নিবৃত্ত থাকা এবং সাহাবীরা অনুমোদন করেননি এমন যেকোনো ব্যাখ্যা প্রবর্তনের ব্যাপারে সতর্ক থাকা। আল গাযালি কুরআনে দ্ব্যর্থবোধক বা রহস্যজনক (মুতাশাবিহাত) যেসব বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, সে সম্পর্কেও এই একই অভিমত ব্যক্ত করেন। এ ব্যাপারে ঈমানদাররা কী ধরনের মনোভাব গ্রহণ করবে, সে সম্পর্কে রাসূল সা:-এর সুন্নাহতে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। হাদিসের শিক্ষা অনুসারে ঈমানদারদের বলা হয়েছে:

‘তোমারা আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করবে, তবে আল্লাহ সম্পর্কে নয়। কারণ তোমরা কখনো তাঁর প্রতি সুবিচার করতে সক্ষম হবে না।’

মানবসত্তাকে তার স্রষ্টার সংজ্ঞা দেয়ার মতে ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি; এ বিষয়টি ধরে নিয়ে তার ভিত্তিতেই এ বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। অবশ্য মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত গুণাবলির বিষয়ে অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা দিতে পারে কারণ, এ বিষয় সে অবহিত অথবা তার পক্ষে জানা সম্ভব। এভাবে কুরআনে আভাস দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হচ্ছে সরাসরি তার সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত কুরআনের অসংখ্য আয়াতে (২:২১৯, ৭:১১৭ ইত্যাদি) আল্লাহর সৃষ্টির নিদর্শনের প্রতি মনোযোগ দেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে, যাতে আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও সর্বব্যাপকতার নিদর্শন ও সাক্ষ্য প্রতিফলিত হয়েছে। এভাবে আমাদের চার পাশের বিশ্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ ছাড়া, এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর গুণাবলি ও তার গুণবাচক নামগুলোর ব্যাপারে আমাদের উপলব্ধিকেও বৃদ্ধি করতে পারব।

যেহেতু মহাজগৎ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান অসম্পূর্ণ; তাই মহাজগতের স্রষ্টা সম্পর্কে জ্ঞান অবশ্যই একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং এ সম্পর্কে পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব নয়। আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে ‘অনুসন্ধান’-এর প্রচেষ্টাকে অলস ও বিপজ্জনক এবং (আবাস ওয়া মুহলিকাহ) অসীম পাথারে তল খোঁজার চেষ্টা বলে উল্লেখ করে আবদুল্লাহ বলেন, এটি করা মানব সাধ্যের অতীত, এটি করা বিপজ্জনক কেননা এতে ঈমানের ক্ষেত্রে ত্রুটির পথ প্রশস্ত হয়। আল্লাহর সত্তাকে সুনির্দিষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে- অসীমকে সীমার মাধ্যমে বাধার প্রয়াস, যা মূলত মহান আল্লাহতা’আলার সত্তাকে খর্ব করার শামিল। অনুবাদ : সাজজাদুল ইসলাম

পরকালে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ

আল্লাহ তাআলা পরকালে তাঁর অনুগত বান্দাদের জন্য শ্রেষ্ঠ উপহারস্বরূপ তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এ সাক্ষাতে চলে অনন্তকাল। তা হবে বান্দার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার প্রেমের সাক্ষাৎ।এছাড়া প্রতিটি মানুষ কিয়ামতের দিন তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। চাই সে ভালো আমল করুক বা খারাপ আমল করুক। হোক সে মুমিন নতুবা কাফের।আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন মুমিন বান্দার সঙ্গে যে সাক্ষাৎ দেবেন, সে সম্পর্কে তিনি বলেন, 'যেদিন আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবে; সেদিন তাদের অভিবাদন হবে সালাম। তিনি তাদের জন্য সম্মানজনক পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।' (সুরা আহজাব : আয়াহ ৪৪)

আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার ঈমানদারদের সুসংবাদ প্রদানে ইরশাদ করেন, 'আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ, আল্লাহর সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাৎ করতেই হবে। আর যারা ঈমানদার তাদের সুসংবাদ জানিয়ে দাও।' (সুরা বাকারা : আয়াত ২২৩)

আল্লাহ তাআলা দিদার লাভ করা সহজ ব্যাপার নয়; তাও তিনি কুরআনে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে, 'হে মানুষ! তোমাকে তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পৌঁছতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতপর তার সাক্ষাৎ ঘটবে।' (সুরা ইনশিকাক : আয়াত ৬)

পরিশেষে...

যারা আল্লাহ সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করার প্রত্যাশী তাদের মাওলার পাঠানো কুরআন অনুযায়ী জীবন-যাপন করা আবশ্যক। যারা আল্লাহ বিধি-বিধান পালন করে তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে সক্ষম হবে, তারাই সফলকাম হবে। তাদের জন্যই রয়েছে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের মহা সুযোগ।

হাদিসে এসেছে-

হজরত ওবাদা ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত করা পছন্দ করে; আল্লাহও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা অপছন্দ করেন; আল্লাহও তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাকে অপছন্দ করেন। (বুখারি ও মুসলিম

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ তাআলার দিদার লাভ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

ঈমান সুদৃঢ় করার ১০ আমল

আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করা: আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোতে আল্লাহর বড়ত্বের ধারণা পাওয়া যায়, যা আল্লাহর ওপর মানুষের ঈমানকে আরো দৃঢ় করে। তাই প্রতিটি মুসলমানের উচিত, আল্লাহর গুণবাচক নামগুলো জানা, মুখস্থ করা ও তার অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করা, তা ছাড়া মহান আল্লাহর গুণবাচক নাম আত্মস্থ করার বিশেষ ফজিলত আছে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহর নিরানব্বই অর্থাৎ এক কম এক শটি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি তা মনে রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (বুখারি, হাদিস : ২৭৩৬)

কোরআনের আয়াত নিয়ে গবেষণা করা: পবিত্র কোরআনের আয়াত নিয়ে গবেষণা করলে শুধু জ্ঞানের পরিধিই বড় হয় না; বরং আল্লাহর প্রতি মুমিনের ঈমানও আরো বৃদ্ধি পায়।

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, মুমিন তো তারাই আল্লাহর কথা আলোচিত হলে যাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, আর তাদের কাছে যখন তাঁর আয়াত পঠিত হয়, তখন

তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে, আর তারা তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে। (সুরা আনফাল, আয়াত : ২)

প্রিয় নবীজি (সা.)-এর সিরাতজ্ঞান অর্জন করা: নবীজির জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে মুমিনের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে। নবীজি হলেন সর্বোত্তম চরিত্রের মডেল। দুনিয়া-আখিরাতের সফলতা অর্জনের নবীজি (সা.)-এর অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই।

নবীজি (সা.)-এর অনুসরণে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ বলেন, 'বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন, তোমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করবেন আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু, (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৩১)

আর নবীজি (সা.)-এর অনুসরণের জন্য সিরাতজ্ঞান অর্জন করা আবশ্যকীয়, যা মানুষের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর কাছে প্রিয় হতে সাহায্য করে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও নিজের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করা: মহান আল্লাহ আমাদের জন্য গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিয়োজিত করে রেখেছেন, সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা তিনিই, নিয়ন্ত্রকও তিনিই, মহান আল্লাহর সৃষ্টিগুলো নিয়ে চিন্তা করলে মুমিনের ঈমান আরো বেড়ে যায়। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শনাবলি রয়েছে।' (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৯০)

এমনিভাবে মানুষের নিজের অস্তিত্বের মধ্যেও মহান আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে, যেগুলো বিবেকবান লোকদের ঈমান বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে, ইরশাদ হয়েছে, সুনিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে নিদর্শন, তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি দেখো না?' (সুরা : জারিয়াত, আয়াত : ২০-২১)

অধিক পরিমাণ জিকির ও দোয়া : অধিক পরিমাণে জিকির করলে আল্লাহর প্রতি ঈমান বাড়ে, ফলে অন্তর প্রশান্ত হয়, পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের প্রশান্ত হয়, জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরগুলো সত্যিকারের প্রশান্তি লাভ করে।' (সুরা : আর-রাদ, আয়াত : ২৮)

দ্বিনের সৌন্দর্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া : ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইসলামের বিধি-বিধান, আকিদার সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও এর ওপর আমল মানুষের দুনিয়া-আখিরাতকে সুন্দর করে, ঈমানকে মজবুত করে, পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা জেনে রাখো যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসুল রয়েছেন, সে যদি অধিকাংশ বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে নিত, তাহলে তোমরা অবশ্যই কষ্টে পতিত হতে, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তা তোমাদের অন্তরে সুশোভিত করেছেন।' (সুরা : হুজুরাত, আয়াত : ৭)

ইহসান অবলম্বন করা : 'ইহসান' মানুষের ঈমান বৃদ্ধি করে, নবীজি (সা.)-এর ভাষায় ইবাদতের ক্ষেত্রে ইহসান হলো, আপনি এমন ভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন, যেন আপনি তাঁকে দেখছেন, আর যদি আপনি তাঁকে দেখতে না পান তবে (মনে করবেন) তিনি আপনাকে দেখছেন।' (বুখারি, হাদিস : ৫০)

ইহসানের আরেক অর্থ হলো, মানুষের সঙ্গে সদাচরণ করা। এটিও মানুষের ঈমান বৃদ্ধি করে, আল্লাহর প্রিয় করে।

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মাখলুকের প্রতি ইহসান করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমা লঙ্ঘন করতে, তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ কর।' (সুরা : নাহল, আয়াত : ৯০)

আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়া : ঈমান দৃঢ় করার অন্যতম মাধ্যম হলো, মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা, এতে নিজের মধ্যেও ইবাদতের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে,

ঈমান বৃদ্ধি পাবে, মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে তাঁর পথে আহ্বানকারীদের প্রশংসা করেছেন, ইরশাদ হয়েছে, 'আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।' (সুরা হা-মিম সাজদা, আয়াত : ৩৩)

ইসলামী বিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিষয় পরিহার করা : ঈমানের দৃঢ়তা অর্জনে এর বিকল্প নেই। একটি ম্যাচের কাঠি যেমন কোটি টাকার সম্পত্তি পুড়িয়ে দিতে পারে। তেমনি একটি ঈমান বিধ্বংসী কাজ ও বিশ্বাস মানুষের সব আমল অর্থহীন করে দিতে পারে। পবিত্র কোরআনে এর উদাহরণ হলো, 'তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে যে তার এমন একটা খেজুর ও আঙুরের বাগান হোক, যার নিচ দিয়ে ঝরনাধারা প্রবাহিত, তার জন্য তাতে সব রকম ফল আছে, আর তার বার্ধক্যও সমুপস্থিত, তার কতকগুলো সন্তান-সন্ততি আছে যারা কাজকর্মের লায়েক নয়, এ অবস্থায় বাগানের ওপর অগ্নি হাওয়া বয়ে গেল, যার ফলে সেটি জ্বলে গেল? আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ এভাবে বর্ণনা করছেন, যাতে তোমরা চিন্তা করে দেখ।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ২৬৬)

দুনিয়ার হাকিকত সম্পর্কে সচেতন হওয়া : দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, দুনিয়া অর্জনই মানুষের মূল লক্ষ্য হতে পারে না। মানুষ দুনিয়াতে ক্ষণিকের অতিথি মাত্র। পৃথিবীর ইতিহাসে দুনিয়াতে বহু রাজা-ধিরাজ অতিবাহিত হয়েছে; কিন্তু পৃথিবীতে তাদের কারো কারো কোনো চিহ্নই নেই। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে দুনিয়ার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে বলেন, 'দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেমন আকাশ থেকে আমি পানি বর্ষণ করি যার সংস্পর্শে ঘন সন্নিবিষ্ট ভূমিজাত উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাথেকে ভক্ষণ করে মানুষ আর জীবজন্তু, অবশেষে জমিন যখন সোনালি রূপ ধারণ করে আর শোভামণ্ডিত হয়, আর তার মালিকগণ ভাবতে থাকে যে ওগুলো তাদের হাতের মুঠোয়, তখন রাত্রিকালে কিংবা দিনের বেলা আমার নির্দেশ এসে পড়ে আর আমি ওগুলো এমনভাবে ধ্বংস করে দিই, মনে হয় যেন গতকাল সেখানে কোনো কিছুই ছিল না, এভাবে আমি আমার নিদর্শনগুলোকে বিশদভাবে বর্ণনা করি ওই সমপ্রদায়ের জন্য, যারা চিন্তাভাবনা করে বুঝতে চেষ্টা করে।' (সুরা ইউনুস, আয়াত : ২৪)

অতএব, ঈমান সুদৃঢ় করতে হলে দুনিয়ার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে, আখিরাতকে প্রাধান্য দিতে হবে।

মুহাম্মদ সা: কবরে সশরীরে জীবিত এবং কেয়ামত পর্যন্ত সব কিছু দেখবেন!

মাদরাসার পাঠ্যবইয়ে লেখা হয়েছে হজরত মুহাম্মদ সা: কবরে সশরীরে জীবিত আছেন। তিনি আমাদের আমলসমূহ পর্যবেক্ষণ করছেন। কেয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টির সব অবস্থা তিনি অবলোকন করবেন। মৃত্যুর পরপরই তার রূহ মোবারককে আবার দেহ মোবারকে ফেরত দেয়া হয়েছে।

অষ্টম শ্রেণীর জন্য পাঠ্য আকাইদ ও ফিকহ বইয়ের ৫৪ পৃষ্ঠার একটি পাঠের শিরোনাম 'রসুল সা. হায়াতুন্নবি'। এখানে লেখা হয়েছে 'মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবন শুরু হয় সৃষ্টির সূচনাতে যখন আল্লাহ ছাড়া কিছুই ছিল না। তিনি প্রকাশ পান ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে, ইন্তেকালের পরও আবার জীবন লাভ করেন। রওযা পাকে সশরীরে তিনি জীবিত আছেন এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'তের আকিদা'। এরপর এ পৃষ্ঠায় আরো লেখা হয়েছে 'নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রওযা মোবারকে দাফন করার পরপরই আল্লাহ তায়ালা তাঁর রুহ মোবারককে ফেরত দেন এবং রুহ মোবারক দেহ মোবারকের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত সব সময় অবস্থান করতে থাকবে, যাতে তিনি তার প্রতি দরুদ ও সালাম পেশকারি উম্মতের সালামের জবাব দিতে পারেন (সিফাউস সিকাম-আল্লামা সুবকি)।

তাই আমাদের এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, প্রিয়নবি রওযা পাকে সশরীরে জীবিত। তিনি উম্মতের সালামের জবাব দিচ্ছেন।'অষ্টম শ্রেণীর আকাইদ ও ফিকহ বইটির চতুর্থ অধ্যায়ের নাম 'আল ইমান বির রসুল। এ অধ্যায়ের অধীনে ৫০ পৃষ্ঠায় একটি পাঠ হলো নবি সা. এর আগমনের উদ্দেশ্য। এখানে হযরত মুহম্মদ সা. সম্পর্কে লেখা হয়েছে 'কিয়ামত পর্যন্ত সকল সৃষ্টির অবস্থা অবলোকন করবেন এবং আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দেবেন।'

মাদরাসায় নবম-দশম শ্রেণীর জন্য পাঠ্য আকাইদ ও ফিকহ বইয়ের ২৬ পৃষ্ঠায় তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম হলো 'ইমান বির রসুল'। এখানে মহানবী সা: কবরে সশরীরে জীবিত এ দাবির পক্ষে ব্যাখ্যা দিয়ে লেখা হয়েছে 'নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকালের পর এক বিশেষ ধরনের জীবন রয়েছে,তার শারীরিকভাবে বিদ্যমানতা ও বরযখী জীবন প্রণিধানযোগ্য। অকাট্য দলিলের আলোকেই সকল নবি আপন আপন মাযারে জীবিত আছেন এবং সালাত আদায় করছেন। আল্লাহ পাক শহিদদের প্রসঙ্গে বলেছেন, বরং তারা জীবিত, তাদের প্রভুর কাছ থেকে রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছেন (আল ইমরান ১৬৯)। আর বলা বাহুল্য যে, নবিগণ শহিদদের তুলনায় উচ্চ মর্যাদার। সে কারণে তাদের বরযখী জীবনের শক্তি শহিদ থেকে আরো বেশি পূর্ণাঙ্গ। রাসূল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক নবিদের দেহ ভক্ষণ করা জমিনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন, নবিগণ জীবিত এবং রিযিক পাচ্ছেন। তিনি আরো বলেন, নবিগণ তাদের নিজ নিজ কবরে জীবিত। সুতরাং বুঝা গেল, সাধারণ ইমানদারদের থেকে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক ধরনের বিশেষ বরযখী জিন্দেগী আছে নবিদের। আমাদের প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বরযখী হায়াত অন্যান্য নবিদের চেয়েও অধিকতর পরিপূর্ণ যা অতীব স্পষ্ট, তিনি আমাদের আমলসমূহ পর্যবেক্ষণ করছেন।'নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যবই আকাইদ ও ফিকহ বইয়ের ১৩৩ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে 'নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা মুবারক যেয়ারত করা আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম প্রধান উপায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা একথা বলে আমাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, আর যদি তারা নিজেদের আত্মার উপর জুলুম করে এবং আপনার কাছে এসে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রসুল তাদের জন্য সুপারিশ করেন তবে তারা আল্লাহকে পাবে তওবা কবুলকারি দয়াবান (নিসা ৬৪)। এরপর লেখা হয়েছে, এই আয়াত রসুল সা. এর দরবারে যাওয়ার উৎসাহ প্রদান, তার দরবারে গিয়ে ইস্তেগফার করা এবং গুনাহগারের জন্য আল্লাহর দরবারে তার সুপারিশ-চায় তা তার জীবদ্দশায় কিংবা ওফাতের পর-এসব কিছুর উপর নির্দেশ প্রদান করে। রওজা শরীফে এ জন্য যাওয়া উত্তম কেননা,

প্রিয়নবি সশরীরে রওজাপাকে জীবিত। তিনি তার উম্মতের সালামের জওয়াব দেন। নবী করিম সা. হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, যে আমার রওজা যিয়ারত করবে তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে। (বায়হাকি, দারেকুতনি)

আল্লাহর হাবিব সা. আরো বলেন, যে ব্যক্তি আমার ইন্তেকালের পর আমার রওজা যিয়ারত করবে সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করল। (তবারানি, মুজামুল আওসাত)

১৩৫ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে রসুলের দরবারে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দেয়া মুনাফিকদের অভ্যাস এবং তাঁর দরবারে একনিষ্ঠ হয়ে থাকা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের পাথেয়। রসুলের দরবার বলতে এখানে রসুলের রওজা বোঝানো হয়েছে। বিশিষ্ট আলেমদের অভিমত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার আল হাদিস বিভাগের প্রফেসর ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আল ফিকহ্ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ড. আবু বকর মুহাম্মদ জাকারিয়া মজুমদার দু'জনে একই মত পোষণ করে বলেন, রসুল সা: কবরে সশরীরে জীবিত, কেয়ামত পর্যন্ত তিনি সৃষ্টির সকল অবস্থা অবলোকন করবেন এ কথা বিশ্বাস করা শিরক। সৃষ্টির সকল অবস্থা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ অবলোকন করতে পারে না। রসুল সা:-এর ক্ষমতা আছে বিশ্বাস করলে তাকে আল্লাহর সমকক্ষ করা হয়। তা ছাড়া সৃষ্টির সূচনাতে যখন আল্লাহ ছাড়া কেউ ছিল না তখন রসুল সা: ছিলেন এ কথা বিশ্বাস করাও শিরক এবং তাকে আল্লাহর সমকক্ষ করার শামিল। আর রসুলের মাজারে যাওয়ার সমর্থনে সূরা নিসার যে ৬৪ নম্বর আয়াত ব্যবহার করা হয়েছে তাও মিথ্যা। এ আয়াত মাজারে যাওয়ার সপক্ষে নয় বরং রসুল সা: জীবিত অবস্থায় জীবিত পাপী মুনাফিকদের বিষয়ে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। সূরা নিসার ৬৪ নং আয়াতের আগের তিনটি আয়াত পড়লেই তা যে কারোর কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এটি বোঝার জন্য কোনো ব্যাখ্যা বা তাফসিরেরও দরকার নেই। এ দুই শিক্ষক বলেন, শহিদগণ জীবিত তা আল্লাহ কুরআনে বলেছেন। কিন্তু সেই জীবিত আখেরাতে যেমন করে জীবিত থাকা বোঝায় সেটি বোঝানো হয়েছে; জাগতিক জীবনের মতো করে নয়। জাগতিক জীবনের মতো করে তারা সশরীরে কেউ

জীবিত নেই। রসুল সা:ও জাগতিক জীবনের নিয়মে সশরীরে কবরে জীবিত নেই। আখিরাতের নিয়মে তিনি জীবিত। কবরে তিনি সশরীরে জীবিত আছেন এ বিশ্বাস মানুষকে শিরক ও কবর পূজার দিকে ধাবিত করে। প্রফেসর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর বলেন, রাসূলুল্লাহ সা:-এর ইন্তেকালের পরের ঘটনাগুলো বুখারি, মুসলিম ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে পাঠ করলে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, সাহাবীরা রাসূলুল্লাহকে কবরের মধ্যে কখনোই জাগতিক জীবনের অধিকারী বলে মনে করেননি।

শাইখ যাকারিয়া ইসলামিক রিসার্স সেন্টারের মহাপরিচালক মুফতি মুহাদ্দিস এম মিজানুর রহমান বলেন, রসুল সা: কবরে সশরীরে জীবিত এ বিষয়টা এমনভাবে পাঠ্যবইয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে শিরক বিদ'আতের প্রতি উৎসাহিত করবে মানুষকে। মাদরাসা বায়তুল উলুমের মুহতামিম মুফতি মাওলানা জাফর আহমাদ বলেন, আমরা হায়াতুন্নবীতে বিশ্বাস করি। কিন্তু তিনি কবরে বসে সব কিছু দেখছেন এটা বিশ্বাস করা শিরক।

(এ সিরিজ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয় ২০১৪ সালে। তখন প্রফেসর ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর জীবিত ছিলেন। ২০১৪ সালে সিরিজ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হলেও তখনকার বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণে প্রতিবেদন প্রকাশ স্থগিত রাখা হয়। আজকের প্রতিবেদনের বিষয় ২০১৪ সালের পাঠ্যবইয়ে যেমন ছিল ২০১৯ সালের পাঠ্যবইয়েও তেমন রয়েছে।

সম্মান ও ক্ষমতার মালিক আল্লাহ

আল্লাহ ছাড়া আনুগত্য পাওয়ার মতো আর কেউ নেই, তিনি বাদশাহ, অতি পবিত্র, শান্তির আধার, নিরাপত্তাদাতা, রক্ষক, সবার ওপর বিজয়ী, নিজ হুকুম প্রয়োগে পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং প্রবল পরাক্রমশালী। সবকিছুর ওপর ক্ষমতাশালী এবং ক্ষমতার নিরঙ্কুশ মালিক।

এ প্রসঙ্গে কোরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে, ‘বলুন ইয়া আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমান কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। ’ -সূরা আল ইমরান : ২৬

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহতায়ালার সর্বময় ক্ষমতার প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ যাকে চান সাম্রাজ্য দান করেন আবার যার কাছ থেকে চান সাম্রাজ্য কেড়ে নেন। যাকে চান সম্মান দান করেন, আবার যাকে চান অপমানিত করেন, সব কল্যাণ তার কাছে। পবিত্র কোরাআনে কারিমের এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন রাজ শক্তির উত্থান-পতন আর সাম্রাজ্যের পট-পরিবর্তন হয়ে থাকে একমাত্র আল্লাহতায়ালার ইচ্ছায়। বর্ণিত আয়াতে জগতের বৈপ্লবিক ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞ এবং অতীতকালের শক্তিশালী জাতিগুলোর উত্থান-পতনের ইতিহাস সম্পর্কে উদাসীনদের হুঁশিয়ার করা হয়েছে। স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে, এ জগতের সব শক্তি ও রাষ্ট্রক্ষমতা একমাত্র আল্লাহতায়ালার করায়ত্ত। সম্মান ও অপমান তারই নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি দরিদ্র ও পথের ভিখারীকে রাজ সিংহাসন ও মুকুটের অধিকারী করতে পারেন এবং প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটের হাত থেকে রাষ্ট্র ও ঐশ্বর্য ছিনিয়ে নিতে পারেন। এ আয়াতের শেষাংশেই বলা হয়েছে, আল্লাহর হাতেই যাবতীয় কল্যাণ। আয়াতের প্রথমাংশে রাজত্ব দান করা ও ছিনিয়ে নেয়া এবং সম্মান ও অপমান উভয়দিক উল্লেখ করা হয়েছিল। এ কারণে এখানে খায়ের বা কল্যাণ শব্দ ব্যবহার করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে বিষয়কে কোনো ব্যক্তি বা জাতি অকল্যাণকর বা বিপজ্জনক মনে করে, তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা জাতির জন্য আপাতদৃষ্টিতে অকল্যাণকর ও বিপজ্জনক মনে হলেও পরিণামের সামগ্রিক দিক দিয়ে তা অকল্যাণকর নাও হতে পারে। মোট কথা, আমরা যেসব বিষয়কে মন্দ বলি, সেগুলো পুরোপুরি মন্দ নয় আংশিক মন্দ মাত্র। আল্লাহপাক রাব্বুল আলামিনের দিকে সম্বন্ধ এবং সামগ্রিক

উপযোগিতার দিক দিয়ে কোনো বস্তুই মন্দ নয়। আর এই বিশ্বাসই মুমিনের পথ চলার অবলম্বন ও ঈমানের দাবি।

বস্তুত রাষ্ট্র অর্জন এবং তা পরিচালনার ক্ষেত্রে যারা শক্তিকেই অবলম্বন মনে করেন, তারা স্পষ্ট ভুলের মধ্যে আছেন। কারণ ক্ষমতার জন্য রক্তপাত ও অত্যাচারকে ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, হজরত আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহতায়ালা অত্যাচারীকে অবকাশ দেন (অর্থাৎ তাকে তৎক্ষণাৎ ধরেন না, ঢিল দেন, সুযোগ দেন যাতে সে আরও জুলুম করতে পারে)। এরপর তাকে এমনভাবে পাকড়াও করেন, সে আর ছুটে যেতে পারে না। এরপর নবী (সা.) আয়াত পাঠ করেন; অর্থাৎ এইরূপ তোমার প্রভুর পাকড়াও যে যখন তিনি অত্যাচারী গ্রামবাসীকে পাকড়াও করেন...। -বোখারি ও মুসলিম

মোট কথা, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দেন, যার থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন। মূলত আল্লাহ বান্দাকে ক্ষমতা দিয়ে পরীক্ষা করেন। কেউ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হন, অনেকেই পারেন না। ক্ষমতার এই পালাবদলের মাঝে যারা বুদ্ধিমান, তাদের জন্য রয়েছে শিক্ষা।

বিশ্বব্যাপী চলমান ক্ষমতার দ্বন্দ্বে নিপতিত গোষ্ঠী বা সরকারপ্রধানরা ক্ষমতাকে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত মনে না করাই সব অনিষ্টের মূল। মনে রাখবেন, পৃথিবী এখন গতিময়; এগিয়েছে বেশ। এর পরও ক্ষমতাসীনরা নিজেদের মনোভাব শাসক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে ফেলতে পারেনি। তারা জনগণের বন্ধু হতে পারেনি। ক্ষমতার মোহ, সম্পদের লালসা আর কায়েমি স্বার্থে অন্ধ এসব শাসকের পবিত্র কোরআনে কারিমের এই আয়াত একটি জরুরি বার্তা। কিন্তু একথাটি ক'জন বুঝেন- সেটাই প্রশ্ন!

ফেরেশতা:

ফেরেশতা (আরবি: ملاءكة) ইসলামী বিশ্বাসমতে স্বর্গীয় দূত। আরবিতে ফেরেশতাদের একবচনে *মালাক* ও বহুবচনে *মালাইক* বলে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়, তারা মানুষের ন্যায় আল্লাহর আরেক সৃষ্টি।

তাঁরা দিনরাত ক্লান্ত না হয়ে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করেন[১] এবং আল্লাহর অবাধ্য হবার কোনো ক্ষমতা তাদের নেই। ফেরেশতারা নূর তথা আলোর তৈরি।[২] তারা পবিত্র স্থানে অবস্থান করেন। তারা যেকোনো স্থানে গমনাগমন ও আকৃতি পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখেন। ইসলাম, খ্রিস্টান ও ইহুদী ধর্মে বলা হয়েছে ।

কুরআনে ফেরেশতাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

"তারা আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে।"[কুরআন ৬৬:৬]

আল কুরআনে ফেরেশতাগণ

- জিবরাইল ও মিকাইলের নাম আল কুরআনের সুরা বাকারার ৯৭-৯৮ নং আয়াতে উল্লেখ রয়েছে।[৮]
- মালিক ফেরেশতার নাম ৪৩ নং সূরা আয-যুখরফে ৭৭ নং আয়াতে উল্লেখ আছে।[৯]

তথ্যসূত্র

1. ↑ কুরআন ২১:২০
2. ↑ *"Angels"। ১০ এপ্রিল ২০১২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬।*
3. ↑ কুরআন ১৬:১০২
4. ↑ কুরআন ২:৯৮
5. ↑ কুরআন ৩২:১১
6. ↑ *"Darda'il on Dinul-islam.org"। ২৫ জুলাই ২০১১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১১।*
7. ↑ কুরআন ৮২:১০–১১
8. ↑ কুরআন ২:৯৭–৯৮
9. ↑ কুরআন ৪৩:৭৭

জ্বীন জাতি

ইসলাম অনুযায়ী অদৃশ্য এক জাতি

জ্বীন জাতি (বিকল্প বানান **জিন**) হলো ইসলাম ধর্মের মূল গ্রন্থ কুরআনে বর্ণিত একটি জীব/ সৃষ্টি। প্রাক ইসলামী যুগেও জ্বীন জাতি সংক্রান্ত বিশ্বাস আরবসহ বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মাঝে প্রচলিত ছিল। আরবি জ্বীন শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল যা গুপ্ত, অদৃশ্য, অন্তরালে বসবাসকারী অথবা অনেক দূরবর্তী। [১] বিজ্ঞান এখনও জ্বীনের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারেনি। তবে বিভিন্ন সমাজে কিছু কিছু মানুষ কর্তৃক জ্বীন বশ

করা বা জ্বীনের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়টি প্রচলিত আছে। ইসলামি বিশ্বাস মতে, জীনের অস্তিত্ব কুরআন দ্বারা প্রমাণিত।[২][৩]

ইসলামে জ্বীন সংক্রান্ত বিশ্বাস

কুরআন অনুসারে জ্বীন জাতি মানুষের ন্যায় আল্লাহ সৃষ্ট অপর আরেকটি জাতি, যারা পৃথিবীতে মানব আগমনের পূর্ব থেকেই ছিল এবং এখনো তাদের অস্তিত্ব রয়েছে। সাধারণত মানুষের চোখে তারা দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। কিন্তু, জ্বীনরা মানুষদেরকে দেখতে পায়। তাদের মধ্যেও মুসলিম এবং কাফির ভেদ রয়েছে। কুরআনে এসেছে,

“আমাদের মাঝে আছে মুসলমান এবং আছে কঠর আত্মার কাফির।[৯]

ইসলামী বিশ্বাস অনুসারে, মুহাম্মদ জ্বীন ও মানব উভয়জাতির নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। সুলায়মান আঃ এর সেনাদলে জ্বীনদের অংশগ্রহণ ছিল বলে কুরআনে উল্লেখ আছে। আরো বলা হয় "ইবলিশ" তথা শয়তান প্রকৃতপক্ষে জ্বীন জাতির একজন ছিল।

কুরআন অনুযায়ী জ্বীন

কুরআনে জ্বীন সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সূরাহতে অনেক আয়াত রয়েছে। যেমনঃ

- "যখন আমি একদল জ্বীনকে আপনার (অর্থাৎ মুহাম্মাদ এর) প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা কোরআন পাঠ শুনছিল। তারা যখন কোরআন পাঠের জায়গায় উপস্থিত হল, তখন পরস্পর বলল, চুপ থাক। অতঃপর যখন পাঠ সমাপ্ত হল, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে (জ্বীন সম্প্রদায়) সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল।” (সূরা আল-আহক্কাফ, ২৯)
- "হে জ্বীন ও মানব সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে নবীগণ আগমন করেনি? যাঁরা তোমাদেরকে আমার বিধানাবলী বর্ণনা করতেন এবং তোমাদেরকে আজকের এ দিনের সাক্ষাতের ভীতি প্রদর্শন করতেন? তারা বলবে, আমরা আমাদের গোনাহ স্বীকার করে নিলাম। পার্থিব জীবন তাদেরকে

প্রতারিত করেছে। তারা নিজেদের বিরুদ্ধে স্বীকার করে নিয়েছে যে, তারা কাফের ছিল।” (সূরা আল-আনআ’ম, ১৩০)

- “আমি জ্বীন ও মানুষকে কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি” (সূরা আয্-যারিয়াত, ৫৬)
- ”হে জ্বীন ও মানবকূল, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম কর। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না।” (সূরা আর-রহমান, ৩৩)
- ”বলুনঃ আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জ্বীনদের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছেঃ আমরা বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি।” (সূরা জ্বীন, ১)
- "আর এই যে মানুষের মধ্যের কিছু লোক জ্বীন জাতির কিছু লোকের আশ্রয় নিত, ফলে ওরা তাদের পাপাচার বাড়িয়ে দিত।” (সূরা জ্বীন, ৬)

হাশরের ময়দান যেমন হবে

হাশর আরবি শব্দ। হাশর অর্থ একত্র হওয়া, জড়ো হওয়া ইত্যাদি। তবে হাশরের দিনের বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন- ইয়াউমুল হিসাব বা হিসাবের দিবস, ইয়াউমুল জাযা বা প্রতিদান দিবস, ইয়াওমুল মিয়াদ বা প্রতিশ্রুত দিবস, ইয়াওমুল জামেই বা একত্র হওয়ার দিবস, ইয়াওমুল মাহশার বা সমাবেশ দিবস ইত্যাদি।

যে মাঠে সমাবেশ ঘটবে, তাকে বলা হয় ময়দানে মাহশার বা সমাবেশের স্থল। পরকালে বিচারের জন্য কবর থেকে উত্থিত হয়ে সব প্রাণী এ মাঠে দণ্ডায়মান থাকবে।

পৃথিবীই হবে হাশরের মাঠ। হাদিসের ভাষ্য মতে, পৃথিবীর উপরিভাগে একটি চাদর রয়েছে, একে পার্শ্ব ধরে টান দেওয়া হবে। ফলে গাছপালা, পাহাড়-পর্বত সাগরে পতিত হবে। অতঃপর সমতল হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা কোরআনে ইরশাদ করেন, ‘আর

আমি জমিনের উপরিভাগকে (বিচার দিবসে) উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত করে দেব।' (সুরা : কাহাফ, আয়াত : ৮)

হাশরের ময়দানের অবস্থা

হাশরের ময়দানের বর্ণনা দিতে গিয়ে মহানবী (সা.) বলেন, 'কেয়ামতের দিন মানবজাতিকে লাল-শ্বেত মিশ্রিত এমন এক সমতল ভূমিতে একত্র করা হবে, যেন তা পরিচ্ছন্ন আটার রুটির মতো। ওই জমিনে কারো (বাড়িঘরের বা অন্য কিছুর) চিহ্ন থাকবে না।' (বুখারি ও মুসলিম)

হাশরের ময়দানের ভূমি সম্পর্কে কোরআনে এসেছে, '(বিচার দিবসে) আল্লাহ জমিনকে এমন সমতল মসৃণ ধূসর ময়দানে পরিণত করবেন যে, তুমি তাতে কোনো বক্রতা ও উচ্চতা দেখতে পাবে না।' (সুরা তাহা, আয়াত : ১০৬-১০৭)

কেয়ামতের দিনটি প্রচণ্ড উত্তপ্ত থাকবে। মহানবী (সা.) বলেন, 'বিচার দিবসে সূর্যকে মানুষের কাছে আনা হবে, তা হবে তাদের থেকে এক ফরসাখ (তিন মাইল) দূরে। ব্যক্তির আমল অনুযায়ী ঘামের মধ্যে অবস্থান করবে। কারো ঘাম হবে টাখনু সমান, কারো হাঁটু সমান, কারো কোমর সমান, কারো মুখ সমান (মিশকাত, পৃষ্ঠা ৪৮৩)

হাশরের ময়দানে সুপারিশ

হাশরের ময়দানে একটু সুপারিশের জন্য সবাই একে অন্যের কাছে ঘুরবে। হাদিস শরিফে এসেছে, 'হাশরের ময়দানে মানুষ হজরত আদম (আ.)-এর কাছে গিয়ে বলবে, আপনার সন্তানদের জন্য সুপারিশ করুন, তিনি তখন বলবেন, আমি এর যোগ্য নই, তোমরা ইবরাহিম (আ.)-এর কাছে যাও, কারণ তিনি আল্লাহর বন্ধু। অতঃপর মানুষ ইবরাহিম (আ.)-এর কাছে আসবে। তিনি তখন বলবেন, আমি এর যোগ্য নই, বরং তোমরা মুসা (আ.)-এর কাছে যাও। কারণ তিনি কালিমাতুল্লাহ তথা আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছেন। অতঃপর তারা মুসা (আ.)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন, আমি এর যোগ্য নই, বরং তোমরা ঈসা (আ.)-এর কাছে যাও। কারণ তিনি রুহুল্লাহ। অতঃপর মানুষ তাঁর কাছে আসবে। তিনি তখন বলবেন, আমি এর যোগ্য নই, বরং তোমরা

মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে যাও। অতঃপর মানুষ তার কাছে আসবে, তিনি তখন বলবেন, হ্যাঁ, আমি এর যোগ্য, আমি সুপারিশ করব। ' (কুরতুবি, ১০ম খণ্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা)

কেয়ামতের দিন মহানবী (সা.) হবেন আদমসন্তানের নেতা। মহানবী (সা.) বলেন, 'বিচার দিবসে আমি হব আদমসন্তানের নেতা। এ জন্য আমার কোনো গর্ব নেই, আমার হাতে থাকবে প্রশংসার পতাকা, এ জন্য আমি গর্বিত নই। আদম (আ.)সহ সব নবী আমার পতাকার নিচে থাকবেন। ' (কুরতুবি, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৭)

জান্নাত

ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী স্বর্গ যার শাব্দিক অর্থ হলো বাগান বা উদ্যান

জান্নাত (আরবি: جنّة *জান্নাহ্*; বহুবচন: জান্নাত তুর্কি: *Cennet*), শাব্দিক. "স্বর্গ বা বাগান", সৎকর্মশীলদের চূড়ান্ত আবাসস্থল[১][২]) হলো পার্থিব জীবনে যে সকল মুসলিম আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলবে এবং পরকালীন হিসাবে যার পাপের চেয়ে পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে তাদের জন্য আল্লাহ সে সকল আবাসস্থল প্রস্তুত রেখেছেন।[৩] 'জান্নাত' একটি আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ বাগান, উদ্যান, আবৃ্ত স্থান। ফার্সি ভাষায় একে বলা হয় বেহেশত। বাংলায় একে বলা হয় স্বর্গ। ইসলামি পরিভাষায়, আখিরাতে ঈমানদার ও নেককার বান্দাদের জন্য যে চির-শান্তির আবাস্থল তৈরি করে রাখা হয়েছে, তাকে জান্নাত বলা হয়। আল কুরআনে আটটি জান্নাতের নাম পাওয় যায়।

শব্দ ব্যবহার

কিছু মুসলিম আলেম মূল ইসলামী আরবী শব্দ "জান্নাত" (جنّة)-এর ব্যবহারকে অধিক উৎসাহিত করে থাকেন, যুক্তি হিসেবে তারা বলেন, জান্নাত শব্দটি কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই শব্দটি বলার সময় প্রতি হরফে দশ নেকি করে ৩ হরফে মোট ৩০ নেকি সাওয়াব পাওয়া যাবে, যা বেহেশত বা অন্যান্য অ-কুরআনীয় প্রতিশব্দ উচ্চারণে

পাওয়া যাবে না। কুরআনীয় শব্দ বলায় প্রতি হরফে দশ নেকির ক্ষেত্রে তারা ইসলামী নবী মুহাম্মদের উক্ত হাদীসটি পেশ করেন,

রাসূল (সা.) বলেছেন,

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

'আল্লাহ তাআলার কিতাবের একটি হরফ যে ব্যক্তি পাঠ করবে তার জন্য এর সওয়াব আছে। আর সওয়াব হয় তার দশ গুণ হিসেবে। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ, বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।'

—*[সুনানে তিরমিযি, হাদিস: ২৯১০]*

জান্নাতের স্বরূপ

জান্নাত হলো চির-শান্তির স্থান। সেখানে সবকিছুই সুন্দর ও আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা সু-সজ্জিত। জান্নাতের ঘর-বাড়ি, আসন, আসবাবপত্র সবকিছু স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মুক্তি, দ্বারা নির্মিত। জান্নাতে থাকবে রেশমের গালিচা, দুধ ও মধুর নহর। মিষ্টিপানির স্রোতধারা। বস্তুত আনন্দ উপভোগের সব-রকম জিনিসই জান্নাতে বিদ্যমান থাকবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

"সেখানে (জান্নাত) তোমাদের মন যা চাইবে তা-ই তোমাদের জন্য রয়েছে আর তোমরা যা দাবি করবে তাও তোমাদের দেওয়া হবে।" (সুরা হামিম আসসাজদা:৩১)

জান্নাতের বিবরণ দিয়ে মহানবি হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন-

" আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

'আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমন সব বস্তু তৈরি করে রেখেছি, যা কোনো (মানুষের) চোখ কোনোদিন দেখেনি, কোনো (মানুষের) কান কোনোদিন শোনেনি, আর মানুষের অন্তরও যা কোনো দিন কল্পনা করতে পারে নি।' (মিশকাহ্)

কুরআনে বর্ণিত জান্নাতসমূহের নাম

জান্নাত মোট আটটি। এগুলো হলো- কুরআনে বর্ণিত জান্নাতের নাম/ স্তর সমূহ :

1. জান্নাতুল ফিরদাউস – জান্নাতের সর্বোচ্চ বাগান।[8] (আল-কাহফ,[১৮:১০৭] আল-মু'মিনূন[২৩:১১])
2. দারুল মাকাম – বাড়ি (ফাতির[৩৫:৩৫])
3. দারুল কারার – আখেরাতের আলয়(আল-আনকাবূত)[২৯:৬৪])
4. দারুস সালাম – শান্তির নীড় (ইউনুস,[১০:২৫] আল আনআম[৬:১২৭]
5. জান্নাতুল মাওয়া – বসবাসের জান্নাত (আন-নাজম[৫৩:১৫])
6. দারুন নাঈম – নেয়ামত পূর্ণ কানন/বাগান (সূরা আল-মায়িদাহ [৫:৬৫] ইউনুস,,[১০:০৯] আল-হাজ্জ[২২:৫৯]
7. দারুল খুলদ – চিরস্থায়ী বাগান (আল-ফুরকান[২৫:১৫])
8. জান্নাতুল আদন – অনন্ত সুখের বাগান (আত-তাওবাহ্:[৯:৭২]আর-রাদ[১৩:২৩]

- এ আটটি জান্নাতের মধ্যে জান্নাতুল ফিরদৌস হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا ". فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نُبَشِّرُ النَّاسَ. قَالَ " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ". قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ " وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ".

আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিতঃ:

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যে ঈমান আনল, সালাত আদায় করল ও রমযানের সিয়াম পালন করল সে

আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করুক কিংবা স্বীয় জন্মভূমিতে বসে থাকুক, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া আল্লাহ্‌র দায়িত্ব হয়ে যায়। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি লোকদের এ সুসংবাদ পৌঁছে দিব না? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা জান্নাতে একশ'টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দু'টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের মত। তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে চাইলে ফেরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হলো সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। আমার মনে হয়, রসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এও বলেছেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান। আর সেখান থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। মুহাম্মদ ইব্‌নু ফুলাইহ্‌ (রহঃ) তাঁর পিতার সূত্রে (নিঃসন্দেহে) বলেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান।

— সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৭৯০ হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

জান্নাতের দরজাসমূহ

হাদিস অনুসারে জান্নাতের মোট আটটি দরজা রয়েছে।

- **বাবুস সালাহ**:-জান্নাতের ঐ দরজা দিয়ে শুধুমাত্র সালাত কায়েমকারী বা নামাজী ব্যক্তিগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে।
- **বাবুল জিহাদ**:-জান্নাতের ঐ দরজা দিয়ে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রাস্তায় জিহাদ করবে বা মুজাহিদগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে।
- **বাবুস সাদাকাহ**:-জান্নাতের ঐ দরজা দিয়ে শুধুমাত্র ইসলামের বিধি-বিধান অনুযায়ী সাদাকাহ করবে বা ইসলামিক প্রকৃত দানবীর ব্যক্তিগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে।
- **বাবুর রাইয়ান**:- জান্নাতের ঐ দরজা দিয়ে শুধুমাত্র রোজাদার ব্যক্তিরাই প্রবেশ করবে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)--
- **বাবুল হজ**:-জান্নাতের ঐ দরজা দিয়ে শুধুমাত্র হাজীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে।

- **বাবুল কাদিমিনুল গায়িধ:-**
- **বাবুল ইমান:**-জান্নাতের ঐ দরজা দিয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উপর বিশ্বাস স্থাপন, নবী-পয়গম্বরদের উপর বিশ্বাস স্থাপন, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিশ্বজাহান ও সমগ্র মাখলুকাতের মালিক হিসেবে বিশ্বাস স্থাপন করা বা শুধুমাত্র প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তিগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে।
- **বাবুজ জিকর:**-জান্নাতের ঐ দরজা দিয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উপর জিকির-আযকার, ইস্তিগফার পাঠকারী বা শুধুমাত্র প্রকৃত জিকিরকারীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

জান্নাতের বর্ণনা

জান্নাতের প্রশস্ততা

জান্নাতের প্রশস্ততা সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে ও সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি হচ্ছে আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য তৈরী করা হয়েছে।

— *সূরা আল ইমরান:১৩৩*

জান্নাত দেখার পরই সঠিকভাবে বোঝা যাবে যে জান্নাত কত বিশাল এবং তার নিয়ামত কত অসংখ্য। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

তুমি যখন দেখবে তখন দেখতে পাবে ভোগ বিলাসের নানান সামগ্রী আর এক বিশাল রাজ্য।

— *সূরাহ আদ্-দাহ্‌রঃ ২০*

জান্নাতে শত স্তর আছে আর প্রত্যেক স্তরের মাঝে এত দূরত্ব আছে যতটা দূরত্ব আছে আকাশ ও মাটির মাঝে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন',

জান্নাতে শত স্তর আছে। প্রত্যেক স্তরের মাঝে দূরত্ব হলো আকাশ ও মাটির দূরত্বের সমান। আর ফেরদাউস তার মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে আছে। আর সেখান থেকেই জান্নাতের চারটি ঝর্ণা প্রবহমান। এর উপরে রয়েছে আরশ। তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট জান্নাতের জন্য দু'আ করলে জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্য দু'আ করবে।

— *তিরমিজী- কিতাবুল জান্নাহ*

জান্নাতে একটি বৃক্ষের ছায়া এত লম্বা হবে যে কোন অশ্বারোহী ঐ ছায়ায় শত বছর পর্যন্ত চলতে পারবে। রাসূলুল্লাহ (সা) ,বলেন,

জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে যার ছায়ায় কোন আরোহী শত বছর পর্যন্ত চলতে পারবে। আর তোমরা ইচ্ছা করলে তিলাওয়াত করতে পার এবং দীর্ঘ ছায়া। আর জান্নাতে তোমাদের কারও একটি ধনুকের পরিমাণ জায়গাও ঐ জায়গা অপেক্ষা উত্তম যেখানে সূর্য উদিত হয় আর সূর্য অস্তমিত হয় (অর্থাৎ পৃথিবীর চেয়ে)।

— *সহীহ বুখারী, হাদীস সংখ্যা – ৩২৫২, ৩২৫৩*

সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারীকে এ দুনিয়ার চেয়ে দশগুণ বড় জান্নাত দান করা হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

জাহান্নামে থেকে সবশেষে বের হয়ে আসা ব্যক্তিকে আমি চিনি। সে হামাগুড়ি দিয়ে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। তাকে বলা হবে, "যাও জান্নাতে প্রবেশ কর"। নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সে গিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সে দেখবে, লোকেরা স্ব স্ব স্থান অধিকার করে আছে। অতঃপর মহান আল্লাহ তাকে বলবেন, "আচ্ছা সে যুগের (জাহান্নামের শাস্তি) কথা তোমার স্মরণ আছে কি?" সে বলবে, "হ্যাঁ, মনে আছে"। তাকে বলা হবে, "তুমি কি পরিমাণ জায়গা চাও তা ইচ্ছা কর"। সে ইচ্ছা করবে। তখন তাকে বলা হবে, "তুমি যে পরিমাণ ইচ্ছা করেছো তা এবং দুনিয়ার দশগুণ জায়গা তোমাকে দেয়া হলো"। একথা শুনে সে বলবে, "আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন? অথচ আপনি হলেন সর্ব শক্তিমান"।

— *সহিহ মুসলিম*

বর্ণনাকারী ইবনে মাসুদ (রা.) বলেন,

"এ সময় আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমনভাবে হাসতে দেখেছি যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছে'।

— সহীহ মুসলিম - কিতাবুল ঈমান

জান্নাতে সর্বশেষ ব্যক্তি প্রবেশ করার পরও অনেক জায়গা বাকী থাকবে যা পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা নতুন জীব সৃষ্টি করবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

জান্নাতে যতটুকু স্থান আল্লাহ্ চাইবেন ততটুকু স্থান খালি থেকে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী অন্য এক জীব সৃষ্টি করবেন'।

— সহীহ মুসলিম - কিতাবুল জান্নাহ

জান্নাতের অট্টালিকাসমূহ

কুরআন এ আল্লাহ্ তায়ালা বলেন',

"মুমিন পুরুষ আর মুমিন নারীর জন্য আল্লাহ্ অঙ্গীকার করেছেন জান্নাতের যার নিম্নদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তাতে তারা চিরদিন থাকবে, আর জান্নাতে চিরস্থায়ী উত্তম বাসগৃহের; আর সবচেয়ে বড় (যা তারা লাভ করবে তা) হল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। এটাই হল বিরাট সাফল্য।"

— সূরাহ আত্-তাওবাহ ৭২

জান্নাতের অট্টালিকাসমূহ সোনা-রূপার ইট দিয়ে নির্মিত হবে। হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে, আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি জিজ্ঞেস করলাম, "হে রাসূলুল্লাহ (সা)! সৃষ্টিকে কী দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে?" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "পানি দিয়ে"। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "জান্নাত কী দিয়ে নির্মিত?" তিনি বললেন,

"একটি ইট রৌপ্যের এবং আরেকটি ইট স্বর্ণের। তার গাঁথুনি হল সুগন্ধিযুক্ত মেশক আম্বর। তার কংকর মোতি ও ইয়াকুতের। তার মাটি জাফরানের। যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে সে জীবন উপভোগ করবে, তার কোন কষ্ট হবে না। চিরকাল জীবিত

থাকবে, মৃত্যু হবে না। জান্নাতীদের কাপড় কখনো পুরানো হবে না। আর তাদের যৌবন কখনো বিনষ্ট হবে না"।

— *তিরমিজী- কিতাবুল জান্নাহ*

জান্নাতের কোন কোন অট্টালিকায় স্বর্ণের বাগান থাকবে। আবার কোন কোনটিতে রূপার বাগান থাকবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

দুইটি জান্নাত এমন রয়েছে যে, এর যাবতীয় পাত্রসমূহ ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সবই রৌপ্য নির্মিত। আবার দুইটি জান্নাত এমন আছে যে এর সমস্ত আসবাবপত্র এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সবই স্বর্ণ নির্মিত। জান্নাতে আদনের অধিবাসীদের মধ্যে এবং তাদের প্রতিপালককে দর্শনের মধ্যে কেবল তাঁর বড়ত্ব ও মহানত্বের চাদরখানা ব্যতীত আর কোন আড়াল থাকবে না'।

— *সহীহ মুসলিম - কিতাবুল ঈমান*

জান্নাতের অট্টালিকাসমূহে সাদা মোতির নির্মিত বড় বড় সুন্দর গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে। আনাস বিন মালেক (রা) থেকে মিরাজের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

অতঃপর আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হল, যাতে সাদা মোতির নির্মিত গম্বুজ আছে। আর তার মাটি হল মেশক আম্বরের'।

— *সহীহ মুসলিম - কিতাবুল ঈমান*

জান্নাতের তাঁবুসমূহ

জান্নাতীদের প্রত্যেকের অট্টালিকায় তাঁবু থাকবে যেখানে হুরেরা অবস্থান করবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

তাঁবুতে সুরক্ষিত থাকবে সুলোচনা সুন্দরীরা।

— *আর রাহমান - ৭২*

জান্নাতের তাঁবু ষাট মাইল প্রশস্ত হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ,

জান্নাতের মধ্যে ফাঁপা মোতির একটি তাঁবু থাকবে। এর প্রশস্ততা হবে ষাট মাইল। এর প্রতি কোণে থাকবে হুর-বালা। এদের এক কোণের জন অপর কোণের জনকে দেখতে পাবে না। ঈমানদার লোকেরা তাদের কাছে যাবে। এতে থাকবে দু'টি বাগান, যার সকল পাত্র এবং ভেতরের সকল বস্তু হবে রূপার তৈরি।

— সহীহ বুখারী, হাদিস সংখ্যা- ৪৮৭৯

জান্নাতের বৃক্ষসমূহ

জান্নাতের বৃক্ষসমূহ কাঁটা বিহীন হবে ও তাদের ছায়া অনেক লম্বা হবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

আর ডানদিকের দল, কত ভাগ্যবান ডানদিকের দল! তারা থাকবে কাঁটা বিহীন বরই গাছগুলোর মাঝে। কলা গাছের মাঝে যাতে আছে থরে থরে সাজানো কলা, বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছায়া, অবিরাম প্রবাহমান পানির ধারে, আর পর্যাপ্ত ফলমূল পরিবেষ্টিত হয়ে।

— সূরা ওয়াক্বি'আহঃ ২৭-৩২

জান্নাতের বৃক্ষসমূহ সর্বদা শস্য-শ্যামল থাকবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

ঘন সবুজ এ বাগান দু'টি।

— সূরা আর রহমান ৬৪

জান্নাতের বৃক্ষসমূহের শাখাগুলো লম্বা ও ঘন হবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

দুটোই শাখা পল্লবে ভরপুর।

— সূরা আর রহমান ৪৮

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

জান্নাতের প্রতিটি বৃক্ষের মূল হবে স্বর্ণের'। (তিরমিজী- কিতাবুল জান্নাত)

জান্নাতের ফলসমূহসম্পাদনা

কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

তাতে আছে ফলমূল, আর খেজুর আর ডালিম।

— *সূরা আর-রহমান - ৬৮*

জান্নাতের প্রত্যেক জান্নাতীর পছন্দমত সর্ব প্রকার ফলমূল মজুদ থাকবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

মুত্তাকীরা থাকবে ছায়া আর ঝর্ণাধারার মাঝে, আর তাদের জন্য থাকবে ফলমূল-যেটি তাদের মন চাইবে। (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা তৃপ্তির সাথে খাও আর পান কর, তোমরা যে কাজ করেছিলে তার পুরস্কারস্বরূপ। সৎকর্মশীলদের আমি এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি।

— *সূরাহ আল-মুরসালাতঃ ৪১-৪৪*

জান্নাতের ফল সর্বদা জান্নাতীদের নাগালের মধ্যে থাকবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

জান্নাতের বৃক্ষরাজির ছায়া তাদের উপর থাকবে, আর ফলের গুচ্ছ একেবারে তাদের নাগালের মধ্যে রাখা হবে।

— *আদ-দাহর ১৪*

জান্নাতের ফলের ছড়া অনেক বড় হবে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সূর্য গ্রহণের সলাত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, "হে রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আমরা আপনাকে দেখলাম, আপনি এ স্থানে দাঁড়িয়ে কোন কিছু হাত বাড়িয়ে নিতে যাচ্ছেন। আবার একটু পরে দেখলাম হাত ফিরিয়ে নিলেন"। রাসূলুল্লাহ্ (স) বললেন,

আমি জান্নাত দেখতে পেলাম। অতএব জান্নাতে থেকে ফলের একটা ছড়া নিতে যাচ্ছিলাম। যদি তা নিয়ে নিতাম তবে তোমরা তা পৃথিবী কায়েম থাকা পর্যন্ত খেতে পারতে"।— *সহীহ মুসলিম*

জান্নাতের নদীসমূহ

জান্নাতের নদীসমূহের পানির রং ও স্বাদ সর্বদা একই রকমের থাকবে। কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

মুত্তাকিদের যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার উপমা হলো তাতে আছে নির্মল পানির ঝর্ণা, আর আছে দুধের নদী যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু মদের নদী আর পরিশোধিত মধুর নদী।

— সূরাহ মুহাম্মদঃ ১৫

আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

"সাইহান, জাইহান, ফোরাত ও নীল জান্নাতের নদী"।— *সহীহ মুসলিম- কিতাবুল জান্নাত*

হাকীম বিন মোয়াবিয়া তার পিতা থেকে তিনি নবী (স) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

জান্নাতে পানির সাগর, মধুর সাগর, দুধের সাগর ও শরাবের সাগর রয়েছে। এগুলো থেকে পরে আরো নহরের শাখা-প্রশাখা বের হবে।— *তিরমিজী*

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

আল্লাহ্ স্বীয় দয়ায় যাকে খুশি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। (অতঃপর দীর্ঘদিন পর বলবেন) দেখ যে ব্যক্তির অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের কর। তখন তারা এমন অবস্থায় বের হবে যে তাদের শরীর কয়লার ন্যায় জ্বলে গেছে। তখন তাদেরকে হায়াত বা হায়া নামক নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। তখন তারা এমনভাবে সজীব হয়ে উঠবে, যেমন বন্যার আবর্জনার মাঝে চারাগাছ সজীব হয়ে উঠে। তোমরা কি কখনো দেখনি যে কেমন হলুদ রং বিশিষ্ট হয়ে ওঠে"।— *সহীহ মুসলিম- কিতাবুল ঈমান*

কাওছার নদীসম্পাদনা

আনাস ইবনুল মালিক (রা) সূত্রে নবী (স) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন,

আমি জান্নাতে ভ্রমণ করছিলাম, এমন সময় এক নহরের কাছে এলে দেখি যে তার দু'ধারে ফাঁপা মুক্তার গম্বুজ রয়েছে। আমি বললাম, "হে জিব্‌রীল! এটা কী?" তিনি বললেন, "এটা ঐ কাউসার যা আপনার প্রতিপালক আপনাকে দান করেছেন"। তার ঘ্রাণে অথবা মাটিতে ছিল উত্তম মানের মিশ্‌ক এর সুগন্ধি।

— *সহীহ বুখারী, হাদীস সংখ্যা-৬৫৮১*

আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

কাওছার জান্নাতের একটি নদী। যার উভয় তীর স্বর্ণ নির্মিত। তার পানি ইয়াকুত ও মোতির উপর প্রবহমান। তার মাটি মেশকের চেয়েও বেশি সুগন্ধময়। তার পানি মধুর চেয়ে অধিক মিষ্টি এবং বরফের চেয়ে অধিক সাদা।

— *তিরমিজী*

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কাওছার কি? তিনি বললেন,

এটি একটি নদী, যা আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে জান্নাতে দান করবেন। তা দুধ অপেক্ষা সাদা এবং মধু থেকেও সুমিষ্ট। এর মাঝে রয়েছে বহু পাখি। এগুলোর গর্দান হবে উটের গর্দানের মত।

— *তিরমিজী*

উমর রা বললেন, "এগুলো তো খুব মোটা-তাজা হবে"। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

এগুলোর আহারকারী আরো সুখী হবে।

— *তিরমিজী- কিতাবুল জান্নাহ*

জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ

কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

তাদের সামনে ঘুরে ঘুরে রুপার পাত্র পরিবেশন করা হবে আর সাদা পাথরের পানপাত্র। সেই সাদা পাথরও হবে রুপার তৈরি। তারা এগুলোকে যথাযথ পরিমাণে ভর্তি করবে। তাদেরকে পান করানোর জন্য এমন পাত্র পরিবেশন করা হবে যাতে আদার মিশ্রণ থাকবে। সেখানে আছে একটা ঝর্ণা, যার নাম সালসাবীল।

— সূরা আদ্-দাহ্‌রঃ ১৫-১৮

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

(অপরদিকে) নেক্‌কার লোকেরা এমন পানপাত্র থেকে পান করবে যাতে কর্পূরের সংমিশ্রণ থাকবে। আল্লাহ্‌র বান্দারা একটি ঝর্ণা থেকে পান করবে। তারা এই ঝর্ণাকে (তাদের) ইচ্ছেমত প্রবাহিত করবে।

— সূরাহ আদ্-দাহ্‌রঃ ৫-৬

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেন,

পুণ্যবান লোকেরা থাকবে অফুরন্ত নিয়ামতের মাঝে। উচ্চ আসনে বসে তারা (চারদিকের সবকিছু) দেখতে থাকবে। তুমি তাদের মুখে আরাম আয়েশের উজ্জ্বলতা দেখতে পাবে। তাদেরকে পান করানো হবে সীল-আঁটা উৎকৃষ্ট পানীয়। তার সীল হবে মিশ্‌কের, প্রতিযোগীরা এ বিষয়েই প্রতিযোগিতা করুক। তাতে মেশানো থাকবে 'তাসনীম, ওটা একটা ঝর্ণা, যা থেকে (আল্লাহ্‌র) নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করবে।

— সূরাহ আল-মুতাফ্‌ফিফীনঃ ২২-২৮

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

তাদের জন্য আছে নির্ধারিত রিয্‌ক- ফলমূল; আরা তারা হবে সম্মানিত। (তারা থাকবে) নি'য়ামাতের ভরা জান্নাতে উচ্চাসনে মুখোমুখী হয়ে তাদের কাছে চক্রাকারে পরিবেশন করা হবে স্বচ্ছ প্রবাহিত ঝর্ণার সুরাপূর্ণ পাত্র। নির্মল পানীয়, পানকারীদের জন্য সুপেয়, সুস্বাদু। নেই তাতে দেহের জন্য ক্ষতিকর কোন কিছু, আরা তারা তাতে মাতালও হবে না।

— সূরাহ আস্-সা-ফ্ফাতঃ ৪১-৪৭

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

দুটো বাগানেই আছে অবিরাম ও প্রচুর পরিমাণে উৎক্ষিপ্তমান দুটো ঝর্ণাধারা। অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'মাতকে অস্বীকার করবে?

— সূরাহ আর্-রহমানঃ ৬৬-৬৭

এছাড়া জান্নাতের ঝর্ণা সম্পর্কে কুরআন এ বর্ণিত হয়েছে যে,

সেখানে থাকবে প্রবাহমান ঝর্ণা।

*— সূরা আল-গাশিয়াহঃ **১২***

মহান আল্লাহ্ বলেন,

নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে, বাগান আর ঝর্ণার মাঝে।

— সূরা আদ্-দুখানঃ ৫১-৫২

মহান আল্লাহ্ বলেন,

মুত্তাকীরা থাকবে ছায়া আর ঝর্ণাধারার মাঝে, আর তাদের জন্য থাকবে ফলমূল-যেটি তাদের মন চাইবে।

— সূরা আল-মুরসালাতঃ ৪১-৪২

জান্নাতিদের গুণাবলী

- **জান্নাতিরা ষাট হাত লম্বা হবে**

আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

জান্নাতে প্রবেশকারী প্রত্যেক ব্যক্তি আদম আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালামের ন্যায় ষাট হাত লম্বা হবে। (প্রথমে মানুষ ষাট হাত ছিল) পরবর্তীতে তারা খাট হতে লাগল, শেষে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

— *সহীহ মুসলিম*

- **জান্নাতিদের চেহারা ও বয়স**

মোয়াজ বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী (সা) বলেছেন,

জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশের সময় তাদের চেহারায় কোন দাড়ি-গোঁফ থাকবে না। চক্ষুদ্বয় লাজুক হবে। বয়স হবে ত্রিশ থেকে তেত্রিশ এর মাঝামাঝি।

— *তিরমিজী*

- **জান্নাতিদের খাবার হজম প্রক্রিয়া**

জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

জান্নাতিরা পানাহার করবে কিন্তু থুথু ফেলবে না এবং পায়খানা-প্রস্রাবও করবে না। নাকে পানি আসবেনা"। সাহাবাগণ আরয করলেন, "তাহলে তাদের খাবার কোথায় যাবে?" তিনি উত্তরে বললেন, "ঢেকুর ও ঘামের মাধ্যমে তা হজম হবে। জান্নাতীরা এমনভাবে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও তাসবীহ্ পাঠ করবে যেমন তারা শ্বাস গ্রহণ করে"।

— *সহীহ মুসলিম*

জান্নাতীদের জন্য আল্লাহ্‌র নিয়ামত

- **জান্নাতীদের প্রথম খাবার ও পানীয়**

গোলাম সওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) নিকট দাঁড়িয়ে ছিলাম। ইতোমধ্যে ইহুদীদের পাদ্রীদের মধ্য থেকে একজন পাদ্রী আসল এবং জিজ্ঞেস করল, "যে দিন আকাশ ও পৃথিবীর প্রথম পরিবর্তন করা হবে তখন মানুষ কোথায় থাকবে?" রাসূলুল্লাহ্ (সা), "পুলসেরাতের নিকটবর্তী এক অন্ধকার স্থানে"। অতঃপর ইহুদী পাদ্রী জিজ্ঞেস করল, "সর্ব প্রথম কে পুলসিরাত পার হবে?" তিনি বললেন,

"গরীব মুহাজিরগণ (মক্কা থেকে মদীনার হিযরতকারী)"। ঐ ইহুদী পাদ্রী আবার জিজ্ঞেস করল, "জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর সর্ব প্রথম তাদেরকে কী খাবার পরিবেশন করা হবে?" রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু (সা) বললেন, "মাছের কলিজা"। ইহুদী জিজ্ঞেস করল, "এর পর কী পরিবেশন করা হবে?" রাসূলুল্লাহ সল্লল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "এরপর জান্নাতীদের জন্য জান্নাতে পালিত গরুর গোশত পরিবেশন করা হবে"। এরপর ইহুদী জিজ্ঞেস করল, "খাওয়ার পর পানীয় কী কী পরিবেশন করা হবে?" রাসূলুল্লাহ সল্লল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "'সালসাবিল' নামক ঝর্ণার পানি"। ইহুদী পাদ্রী বলল, "তুমি সত্য বলেছ..."। (সহীহ মুসলিম- কিতাবুল হায়েজ)

- **এ পৃথিবী হবে জান্নাতীদের রুটি**

আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ

কিয়ামতের দিন এ পৃথিবী একটি রুটির ন্যায় হবে। আল্লাহ্ স্বীয় হস্তে তা এমনভাবে উলট পালট করবেন যেমন তোমাদের কেউ সফররত অবস্থায় তার রুটিকে উলট পালট কর। আর ঐ রুটি দিয়ে জান্নাতীদেরকে মেহমানদারী করা হবে"।

— সহীহ মুসলিম

- **সকাল সন্ধ্যায় জান্নাতীদের খাবার পরিবেশন করা হবে**

কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

- এবং সকাল সন্ধ্যায় তাদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা থাকবে।

— সূরাহ মারইয়ামঃ ৬২

- জান্নাতে মদ্যপান করার পর কোন প্রকার মাতলামি ভাব দেখা দিবে না।

— সূরাহ আস্-সা-ফ্ফাতঃ ৪১-৪৭

- জান্নাতিদেরকে এমন মদ্যপান করানো হবে যার মধ্যে আদার স্বাদ থাকবে।

— সূরাহ আদ্-দাহ্রঃ ১৫-১৮

- জান্নাতিদের পানের জন্য সুস্বাদু পানি, সুমিষ্ট দুধ, সুস্বাদু শরাব, পরিষ্কার স্বচ্ছ মধুর নদীও জান্নাতে বিদ্যমান থাকবে।

— সূরাহ মুহাম্মদঃ ১৫

- জান্নাতিদের মেহমানদারির জন্য অন্যান্য ফল ব্যতীত খেজুর, আঙ্গুর, আনার, বরই, আনজীর ইত্যাদি ফলও থাকবে।

— সূরাহ আর-রহমানঃ ৬৮/সূরাহ আল-ওয়াক্বি'আহঃ ২৭-৩২

- জান্নাতীদের সেবায় 'শারাবান ত্বাহুরা' (পবিত্র পরিচ্ছন্ন পানীয়) পেশ করা হবে।

— সূরাহ আদ্-দাহ্রঃ ২১

- উটের গর্দানের মত পাখির গোশত জান্নাতীদের পরিবেশন করা হবে।

— তিরমিজী- কিতাবুল জান্নাহ

জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ব্যক্তি

- আবু বকর ও ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

আলী ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি একদা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। হঠাৎ করে আবু বকর ও ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও চলে আসলেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তারা উভয়ে বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুবরণকারী মুসলমানদের সর্দার হবে - তারা পূর্ববর্তী উম্মতের লোক হোক আর পরবর্তী উম্মতের। তবে নবী ও রাসূলগণ ব্যতীত। হে আলী! তুমি এ সংবাদ তাদেরকে দিও না"। (তিরমিজী- আবওয়াবুল মানাকেব)[৫]

- হাসান ও হুসাইন রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সল্লল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "হাসান ও হুসাইন রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জান্নাতী যুবকদের সর্দার হবে"। (তিরমিজী- আবওয়াবুল মানাকেব)[৬]

- আশারা মুবাশ্‌শারা

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশজনকে দুনিয়াতেই তাদের জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। তাদেরকে আশারা মুবাশ্‌শারা বলা হয়। আবদুর রহমান বিন আওফ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আবু বকর জান্নাতী, ওমর জান্নাতী, ওসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবাইর জান্নাতী, আবদুর রহমান আওফ জান্নাতী, সা'দ বিন আবূ ওক্কাস জান্নাতী, সাঈদ বিন যুবাইর জান্নাতী, আবু ওবাইদা ইবনুল জার রাহ জান্নাতী"। (তিরমিজী- আবওয়াবুল মানাকেব)[৭]

- খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদিজা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে জান্নাতে একটি ঘরের সুসংবাদ দিয়েছেন"। (সহীহ মুসলিম)[৮]

- উম্মে সুলাইম ও বেলাল রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জাবের বিন আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমাকে জান্নাত দেখানো হল, আমি আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর স্ত্রীকে (উম্মে সুলাইম) সেখানে দেখতে পেলাম। অতঃপর আমি সামনে অগ্রসর হয়ে কোন মানুষের চলার আওয়াজ পেলাম। হঠাৎ দেখলাম বেলাল রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে"। (সহীহ মুসলিম)[৯]

- তালহা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই জোড়া কাপড় পরিধান করে ছিলেন। তিনি একটি পাথরের উপর আরোহণ করতে ছিলেন কিন্তু তিনি তাতে চড়তে পারছিলেন না। তখন তিনি তালহা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে তাঁর নিচে বসালেন এবং তার ওপর

আরোহণ করে তিনি তাতে চড়লেন। যুবায়ের বলেন, এসময় আমি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেনঃ তালহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে"। (তিরমিজী- আবওয়াবুল মানাকেব)[১০]

- আবদুল্লাহ বিন সালাম রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সা'দ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোন জীবিত ব্যক্তির ব্যাপারে একথা বলতে শুনি নাই যে সে জান্নাতী, তবে শুধু আবদুল্লাহ বিন সালামকে একথা বলেছেন"। (সহীহ মুসলিম)[১১]

কুরআন

ইসলাম ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ

কুরআন মজিদ অথবা কুরআ-ন মাজী-দ বা কোরআন (আরবি: القرآن আল্-কুর্'আন্[টী১]) ইসলাম ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, যা আল্লাহর বাণী

।[১] এটিকে আরবি শাস্ত্রীয় সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট রচনা বলে মনে করা হয়।[২][৩][৪][৫] কুরআনকে প্রথমে অধ্যায়ে (আরবিতে সূরা) ভাগ করা হয় এবং অধ্যায়গুলো (সূরা) আয়াতে বিভক্ত করা হয়েছে।

এই কিতাব আল্লাহর ফেরেশতা জিবরাইল এর মাধ্যমে ইসলামিক নবি মুহাম্মাদ এর কাছে মৌখিকভাবে ভাষণ আকারে কুরআনের আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন,[৬][৭] দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে সম্পূর্ণ কুরআন অবতীর্ণ হয়। কুরআনের প্রথম আয়াত অবতীর্ণ হয় ৬০৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর যখন মুহাম্মাদের বয়স ৪০ বছর[৮] এবং অবতরণ শেষ হয় মুহাম্মাদের তিরোধানের বছর অর্থাৎ ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে।[১][৯][১০] মুসলমানরা বিশ্বাস করে থাকেন কুরআন হচ্ছে মুহাম্মদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অলৌকিক ঘটনা যা তার নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ[১১] এবং ঐশ্বরিক বার্তা প্রেরণের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায় যা আদম থেকে শুরু হয়ে মুহাম্মাদের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। তবে সুফিবাদের অনুসারীরা বিশ্বাস করে থাকেন মুহাম্মাদের সকল কর্মকান্ড উম্মতের কাছে বোধগম্য

করে তোলার জন্যই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়। কুরআনের আয়াতসমূহে কুরআন শব্দটি ৭০ বার এসেছে।[১২]

ইসলামি ইতিহাস অনুসারে দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে খণ্ড খণ্ড অংশে এটি ইসলামের নবি মুহাম্মাদের নিকট অবতীর্ণ হয়। ইসলামের অনুসারীরা কুরআনকে একটি পুর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বলে বিশ্বাস করে। কুরআনে সর্বমোট ১১৪টি সূরা আছে। আয়াত বা পঙ্ক্তি সংখ্যা ৬,২৩৬ টি; মতান্তরে ৬,৬৬৬ টি। এটি মূল আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়।[১৩][১৪][১৫][১৬] মুসলিম চিন্তাধারা অনুসারে কুরআন ধারাবাহিকভাবে অবতীর্ণ ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বশেষ এবং গ্রন্থ অবতরণের এই ধারা ইসলামের প্রথম বাণীবাহক আদম থেকে শুরু হয়। কুরআনে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যার সাথে বাইবেলসহ অন্যান্য ধর্মীয়গ্রন্থের বেশ মিল রয়েছে, অবশ্য অমিলও কম নয়। তবে কুরআনে কোনো ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা নেই। ইসলামি ভাষ্যমতে কুরআন অপরিবর্তনীয় এবং এ সম্পর্কে মুসলিমরা কুরআনের সূরা আল-হিজরের (১৫ নং সূরা), ৯ নং আয়াতের কথা উল্লেখ করে থাকে, এবং তা হল:

> “ আমি স্বয়ং এ উপদেশগ্রন্থ অবতরণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।[১৭] ”

ব্যুৎপত্তি ও অর্থ

কুরআনে কুর'আন শব্দটি কয়েকটি অর্থে প্রায় ৭০ বার এসেছে। আর, আরবি ব্যাকরণে "কুর'আন" শব্দটি একটি "মাসদার",যা ভাববাচক বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ৭৫:১৭,১৮ আয়াতে এটি,(قرأ) ক্বারা'আ ('পাঠ করা', 'আবৃত্তি করা' বা 'অনুসরণ করা') ক্রিয়ার ভাববাচক বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই ক্রিয়াপদটিকেই কুরআন নামের মূল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।[১৮] এই শব্দটির "মাসদার" (الوزن) হচ্ছে غفران তথা "গুফরান"। এর অর্থ হচ্ছে অতিরিক্ত ভাব, অধ্যবসায় বা কর্ম সম্পাদনার মধ্যে একাগ্রতা। উদাহরণস্বরুপ, (غفر) নামক ক্রিয়ার অর্থ হচ্ছে "ক্ষমা

করা"; কিন্তু এর আরেকটি মাসদার রয়েছে যার যা হলো (غفران), এই মাসদারটি মূল অর্থের সাথে একত্রিত করলে দাঁড়ায় ক্ষমা করার কর্মে বিশেষ একাগ্রতা বা অতি তৎপর বা অতিরিক্ত ভাব। সেদিক থেকে কুরআন অর্থ কেবল পাঠ করা বা আবৃত্তি করা নয় বরং একাগ্র ভঙ্গীতে পাঠ বা আবৃত্তি করা। কুরআনের মধ্যেও এই অর্থেই কুরআন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনের সূরা আল-কিয়ামাহের (৭৫ নং সূরা) ১৮ নং আয়াতে এই শব্দটি উল্লেখিত আছে:"অতঃপর, আমি যখন তা পাঠ করি (ক্বুরা'নাহু), তখন আপনি সেই পাঠের (কুরআ'নাহ্) অনুসরণ করুন।"[১৯]

কুরআনে যেখানেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেই এর যথার্থ বিশেষ্য বা বিশেষণ পাওয়া যায়। ক্বারা'আ ক্রিয়াপদ কুরআনে পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হয়েছে। ১৭:৯৩ আয়াতে এর অর্থ 'পাঠ করা'; কিন্তু এর বহুল প্রচলিত অর্থটি হল,'আবৃত্তি করা' (তিলাওয়াঃ),৭৫: ১৬,১৭। মুহাম্মদ এর আবৃত্তি সমন্ধেও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি তাঁর নিজের উপর অবতীর্ণ ওহী আবৃত্তি করেন (৭ঃ২০৪; ১৬ঃ৯৮; ১৭ঃ৪৫; ৮৪ঃ২১; ৮৭ঃ৬)। শব্দটি মুমিনদের আবৃত্তি সমন্ধেও ব্যবহৃত হয়েছে , তারা সালাতে ওহী আবৃত্তি করেন (৭৩ঃ২০)। এ থেকে বোঝা যায়, কুরআন শব্দের অর্থ হল 'আবৃত্তি করা' যা মুহাম্মদ আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত হয়ে আবৃত্তি করেছেন (৭৫ঃ১৮; ৮৬ঃ৬) এবং মানুষের সম্মুখেও আবৃত্তি করেছেন। যদিও কুরআন বলতে সাধারভাবে তাঁর উপর অবতীর্ণ ওহীর সমষ্টিকে বুঝায়। তবে শব্দটি (কুরআন) তাঁর উপর অবতীর্ণ পৃথক পৃথক ওহী (১০ঃ১৫; ১২ঃ৩; ৭২ঃ১; ২ঃ১৮৫) সমন্ধে বা খন্ডে খন্ডে অবতীর্ণ (১৭ঃ১০৬; ২০ঃ১; ৭৬ঃ২৩; ২৫ঃ৩২ ; ৫৯ঃ২১) আল্লাহর ওহী সমন্ধে বলা হয়েছে যা তিঁনি আল্লাহ কর্তৃক পেয়েছিলেন (২৭ঃ৬; ২৮ঃ৮৫)।

আল কিতাব (ধর্ম গ্রন্থ বা পুস্তক) শব্দটি আল-কুরআনের প্রতিশব্দ হিসাবে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল-কিতাব সমন্ধে বলা হয়েছে "ইহা এক কল্যানময়ী রাত্রিতে (৪৪ঃ২) অবতীর্ণ হইয়াছে" (৪০ঃ২; ৪৫ঃ২)। ১৫ঃ১ আয়াতে বলা হয়েছে, "এইগুলি আল-কুরআন এবং সুস্পষ্ট অর্থবোধক আল-কিতাবের অলৌকিক নিদর্শনসমূহ।" বিষয়বস্তু হিসেবে কুরআনকে প্রায়ই 'যি'কর' বলা হয়েছে। এখানে এর অর্থ উপদেশ, সাধারণ

বাণী (২১ঃ২৬,৪২; ৩৮ঃ৮৭)। যি'করকে 'অবতীর্ণ' (২১ঃ৫০; ৩৮ঃ৮) এবং 'মহান পবিত্র গ্রন্থ' (৪১ঃ৪১) বলা হয়েছে। আবার ৩৬ঃ ৬৯ আয়াতে কুরআন সমন্ধে বলা হয়েছে, " এ তো কেবল এক উপদেশ ও স্পষ্ট কুরআন মাত্র"। ২১ঃ৭ আয়াতে আহ্'লুল-কিতাবকে আহ্'লুয যি'কর বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আল-হি'কমাঃ শব্দটি উল্লেখ করা যেতে পারে। ২ঃ১২১,১৫১; ৩ঃ১৬৪; ৬২ঃ২ -এ আল-কিতাবের সাথে হি্'কমাঃ উল্লেখ করা হয়েছে। ২ঃ২৩৯; ৪ঃ১১৩ -এ কুরআনের সঙ্গে হি'কমাতের অবতীর্ণ হওয়ার উল্লেখ আছে। কুরআনে, কুরআনকে "আল-ফুরকা'ন"-ও বলা হয়েছে।

"সূরা(سورة)" শব্দটি আরবী সূর (নগর প্রাচীর) হতে গৃহীত একবচনজ্ঞাপক যোগ করিয়া গঠিত। সূরার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্দিষ্ট অংশকে আয়াত বলা হয়। হিব্রু 'ওত' শব্দের ন্যায় ইহা বিশেষ অর্থে নিদর্শন, বিশ্বাসের নিদর্শন (২ঃ২৪৮; ৩ঃ৪১; ২৬ঃ১৯৭) বিশেষত আল্লাহর অস্তিত্ব ও ক্ষমতার নিদর্শন (১২ঃ১০৫; ৩৬ঃ৩৩) বুঝায়। তাই এটি দ্বারা অলৌকিক ঘটনাকে'ও (মু'জিযাঃ) বুঝায় (৩ঃ৪৯; ৪৩ঃ৪৬)। মুহাম্মদ যে আল্লাহর নবী এর প্রমাণস্বরুপ মক্কার পৌত্তলিকরা তার নিকট অলৌকিক ক্রিয়া (মু'জিযাঃ) দেখানোর দাবী করত। যেহেতু প্রেরিত ওহীগুলোই তার অন্যতম মু'জিযাঃ (৬ঃ১৫৮; ৭ঃ২০৩; ২০ঃ১৩৩; ২৯ঃ৫০) সেজন্যই এগুলোর নাম আয়াত হয়েছে। আয়াতগুলো উর্ধ-জগত হতে (২ঃ৯৯; ২৮ঃ৮৭) আল্লাহর নবীর নিকট (২ঃ২৫২; ৩ঃ৫৮; ৪৫ঃ৫) পাঠানো হত এবং পূর্ববর্তী নবীগনের ন্যায় (২৮ঃ৫৯) তিনিও উহা লোকদেরকে আবৃত্তি করে শোনাতেন (২ঃ১৫১; ৩ঃ১৬৪; ৬৫ঃ১১)।

আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা করেন, (২ঃ১৮৭) ; "তারা রাতের বেলায় আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে" (৩ঃ১১৩); "আর কাফিররা ছাড়া আমার আয়াতসমূহকে কেউ অস্বীকার করে না।" (২৯ঃ৪৭)। আবার কিছু যায়গায় গুরুত্ব বোঝানোর জন্য আয়াতসমূহের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়েছে। যেমন,"আর আমি এতে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি"(২৪ঃ১); "একটি কিতাব যাহা আমি পাঠাইয়াছি, যেন তাহারা ইহার আয়াতগুলি সমন্ধে চিন্তা করিতে পারে" (৩৮ঃ২১); "এগুলো প্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাবের আয়াত" (১০ঃ১; ৩১ঃ১) ; "এগুলো সুস্পষ্ট

কিতাবের আয়াত" (১২ঃ১; ২৬ঃ১; ২৮ঃ১) ; "এ হল কিতাব ও সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াতসমূহ" (১৫ঃ১) ; "এইগুলি আল-কু'রআন ও স্পষ্ট বিবরণদানকারী" (কিতাব) (২৭ঃ১)। "একটি কিতাব যার আয়াতগুলি দৃঢ়রূপে প্রথিত ", (১১ঃ১, ১৩,১)। কিতাবে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ এবং বিভিন্ন অর্থবোধক আয়াতসমূহ আছে (৩ঃ৭)। যেমন, "আমি যে আয়াত রহিত করি কিংবা ভুলিয়ে দেই, তার চেয়ে উত্তম কিংবা তার মত আনয়ন করি

" (২ঃ১০৬)। "যদি আমি এক আয়াত অন্য আয়াত দ্বারা বদল করি (১৬ঃ১০১)।

এইসব বিবরণ হতে মুহাম্মদ এর উপর অবতীর্ণ ওহীর বিষয়বস্তু সমন্ধে জানা যায় "উহা সুরক্ষিত ফলক বা লাওহ' মাহ্'ফুজ' হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে" (৮৫ঃ২২)। " ইহা একটি সুরক্ষিত পুস্তকে রহিয়াছে" (৫৬ঃ৭৯)। "ইহা আমার নিকট মূল কিতাবে রহিয়াছে" (৪৩ঃ৪; ৩ঃ৭)। আল-কুরআন সমন্ধে বলা হয়েছে, "ইহা একটি উপদেশ-গ্রন্থ যাহা সম্মানিত, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং পবিত্র পত্রসমূহে মহান ন্যায়নিষ্ঠ লেখকদের হস্তে লিপিবদ্ধ" (৮০; ১১-১৬)। ৫২ঃ৮২ আয়াতে বিস্তারিত পত্রে লিখিত কিতাবের শপথ করা হয়েছে এবং ৬৮ঃ১ -এ বলা হয়েছেঃ "কলম ও যাহা দ্বারা লেখা হয় তাহার শপথ" এবং ৯৬ঃ৪-৫ এ বলা হয়েছে "কলম দ্বারা তিনি মানবকে শিক্ষা দিয়েছেন যাহা সে জানিত না" তাঁকে আরও বলা হয়েছে, "তোমার রাব্ব- এর কিতাব হইতে যাহা তোমার প্রতি ওয়াহ্'য়িরূপে পাঠানো হইয়াছে তাহা পাঠ কর"। "আল্লাহর কথা কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না " (১৮ঃ২৭)। ৪ঃ১৬৪; ৪০ঃ৭৮ - এ বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁহাকে কতক নবীর কথা বলিয়াছেন এবং কতক নবীর কথা বলেন নাই।

রাসূল এর উপর অবতীর্ণ ওহী থেকেই উম্মুল কিতাব (৪৩ঃ৪) এর মূল বিষয়বস্তু ধারণা করে নেয়া যায়। সেগুলো হল, আল্লাহর সত্তা, বিশ্ব সৃষ্টি - বিশেষত মানব সৃজন, ভাল ও মন্দ আত্মা-সমূহের সৃষ্টি, শেষ বিচার, জান্নাত,জাহান্নাম, পূর্ববর্তী নবী গনের অভিজ্ঞতা, আল্লাহর ইবাদত ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধীয় যাবতীয় আইন-কানুন এবং বিশেষ বিশেষ আইন (৪ঃ১০৩, ১২৭,১৩৮; ৩৩ঃ৬)। বার মাসের উল্লেখ প্রসঙ্গে

(৯ঃ৩৬) এবং ২২ঃ৪ -এ শয়তান কর্তৃক মানবকে প্রলুব্ধ করার প্রয়াস প্রসঙ্গে বিশ্ব সৃজন-তত্ত্বের আভাষ দেয়া হয়েছে। এমনকি, বিশ্বে যা কিছু সংঘটিত হয়েছে এবং সংঘটিত হবে তার সব কিছুই ঐ উম্মুল কিতাবে আছে (১০ঃ৬১; ২৭ঃ৭৫; ৩৪ঃ৩; ৬ঃ৩৮,৫৯; ১১ঃ৬; ২০ঃ৫১; ১৭ঃ৫৮)।

কুরআনের অনেকগুলি নামের মধ্যে বিশেষ চারটি নাম হল আল-কুরআন, আল-ফুরকান, আল-কিতাব ও আয-যিক্'র। 'আল-কুরআন' নামের অর্থ 'যাহা পঠিত হয়'। এটি বহু আয়াত ও সূরার সংকলন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কুরআনের প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দটি হল 'ইকরা'-'পাঠকর'। 'আল-ফুরকান' নামের অর্থ পার্থক্যকারী, সত্য ও মিথ্যার, আলো ও অন্ধকারের এবং ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্যকারী। 'আল্-কিতাব' অর্থ লিখিত গ্রন্থ যা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 'আয-যিক্'র' নামের অর্থ উপদেশ যা আল্লাহ্-তা'আলা স্বীয় বান্দাগণকে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের নিমিত্তে দিয়েছেন।

মুসলমানদের মতে এটি আল্লাহর বাণী বা বক্তব্য, যা ইসলামের নবী ও রাসূল মুহাম্মাদের উপর আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়। তাদের মতে এটি একটি মুজিজা বা অলৌকিক গ্রন্থ যা মানব জাতির পথনির্দেশক। মুসলমানদের বিশ্বাস, কুরআনে মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে এবং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান।[২০]

ইতিহাস

নবীর যুগ

ইসলামী ঐতিহ্য অনুযায়ী, হেরা গুহায় অবস্থানকালে মুহাম্মাদের নিকট প্রথম কুরআনের বাণী প্রেরিত হয়। এরপর ২৩ বছর ধরে তার নিকট কুরআনের বাণী প্রেরিত হয়। হাদিস ও মুসলিম ইতিহাস অনুসারে, মুহাম্মাদ মদীনায় হিজরত করে একটি স্বাধীন মুসলিম সম্প্রদায় গঠন করার পর তিনি তাঁর অনেক সাহাবাকে কুরআন তেলাওয়াত ও এর শিক্ষা গ্রহণ করে ছড়িয়ে দিতে আদেশ দেন, যা নিয়মিত অবতীর্ণ হতো। বলা

হয় যে, কিছু কুরাইশ যাদেরকে বদর যুদ্ধে বন্দী করা হয়েছিল, তারা কিছু মুসলিমকে তৎকালীন সরল লিখন পদ্ধতি শেখানোর পর তাদের স্বাধীনতা ফিরে পায়। এইভাবে

মুসলমানদের একটি দল ধীরে ধীরে সাক্ষর হয়ে ওঠে। প্রাথমিকভাবে, খেজুরের ডাল, হাড় ইত্যাদিতে কুরআনের আয়াত লিখিত হয়। যাইহোক, ৬৩২ সালে মুহাম্মদের মৃত্যুর সময় কুরআন বইয়ের আকারে লিপিবদ্ধ ছিল না।[২১][২২][২৩] আলেমদের মধ্যে এ ব্যাপারে ঐকমত্য আছে যে মুহাম্মাদ নিজে আয়াতগুলো লেখেননি।[২৪]

সংকলন

মুহাম্মাদ এর জীবদ্দশায় তার তত্ত্বাবধানে প্রথম পূর্ণ কুরআন লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু এগুলো এক জায়গায় একত্রিত করা হয়নি। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর এর যুগে দ্বাদশ হিজরি সালে ইয়ামামার যুদ্ধ সত্তর জন হাফেজে কুরআন শাহাদাত বরণ করেন।এতে হযরত ওমর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি খলিফা আবু বকর কে বলেন,

> “ "এভাবে জিহাদে হাফেজগন শহীদ হতে থাকলে কুরআনের অনেক অংশ বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। অতএব, আপনি কুরআন মাজিদ একত্রে সংকলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।" ”

প্রথমে আবু বকর রাজি না হলেও ওমর এর অনুরোধে রাজি হন। কুরআন সংরক্ষণের এ দ্বায়িত্ব মুহাম্মাদ এর সময়ের ওহি লেখক সাহাবি যায়েদ ইবনে সাবিত এর উপর প্রদান করা হয়।

যায়েদ ইবনে সাবিত নিজে হাফেজে কুরআন ছিলেন। তিনি কুরআন সংকলন করার ব্যাপারে দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করেন। একটি হলো-কুরআনের আয়াতটি সংশ্লিষ্ট সাহাবা মুখস্থ বলবেন, অপরটি হলো তিনি মুহাম্মাদ এর সময়ে লিখিত ঐ আয়াতটি প্রদর্শন করবেন। তিনি লিখিত ছাড়া কুরআনের আয়াত সত্যায়নের জন্য যথেষ্ট মনে করেননি। তিনি বহু যাচাই বাছাই করার পর সাহাবায়ে কেরামের নিকট রক্ষিত মুহাম্মাদ এর জীবদ্দশায় লিখিত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি থেকে সে সময়ের আবিষ্কৃত বিশেষ কাগজে গ্রন্থাকারে কুরআন লিপিবদ্ধ (যা সউফ নামে পরিচিত[২৫]) করেন। লিপিবদ্ধ কুরআনটি হযরত আবু বকর এর তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। তার ওফাতের পর

এটি হযরত ওমর এর হেফাজতে থাকে। তার শাহাদাতের পর তারই ওসিয়ত অনুসারে কুরআনের এ প্রতিলিপিটি মুহাম্মাদ এর স্ত্রী বিবি হাফসা এর নিকট গচ্ছিত থাকে। তৃতীয় খলিফা উসমান এর যুগে ইসলামি সম্রাজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ইসলামের এ প্রসারের ফলে বিভিন্ন জাতি ও ভাষাভাষী লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের অনেকেই কুরআনের গঠন পদ্ধতি অনুসরণ করে কুরআনের বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করতে পারত না। বিশেষ করে আরমেনিয়া এবং আজারবাইজান যুদ্ধে সমবেত মুসলমানদের কুরআন পাঠ পদ্ধতির বিভিন্নতা দেখে বিশিষ্ট সাহাবি হুযাইফা, খলিফা উসমান কে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি অবিলম্বে এ নিয়ে নেতৃস্থানীয় সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করে চার জন

বিশিষ্ট সাহাবা সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করেন। এ চার জন সাহাবা হচ্ছেন-

- যায়েদ ইবনে সাবিত
- আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর
- সাইদ ইবনুল আস
- আব্দুর রহমান ইবনে হারিস [২৬]

এভাবে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান রা.-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পবিত্র কুরআন সংকলিত ও বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হয় বিধায় তাকে "جمع القرآن " বা কুরআন সংগ্রহকারী বলা হয়।

হযরত উসমান এর উদ্যোগে হিজরি ২৪ সালে শেষবারের মতো কুরআন সংকলনের এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বোর্ড হযরত হাফসা এর নিকট সংরক্ষিত মূল কপিটি সংগ্রহ করেন।[২৭][২৮] উক্ত বোর্ড পূর্বলিখিত প্রতিলিপিটি অনুসরণ করে পাঠ ও উচ্চারনের বিভিন্নতা দূর করার জন্য শুধু কুরাইশি উচ্চারণ ও ভাষায় তার আরও সাতটি প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন। বর্ণিত আছে যে, সাতটি প্রতিলিপি তৈরি করে মক্কা, শাম, ইয়েমেন,বাহরাইন, বসরা ও কুফা প্রদেশে একটি করে প্রেরণ করা হয়। আর রাজধানী মদিনাতে একটি কপি খলিফার নিকট সংরক্ষিত রাখা হয়।[২৯]

এরপর বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য বিক্ষিপ্তভাবে সংরক্ষিত প্রতিলিপিগুলো সকলের কাছ থেকে সংগ্রহ করে বিনষ্ট করে দেওয়া হয়।[৩০]

ইসলামে গুরুত্ব

অননুকরণীয়তা

মূল নিবন্ধ: কুরআনের অলৌকিকতা

ইসলামী পরিভাষা অনুযায়ী, কুরআনের অলৌকিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এই বিশ্বাসকে ইজায বলা হয়। মুসলমানরা বিশ্বাস করে আল কুরআন একটি ঐশ্বিক গ্রন্থ যা কোনো মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয় ও যা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত কার্যকর এবং এর মাধ্যমে এই গ্রন্থ মুহাম্মাদের নবীত্বের মর্যাদার অনুমোদনে প্রদত্ত মূল প্রমাণ। কুরআনেই অননুকরণীয়তা ধারণাটির উৎপত্তি, যেখানে পাঁচটি ভিন্ন আয়াতে এর বিরোধীদের কুরআনের মত কিছু তৈরী করতে আহ্বান করা হয়: "যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন রচনা করার জন্য মানুষ ও জ্বীন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ কুরআন রচনা করতে পারবেনা।"[৩১] নবম শতাব্দী থেকে অসংখ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে যাতে কুরআন ও এর শৈলী ও বিষয়বস্তু নিয়ে অনুসন্ধান করা হয়েছে। আল জুরজানি (মৃত্যু ১০৭৮) ও আল বাকিলানি (মৃত্যু ১০১৩) সহ মধ্যযুগীয় মুসলিম পণ্ডিতেরা এই বিষয়ে লিখেছেন, এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং কুরআন অধ্যয়নের জন্য ভাষাগত পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও অন্যরা বলেছেন যে কুরআনে মহৎ ধারণা আছে, অন্তর্নিহিত অর্থ আছে, এই গ্রন্থ যুগ যুগ ধরে এর সতেজতা বজায় রেখেছে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং ইতিহাসে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। কিছু পণ্ডিত বলেন যে কুরআনে বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে যা আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কুরআনের অলৌকিকতার মতবাদ প্রমাণে মুহাম্মাদের নিরক্ষরতার উপর আরও জোর দেওয়া হয় যেহেতু নিরক্ষর মুহাম্মাদের পক্ষে এই গ্রন্থ রচনা মোটেই সম্ভব নয়।[৩২][৩৩]

নামাজে কুরআন তেলাওয়াত

নামাজে বিশুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা আবশ্যক। নামাজে কিরাআত তিলাওয়াতের বিষয়াবলী জানা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য দায়িত্ব। ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাআতে সুরা ফাতিহার সঙ্গে সুরা মিলানো ওয়াজিব। কমপক্ষে তিন আয়াত বা তিন আয়াতের সমপরিমাণ বড় এক আয়াত তিলাওয়াত করতে হবে।

বিষয়বস্তু

কুরআনের বিষয়বস্তু আল্লাহর অস্তিত্ব এবং পুনরুত্থান সহ মৌলিক ইসলামী বিশ্বাসসমূহ বর্ণনা করে। পূর্বের নবিগণের বিবরণ, নৈতিক ও আইনগত বিষয়, মুহাম্মাদের সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনা, দানশীলতা ও নামাজের কাহিনীও কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। কুরআনের আয়াতে ঠিক-বেঠিক সম্পর্কে সাধারণ উপদেশ রয়েছে এবং এতে বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো সাধারণ নৈতিক পাঠের রূপরেখা প্রদান করে। প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কিত আয়াতগুলোকে মুসলিমরা কুরআন এর বার্তার সত্যতার ইঙ্গিত হিসাবে ব্যাখ্যা করে।[৩৭]

একেশ্বরবাদ

কুরআনের কেন্দ্রীয় ধারণা হলো একেশ্বরবাদ। আল্লাহ জীবন্ত, শাশ্বত, সর্বব্যাপী এবং সর্বশক্তিমান হিসেবে বর্ণিত (দেখুন কুরআন ২:২০, ২:২৯, ২:২৫৫)। আল্লাহর শক্তিমত্তা তার সৃষ্টির ক্ষমতায় সর্বোপরি আবির্ভূত হয়। তিনি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর স্রষ্টা (দেখুন কুরআন ১৩:১৬, ২:২৫৩, ৫০:৩৮ ইত্যাদি)। কুরআন এর মতে আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ নির্ভরতার দিক দিয়ে সকল মানুষ সমান এবং এই সত্যকে স্বীকার করা ও তদনুযায়ী জীবন পরিচালনার মধ্যেই মানুষের কল্যাণ নিহিত।

কুরআনে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য বিভিন্ন আয়াতে সৃষ্টিতাত্ত্বিক যুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ,মহাবিশ্ব প্রবর্তিত হয়েছে সুতরাং এর একজন প্রবর্তক প্রয়োজন এবং যা কিছু বিদ্যমান, সবকিছুর অস্তিত্বের জন্যই একটি যথার্থ কারণ থাকতে হবে। এছাড়া, এক্ষেত্রে মহাবিশ্বের কথাও প্রায়ই উল্লেখ করা হয়েছে: "যিনি সাত আসমান

স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। পরম করুণাময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোন অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না। তুমি আবার দৃষ্টি ফিরাও, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি?"[৩৮][৩৯]

পরলোকতত্ত্ব

নবী-রাসুল

কুরআন এ উল্লেখিত নবী-রাসুলগণ হলেন

1. আদম
2. শিষ
3. ইদ্রিস
4. নূহ
5. ইব্রাহিম
6. ইসমাইল
7. ইসহাক
8. শোয়াইব
9. ইয়াকুব
10. ইউসুফ
11. ইমরান
12. জাকারিয়া
13. ইয়াহিয়া
14. মুসা
15. হারুন

16.দাউদ

17.সোলাইমান

18.লোকমান

19.লুত

20.হুদ

21.সালেহ

22.ইউনুস

23.ইলিয়াস

24.আইয়্যুব

25.মুহাম্মদ

ইসলামের নবি ও রাসুল

ইসলামের নবি ও রাসুল (বিকল্প বানানে **নবী ও রাসূল**) (আরবি: الأنبياء والرسل في الإسلام, প্রতিবর্ণীকৃত: *আল-আনবিয়া ওয়ার রুসুল ফিল ইসলাম*) বা **ইসলামের পয়গম্বর** (ফার্সি: پیامبران در اسلام, প্রতিবর্ণীকৃত: *পয়ম্বরান দার ইসলাম*) হলেন সেই সকল ব্যক্তিত্ব যাদেরকে মুসলিমগণ আল্লাহ কর্তৃক মানুষের দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য মনোনীত হিসাবে বিবেচনা করে। ইসলামী পরিভাষায় তাদেরকে বলা হয় *নবি* (বহুবচনঃ أَنْبِيَاء, *আনবিয়া,* অর্থঃ প্রতিনিধি, সতর্ককারী) ও *রাসুল* (বহুবচনঃ رُسُل , *রুসুল* অর্থঃ বার্তাবাহক) বা *মুরসাল* (مُرْسَل, বহুবচনঃ مُرْسَلُون, *মুরসালুন,* অর্থঃ বার্তাবাহক)।

ইসলামি ঐতিহ্য মতে আল্লাহ প্রত্যেক জাতির নিকট নবিদেরকে প্রেরণ করেছেন। ইসলাম ধর্ম মতে একমাত্র মুহাম্মাদই সমগ্র মানবজাতির নিকট আল্লাহ্‌র বার্তা পৌছানোর জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন এবং অপর সকল নবিগণ নির্দিষ্ট এক বা একাধিক গোত্র বা জাতির জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন।

ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের বিপরীতে, ইসলামে নবি ও রাসুলের বর্ণনা দেওয়া হয় এভাবে যে, উভয়ই ঐশী প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত এবং রাসুলগণ (বার্তবাহক) গ্রন্থ আকারে একটি সম্প্রদায়ের জন্য ঐশী বার্তা প্রদান করেন, কিন্তু রাসুল নন এমন নবিগণ কোন গ্রন্থ বহন করেন না। ইসলামী বিশ্বাসমতে, নবিগণ আল্লাহ কর্তৃক পরকালে জান্নাত বা স্বর্গ লাভের নিশ্চয়তা প্রাপ্ত ব্যক্তি।

কয়েকজন নবি বা বার্তাবাহকের নাম কুরআনে উল্লেখিত আছে। মুসলিমগণ বিশ্বাস করে আদম হলেন প্রথম নবি, পক্ষান্তরে শেষ নবি হলেন মুহাম্মাদ, তাই তার উপাধি, নবিদের সিলমোহর। খ্রিষ্টধর্মের মতই ইসলামেও ইসার (যিশু) জন্ম কৌমারীয় জন্মের ফসল এবং তিনি নবি হিসাবে বিবেচিত হন কারণ আল্লাহর নিকট হতে তিনি ওহী (অদৃশ্য বা গোপন প্রত্যাদেশ) প্রাপ্ত। যিশু একজন বার্তাবাহক হিসেবেও বিবেচিত হন কারণ আল্লাহ তার নিকট ইঞ্জিল অবতীর্ণ করছিলেন।[১] অবশ্য, খ্রিষ্টধর্মের বিপরীতে, ইসলাম ধর্মে, তাকে আল্লাহর পুত্র দাবি করার বিরোধী করা হয় এবং যিশু একজন মানুষ হিসাবেই বিবেচিত হন।

তাৎপর্য

সকল রসূল (বার্তাবাহক) নবি কিন্তু সকল নবি রাসুল (বার্তাবাহক) নন। ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য অনুযায়ী, রাসুল হলেন বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয় সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত, আর নবি হলেন বিশ্বাসীদের কাছে প্রেরিত, যাদের কাছে পূর্বে কোন রাসুল এসেছে।[২] এছাড়াও,আরেকটি ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে যে, নবীগণ প্রত্যাদেশ পান স্বপ্নের মাধ্যমে, এবং রাসূলগণ প্রত্যাদেশ পান ফেরেশতা বা স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের মাধ্যমে। মুসলিমরা বিশ্বাস করে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত সকল নবি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।[*তথ্যসূত্র প্রয়োজন*] *—[সুনানে তিরমিযি, হাদিস: ২৯১০]*

কিয়ামত

ইসলামে পরকালীন ধারণা

কিয়ামত শব্দের অর্থ উঠে দাঁড়ানো। এটি আরবি শব্দ **কিয়াম** থেকে আগত যার অর্থ উঠা, দাঁড়ানো ইত্যাদি(ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত)। ইসলামী আকীদা অনুসারে,ইসরাফিল (আ.) শিঙ্গায় ফুৎকার দিলে কিয়ামত হবে, অর্থাৎ বিশ্বজগৎ ধ্বংস হবে। প্রথম ফুৎকার দেওয়ার সাথে সথেই আকাশ ফেটে যাবে, তারকাসমূহ খসে পড়বে, পাহাড়-পর্বত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে তুলার মত উড়তে থাকবে। সকল মানুষ ও জীব-জন্তু মারা যাবে, আকাশ ও সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়ার সাথে সাথেই পৃথিবী সৃষ্টি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত সৃষ্টজীবের আর্বিভাব হয়েছিল, তারা সকলেই জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়াবে।[১]

কুফরীর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

কুফরীর সংজ্ঞা :

কুফরীর আভিধানিক অর্থ আবৃত করা ও গোপন করা। আর শরীয়তের পরিভাষায় ঈমানের বিপরীত অবস্থানকে কুফরী বলা হয়।কেননা কুফরী হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান না রাখা, চাই তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক কিংবা না হোক। বরং তাদের ব্যাপারে কোন প্রকার সংশয় ও সন্দেহ, উপেক্ষা কিংবা ঈর্ষা, অহংকার কিংবা রাসূলের অনুসরণের প্রতিবন্ধক কোন প্রবৃত্তির অনুসরণ কুফরীর হুকুমে কোন পরিবর্তন আনয়ন করবেনা। যদিও তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী বড় কাফির হিসাবে বিবেচিত। অনুরূপভাবে ঐ অস্বীকারকারী ও বড় কাফির, যে অন্তরে রাসূলগণের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও হিংসাবশতঃ মিথ্যা সাব্যস্ত করে থাকে। [মাজমু আল ফাতওয়া, ৩৩৫]

কুফরীর প্রকারভেদ :

কুফুরী দুই প্রকার।

প্রথম প্রকার : বড় কুফরী

এ প্রকারের কুফুরী মুসলমান ব্যক্তিকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। এটি আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত:

১* মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কুফরী:এর দলীল আল্লাহর বাণী: 'যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কথা রচনা করে, অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অস্বীকার করে, তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে? জাহান্নামই কি এইসব কাফিরের আবাস নয়? [সূরা আনকাবুত, ৬৮]

২* মনে বিশ্বাস রেখেও অস্বীকার অহংকারশত: কুফরী:এর দলীল আল্লাহর বাণী: 'যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল, সে অমান্য করল ও অহংকার করল। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল। [সূরা বাকারা ২:৩৪]

৩* সংশয়জনিত কুফুরী:একে ধারণাজনিত কুফরী ও বলা হয়। এর দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী: 'নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল, আমার মনে হয়না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। আর আমি মনে করিনা যে, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। আর যদি আমার পালনকর্তার কাছে আমাকে পৌঁছে দেয়া হয়ই, তবে তো আমি নিশ্চয়ই এর চেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান পাব। তদুত্তরে তার সাথী তাকে বলল, তুমি কি তাকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে? কিন্তু আল্লাহই আমার পালনকর্তা এবং আমি কাউকে আমার পালনকর্তার সাথে শরীক করিনা। [সূরা কাহাফ,৩৫-৩৮]

৪* উপেক্ষা প্রদর্শন ও মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কুফরী:এর দলীল আল্লাহর বাণী: 'আর কাফিররা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। [সূরা আহক্কাফ,০৩]

৫* নিফাকী ও কপটতার কুফরী:এর দলীল হল: এটা এজন্যে যে, তারা ঈমান আনবার পর কুফরী করেছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না। [সূরা মুনাফিকুন, ০৩]

দ্বিতীয় প্রকার: ছোট কুফরী

এ প্রকারের কুফরী মুসলিম মিল্লাত থেকে বহিস্কৃত করেনা। একে 'আমলী কুফরী' ও বলা হয়। ছোট কুফরী দ্বারা সে সব গোনাহের কাজকেই বুঝানো হয়েছে, কুরআন ও সুন্নায় যাকে কুফরী নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ ধরনের কুফুরী বড় কুফরীর সমপর্যায়ের নামে। যেমন আল্লাহর নিয়ামতের কুফরী করা যা নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। 'আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এমন এক জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত। তথায় প্রত্যেক স্থান হতে আসত প্রচুর রিযিক ও জীবিকা। অতঃপর সে জনপদের লোকেরা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞা প্রকাশ করল।' [সূরা নাহল, ১১২]

এক মুসলমান অপর মুসলমানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াও এ ধরনের কুফরীর অন্তর্গত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 'কোন মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী কাজ। আর তার সাথে যুদ্ধ করা কুফুরী। [বুখারী , মুসলিম]

তিনি আরো বলেন: 'আমার পর তোমরা পুনরায় কাফির হয়ে যেওনা, যাতে তোমরা একে অপরের গর্দান উড়িয়ে দেবে। [বুখারী, মুসলিম] গায়রুল্লাহর নামে কসম ও এ কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:'যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে কসম করল। সে কুফরী কিংবা শিরক করল। [তিরমিযী, হাকেম] কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ মুমিন হিসাবে গণ্য করেছেন। তিনি বলেন: 'হে ঈমানদার গণ!

তোমাদের উপর নিহতদের ব্যাপারে ক্বিসাস গ্রহণ করা ফরয করা হয়েছে।' [সূরা বাকারা, ১৭৮]

এখানে হত্যাকারীকে ঈমানদারদের দল থেকে বের করে দেয়া হয়নি। বরং তাকে ক্বিসাসের অলী তথা ক্বিসাস গ্রহণকারীর ভাই হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন: 'অত:পর হত্যাকারীকে তার(নিহত) ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে (নিহতের ওয়ারিসগণ) প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং (হত্যাকারী) উত্তমভাবে তাকে তা প্রদান করবে। ' [সূরা বাকারা, ১৭৮]

নিঃসন্দেহে ভাইদ্বারা এখানে দ্বীনী ভাই বুঝানো উদ্দেশ্য। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন: 'মুমিনদরে দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। [সূরা হুজরাত, ০৯]

এর পরের আয়াতে আল্লাহ বলেন: 'মুমিনরা তো পরস্পর ভাইÑভাই, অতএব তোমরা তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা কর'। [সূরা হুজরাত, ১০]

সার কথা:

১# বড় কুফরী ইসলামী মিল্লাত থেকে বের করে দেয় এবং আমলসমূহ নষ্ট করে দেয়। পক্ষান্তরে ছোট কুফরী ইসলামী মিল্লাত থেকে বের করেনা এবং আমল ও নষ্ট করে না। তবে তা তদনুযায়ী আমলে ত্রুটি সৃষ্টি করে এবং লিপ্ত ব্যক্তিকে শাস্তির মুখোমুখি করে।

২# বড় কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তি চিরস্থায়ী ভাবে জাহান্নামে অবস্থান করবে। কিন্তু ছোট কুফরীর কাজে লিপ্ত ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করলেও তাতে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবেনা। বরং কখনো আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। ফলে সে মোটেই জাহান্নামে প্রবেশ করবেনা।

৩# বড় কুফরীতে লিপ্ত হলে ব্যক্তির জান মাল মুসলমানদের জন্য বৈধ হয়ে যায়। অথচ ছোট কুফরীতে লিপ্ত হলে জান মাল বৈধ হয়না।

৪# বড় কুফরীর ফলে মুমিন ও অত্র কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তির মধ্যে প্রকৃত শত্রুতা সৃষ্টি হওয়া অপরিহার্য হয়ে যায়। তাই সে ব্যাক্তি যত নিকটাত্বীয়ই হোক না কেন, তাকে ভালবাসা ও তার সাথে বন্ধত্ব স্থাপন করা মুমিনদের জন্য কখনোই বৈধ নয়। পক্ষান্তরে ছোট কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে কোন বাধা নেই। বরং তার মধ্যে যতটুকু ঈমান রয়েছে সে পরিমান তাকে ভালবাসা ও তার সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত এবং যতটুকু নাফরমানী তার মধ্যে আছে, তার প্রতি ততটুকু পরিমান ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব পোষণ করা যেতে পারে।

ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ

ওয়েব সম্পাদনা: মো: মাহমুদ -ই- গাফফার

শির্ক

ইসলাম ধর্মে, *শির্ক* (আরবি: شرك *širk*) পৌত্তলিকতা বা বহুঈশ্বরবাদ চর্চা করার পাপকে বুঝায় অর্থাৎ শির্ক হল আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে উপাস্য হিসেবে সাব্যস্ত করা বা তার উপাসনা করা। শাব্দিকভাবে এর দ্বারা এক বা একাধিক কোন কিছুকে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও কর্তৃত্বের অংশীদার সাব্যস্ত করাকে বুঝায়। এটি তাওহিদের পরিপন্থী একটি বিষয়। ইসলামে শির্ক হল একটি অমার্জনীয় অপরাধ যদি না মৃত্যু নিকটবর্তী হবার পূর্বে আল্লাহ্র নিকট এই অপরাধের জন্যে ক্ষমা চেয়ে না নেয়া হয়। ইসলামের নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুসারে, আল্লাহ্ তায়ালার কাছে ক্ষমা না চাইলেও মৃত্যুর পর নিজের বিচার অনুসারে তার ইবাদতকারীদের যে কোন ভুল ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু শির্কের অপরাধী দুনিয়াতে ক্ষমা না চাইলে কখনোই ক্ষমা করবেন না।

আল্লাহ্ তায়ালা শির্কের বিপরীত তাওহিদের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এভাবে,

বলঃ তিনিই আল্লাহ। একক/অদ্বিতীয়।আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন,এবং তাঁর সমতুল্য কেহই নেই। সুরাতুল ইখলাস।

প্রকারভেদ

তাওহিদ যেমন প্রধানত তিন প্রকার, একইভাবে এর বিপরীতে শির্কও প্রধানত তিন প্রকার, যথা:

(এক) আল্লাহ্‌র সত্তার সাথে শির্ক করা (আত-তাওহিদুর রুবুবিয়াহ্‌র বিপরীত)। যেমন: আল্লাহ্‌র স্ত্রী, পুত্র, কন্যা আছে বলে বিশ্বাস করা।

(দুই) আল্লাহ্‌র ইবাদতে শির্ক করা (আত-তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ্‌র বিপরীত)। (তিন) আল্লাহ্‌র গুণাবলিতে শির্ক করা (তাওহিদুল আসমা ওয়াস-সিফাতের বিপরীত)। যেমন: নবী, রাসুল ও আওলিয়াগণ নিজে থেকে গায়েব জানেন বলে মনে করা, কারণ গায়েবের জ্ঞান শুধু আল্লাহ্ জানেন।

তৎকালীন মক্কার মুশরিকদের অবস্থা

মক্কার মুশরিকরা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও প্রতিপালকত্বে বিশ্বাস করত। একইসাথে তারা বিভিন্ন মূর্তি, পাথর, গাছ, নক্ষত্র, ফেরেশতা, জিন, মৃতব্যক্তি ইত্যাদি বস্তু ও জীবের ইবাদত বা উপাসনা করত। আল্লাহ্ ছাড়াও ঐসব দেবদেবীকে ভয়-ভীতি, আশা-আকাঙ্খার সাথে ডাকা, বিপদে তাদের কাছে সাহায্য, আশ্রয়, উদ্ধার প্রার্থনা করা এবং তাদের নামে যবাই ও মানত করা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শির্ক করত। কুরআনে বলা হয়েছে,

"আর তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর, আসমানসমূহ ও যমিন কে সৃষ্টি করেছেন? তারা (মুশরিকরা) অবশ্যই বলবে, মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞই কেবল এগুলো সৃষ্টি করেছেন।"[কুরআন ৪৩:৯]

কুরআনে আরও বলা হয়েছে,

"তাদের অধিকাংশ আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস করে, তবে (উপাসনায়) শির্ক করা অবস্থায়।"[কুরআন ১২:১০৬]

মক্কার মুশরিকরা দাবি করত যে, দেবদেবীকে ডাকলে বা উপাসনা করলে এরা আল্লাহ্‌র নৈকট্য মিলিয়ে দেয়। কুরআনে বলা হয়েছে, "জেনে রেখ, আল্লাহ্‌র জন্যই বিশুদ্ধ ইবাদাত-আনুগত্য। আর যারা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা কেবল এজন্যই তাদের উপাসনা করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেবে।'..."[কুরআন ৩৯:৩]

তারা আরও দাবি করত যে, দেবদেবীরা আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করে আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিবেন। কুরআনে বলা হয়েছে,

"আর তারা আল্লাহ্‌ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করছে, যা তাদের ক্ষতি করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, 'এরা আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের সুপারিশকারী'। বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্কে আসমানসমূহ ও যমিনে থাকা এমন বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন'? তিনি পবিত্র মহান এবং তারা যা শরিক করে, তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।"[কুরআন ১০:১৮]

কুরআনে এগুলোকে মিথ্যাচার এবং তাদের মনগড়া উদ্ভাবন বলা হয়েছে,

"অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, তারা কেন তাদেরকে সাহায্য করল না? বরং তারা তাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর এটা তাদের মিথ্যাচার এবং তাদের মনগড়া উদ্ভাবন।"[কুরআন ৪৬:২৮]

সূত্র:

https://www.kalerkantho.com/feature/undefined/2023/01/06/1220059

https://www.dailynayadiganta.com/last-page/406286/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A6-%E0%A6%B8%E0%A6%BE-

%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%87-
%E0%A6%B8%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4-
%E0%A6%8F%E0%A6%AC%E0%A6%82-
%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%A4-
%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A6%AC-
%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A7%81-
%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A8

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%B0

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%88%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%BE

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E2%80%8C%E0%A6%95_(%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE)

https://quraneralo.net/kufr-definition-and-types/
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A
F%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%A4
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B
2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%A8%E0
%A6%AC%E0%A6%BF_%E0%A6%93_%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6
%B8%E0%A7%81%E0%A6%B2
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A6%A
6%E0%A7%80%E0%A6%B0
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B
0%E0%A6%86%E0%A6%A8
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A
8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A4
https://banglanews24.com/index.php/islam/news/bd/702962.details
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%
AC%E0%A7%80%E0%A6%A8_%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0
%A6%BF
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B
0%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%BE#:~:text=%E0%A6%
AB%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0
%A6%BE%20(%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BF%3A%2
0%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1%D9%83%D8%A9)%20%E0%A6%87%
E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80,%E0%A6
%B9%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%20%E0%A6%95%E0%A7%8
B%E0%A6%A8%E0%A7%8B%20%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%

E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%20%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0
%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A
6%87%E0%A5%A4
https://banglanews24.com/islam/news/bd/389049.details#:~:text=%E
0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%
B9%20%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%BE
%20%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%97%E0%A6%A4%E0
%A7%8D%E0%A6%AF%20%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A
6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%20%E0%A6%AE%E0%A6%
A4%E0%A7%8B,%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0
%A6%87%20%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A
6%AC%E0%A6%AD%E0%A7%8C%E0%A6%AE%20%E0%A6%B6%E0%A6%
95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0%20%E0%A6%85%
E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7
%80%E0%A5%A4

https://www.dailynayadiganta.com/last-
page/406286/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%
A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A6-
%E0%A6%B8%E0%A6%BE-
%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%87-
%E0%A6%B8%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A
7%87-%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4-
%E0%A6%8F%E0%A6%AC%E0%A6%82-
%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6

%A4-
%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A8%E0%A
7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A6%AC-
%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A7%81-
%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A
6%A8

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111410032/